দ্বিতীয় খণ্ড

চারুচন্দ্র দত্ত

বিশ্বভারতী
কলিকাতা

'পুরানো কথা' প্রথম খণ্ডের অনুরূপ দ্বিতীয় খণ্ডের এই লেখাগুলিও 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত।

আমার জীবনের চতুর্থ অঙ্ক আরম্ভ হল সম্পূর্ণ নূতন আবেষ্টনের মাঝে। ঊনবিংশ শতাব্দী লুকিয়ে গেল মহাকালের জটায়। ভিক্টোরীয় যুগ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল অনন্ত আকাশে। কে জানে, কি আছে অজানা ভবিষ্যতে! বিশ শতকের ঝঞ্ঝাবায়ু তখনো ওঠে নেই বটে। কিন্তু ঈশান কোণে একখানা কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। সবাই সভয়ে সেই দিকে তাকাচ্ছে। এ কি আমি আমার দেশের কথা বলছি? না, সারা জগতের? তা নিজেই ঠিক জানি না।

যাই হোক, আমি বাংলাদেশে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে দিন কয়েক কাটিয়ে এসে কোমর বেঁধে লেগে গেলাম আমার ঘানি টানতে। ঘানি-টানাটা প্রথমটা ভালোই লাগল। চোখ বেঁধে দিলে সকল বলদেরই ভালো লাগে। তবে আমার তুর্দৈব যে, আমার চোখের ঠুলিটা কেউ তেমন টেনে বেঁধে দেয় নাই। অল্পদিনেই কেমন আলগা হয়ে গেল। চারি দিক থেকে মুক্ত আলো চোখে এসে নানা অশান্তির সূত্রপাত শুরু করলে। যাক্, সে পরের কথা।

ইতিমধ্যে আমার নূতন জীবন শুরু হয়ে গেল আহমদাবাদে। প্রথম থেকেই লোকের কাছে যে অযাচিত স্নেহ আদর পেলাম, তা আজকের দিনে অভাবনীয়। হয়তো শ্রদ্ধাস্পদ সত্যেন্দ্রনাথ ওদেশে বাঙালীর পথ সুগম করে দিয়ে গেছলেন। তবু এটা বলতেই হবে যে গুজরাতের অতিথিসৎকার অতি সুন্দর জিনিস। আমার মনে হত যেন আমাকে আপন করে নেবার জন্য একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে এঁদের সমাজে। আমার মতন একজন অতি সামান্য খোকা হাকিমকে আদর-যত্ন করার পেছনে যে কোনো মতলব থাকতে পারে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি নেই। যদিচ আমার শুভানুধ্যায়ী তুই-একজন সাহেব আমাকে এ বিষয়ে অনেক লেকচার দিয়েছিলেন।

You must be very careful— cant you see, they are trying to get at you? বুঝতে পারছ না, এরা তোমায় হাত করার চেষ্টা করছে?

কমিশনার লীলী সাহেব আহমদাবাদেই থাকতেন। তিনি খুব জবরদস্ত হাকিম ছিলেন। একেবারে সেকেলে কোম্পানীর আমলের বড়ো সাহেব। এক

দিকে যেমন আদব-কায়দার এতটুকু ত্রুটি বরদাস্ত করতেন না, অন্য দিকে তেমনি গরিব-নওয়াজ, আশ্রিতবৎসল ছিলেন। তাঁর বাড়ি শাহীবাগ, প্রাসাদ-তুল্য। সেখানে সকালে-বিকেলে হরদম ভিড় লেগে রয়েছে। ইংরেজি ও দেশী আমলাবর্গ ইনামদার, তালুকদার, শেঠ-মহাজন, সবাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হুজুরকে সেলাম বাজাবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে। চা-পার্টি, খানা, নাচ, ইভনিং-পার্টি লেগেই রয়েছে। সাহেব প্রথম প্রথম আমাদের উপর সদয়ই ছিলেন। তবে বোধ হয় বিলেতি ভাবাপন্ন একেলে নেটিব তিনি আগে দেখেন নাই। বুঝতেন না যে অতটা পিঠ-চাপড়ানো, তোয়াজ করা, হুকুম চালানো, আমাদের ঠিক বরদাস্ত হবে না। ক্রমে গোলযোগ বেড়েই চলল। শেষ, এক কলমের খোঁচায় আমাকে একেবারে দূর দক্ষিণে বদলী করে দিলেন।

এ-সব ব্যাপার দুই-একদিনে সংঘটিত হল, তা তো নয়। তবে সূচনা থেকেই আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে উচ্চ মস্‌নদে বসবার যোগ্যতা আমার নেই।

যাঁরা আমাকে এইরকম উপদেশাদি দিতেন, তাঁরা ছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে, মিছরীর ছুরি। তখন আমি বুঝতাম না যে oily (মুখমিষ্টি) ইংলিশম্যান জাতটা, কটা শূদ্র, কালো বামুন ও বেঁটে মুসলমানের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত। ক্রমে জানলাম যে যথার্থ ইংরেজ মানে নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী মানুষ। হয়তো একটু অপ্রিয়ভাষীও বটে!

এইরকম জাত-ইংরেজও আহমদাবাদে অনেকগুলি ছিলেন। তাঁরা কেউ যে আমার সঙ্গে কোনো বিশেষ অসদ্ব্যবহার করেছিলেন, তা নয়। তবে মোটামুটি তাঁদের ভাবটা এই ছিল, যেন তাঁরা গুরুমহাশয় আর আমি নবাগত পোড়ো। কতকটা আমাকে কৃপার চক্ষে দেখতেন। আর সর্বদা আমার চাল-চলনের উপর খুব কড়া নজর রাখতেন। দেখতেন, আমি ইংরেজ-সমাজে মেশবার উপযুক্ত পাত্র কি না। আমার মেজিস্ট্রেট কর্ম-পাগল মানুষ ছিলেন। সামাজিকতার ধার ধারতেন না। তিনি আমাকে বললেন— কাজ-কর্ম শেখো, ক্লাবে ঢোকার তাড়া কি? সত্যি বলতে কি, আমার কোনো তাড়াই ছিল না। কেননা, দেখতে দেখতে দেশী-সমাজে আমাদের অনেক বন্ধু জুটে গেল। যেটুকু-বা প্রাণে ঢুকেছিল, তা সহজেই উবে গেল।

সে বছর গুজরাতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল। অনাবৃষ্টির দরুণ চাষীরা হেমন্তের ফসল প্রায় কিছু পায় নেই। জেলা-হাকিমরা এ কথা বারবার হুজুরে

জানালেন, কিন্তু সরকারের টনক নড়ল না। প্রথম কিস্তি খাজনা জোর-জবরদস্তি করেই উসুল হল। লোকের ঘটিবাটি তৈজস-পত্র গেল। জানুয়ারি মাস নাগাদ দলে দলে অনশন-ক্লিষ্ট লোক গ্রাম ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, পথে বেরিয়ে পড়ল মজুরির সন্ধানে। কিন্তু অত লোক মজুরি পাবে কোথায়? মাস দুই-তিনে কঙ্কালে ছেয়ে গেল গুজরাতের পথ, ঘাট, মাঠ। যত ব৷ মরল মানুষ, তত মরল গোরু। চাষী নিজে খেতে পায় না, গোরুকে কি খেতে দেবে? ঘাস পাতা তো আর কোথাও ছিল না। সব জলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছল।

এই দুর্দিনে কানপুর থেকে এলেন এক ব্যাপারী-সাহেব। তিনি আট আনা বারো আনা করে গোরু মহিষ কিনে, খুব ছাল চামড়া চালান করতে লাগলেন তাঁর কারখানায়। গুজরাতের সর্বনাশ, কানপুরের হল পৌষ মাস। বড়ো বড়ো শেঠ-মহাজনেরা কাতর হয়ে সরকারের কাছে দরখাস্ত করলেন যে এই নূতন কতলখানা বন্ধ করা হোক্। সরকার তরফ হতেও অনেক চেষ্টা হল। কিন্তু ফল হল না। ব্যাপারী-সাহেবটি জবরদস্ত লোক ছিলেন। তিনি কালেকটরকে বলে এলেন, "আমি তো আপনাদের কোনো আইনই ভাঙি নেই। পয়সা দিয়ে গোরু কিনছি। শহরের বাইরে, ঘেরা জায়গায় কাটাই করছি। আর কি করতে বলেন?"

একদিন গুজব উঠল যে অমুক শেঠ এই সাহেবটার মুণ্ডের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ইনাম কবুল করছেন। সাহেব কুড়িজন যমদূতের মতন পাঠান চৌকিদার রাখলেন, তার কতলখানায় পাহারা দেবার জন্য। ফলে ছোটোখাটো মারপিট হতে লাগল। সকলের ভয় হল, একটা বড়ো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধবে। এমন সময় হঠাৎ একদিন সাহেব তার পেলেন তাঁর কোম্পানির কাছ থেকে, "তুমি হুকুম পাওয়া মাত্র কানপুর চলে এসো।" তিনি আহমদাবাদ ত্যাগ করলেন, তাঁর জায়গায় এলেন এক নিরীহ বাঙালী বাবু। ধীরে ধীরে কসাইখানা বন্ধ হয়ে গেল। লোকের হাড় জুড়াল। সকলে আন্দাজ করল যে বোম্বাই সরকার ভেতরে ভেতরে কল টিপে থাকবেন। তা হতেও পারে। কেননা, লাট নর্থকোটের মতন দয়ালু গভর্নর বোম্বাইয়ে কখনো এসেছেন কিনা সন্দেহ।

এই লাটসাহেব গুজরাতের গোরু-বাছুর বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরই আগ্রহে নানা জায়গায় সরকারী গো-শালা স্থাপিত হয়েছিল। আমার মহকুমায় এইরকম একটা বড়ো গো-শালা ছিল। একবার নর্থকোট সাহেব

মহাধুম করে সেটা দেখতে এলেন— সঙ্গে কমিশনার থেকে আরম্ভ করে বড়ো বড়ো আমলা, সেক্রেটারি, এডিকং, চোপদার, বরকন্দাজ। এলেন আমার রাজ্যে, অথচ আমাকে কর্তারা একটা খবর দিলেন না। আমি এক ক্ষুদ্র ইনামদার সাহেবের কাছে কথায় কথায় শুনলাম। তিনি স্টেশনে হাজির থাকার হুকুম পেয়েছিলেন কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে। আমি কি করি? যাব কি যাব না? বিনা নিমন্ত্রণে সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়ে তো প্রলয় কাণ্ড বাঁধিয়েছিলেন। যা হোক পাঁচ রকম ভেবে যাওয়াই স্থির করলাম।

প্লাটফরমে গাড়ি দাঁড়ালে টুপি খুলে এগিয়ে গেলাম। লীলী সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্তার সঙ্গে, কিন্তু প্রসন্ন মুখে নয়। টুপি তুলে খুব অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "বাঃ বেশ হয়েছে, তুমি আসতে পেরেছ। আমাকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেবে। আমার গাড়িতে এসো।" কমিশনার প্রমুখ সাহেবদের মুখের ভাব দেখে আমার বেশ একটু আনন্দ হল।

ঘণ্টা দুই পরে স্টেশনে ফিরলে একজন জরী-বেনারসী পরা বৃদ্ধ তালুকদার আমাকে পিঠ চাপড়ে দিলেন, "Sir, you are very lucky, indeed— মশায়, আপনার জোর নসীব।" আমি উত্তর দিলাম, "Rather! নিশ্চয়ই!"

ট্রেন ছাড়বার আগে আমার কালেকটর আমাকে চুপি-চুপি একটু কড়কে দিলেন, "আমি মনে করেছিলাম তোমার ক্যাম্প বহু দূরে, তাই তোমাকে খবর দিই নেই। After all, H. E. is on an informal visit— তোমার আসার খুব দরকার ছিল না।" আমি কিছুই বললাম না।

লাট-সাহেব কিন্তু যাবার সময় বেচারাদের আর একটু চটিয়ে দিয়ে গেলেন, "গুড্ বাই! থ্যাঙ্ক ইউ, ডাট্। অনেক দরকারী জিনিস শিখলাম আজ তোমার কাছে।"

আমি মজাটা খুব উপভোগ করলাম বটে! কিন্তু আমার অদৃষ্টচক্র ফিরল না। লাটেরা সচরাচর ভদ্রলোকই হয়ে থাকেন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট যে একটা প্রাণহীন যন্ত্র মাত্র।

গুজরাতে আকাল পড়াতে আমার এইটুকু সুবিধা হল যে আমার মামুলী শিক্ষানবিশি খুব সংক্ষেপ হয়ে গেল। যত শীঘ্র সম্ভব কমিশনার আমাকে, আর আমার সাথী R.-কে, জুড়ে দিলেন দুর্গতসেবার কাজে। প্রথম ভার পেলাম আমরা দুজনে মিলে ছনয়ক রিলিফ ক্যাম্পের। প্রতি ক্যাম্পে কত মজুর

থাকত, তা এখন ভুলে গেছি, তবে হাজারের কম কোনো ক্যাম্পে ছিল না। তারা কোথাও বা সড়ক তৈরি করছিল, কোথাও পুকুর খুঁড়ছিল, কোথাও বাঁধ বাঁধছিল। এ-সব কাজের তদ্বির অবশ্য P. W. D. ইঞ্জিনীয়ার সাহেবরা করতেন। তবে আমরা ঝোলে, ডালে, অম্বলে, সবেতেই ছিলাম। ওভার-সিয়াররা মজুরদিগকে অতিরিক্ত খাটাচ্ছে কি না তাও দেখতাম, ডাক্তারখানায় ঢুঁ মেরে মোড়লীও করতাম। আবার অন্নসত্রের তদারকও করতাম। এই অন্নসত্রে খেত, যারা অক্ষম। সমর্থ লোকেরা মাটি কোপাতো আর একটা নির্দিষ্ট দর অনুসারে মজুরি পেত। তাদিকে নিজে রেঁধে খেতে হত। রসদ যোগাত এক সরকার থেকে নিযুক্ত বেনে। ক্যাম্পে এই বেনের দোকানের সামনে একটা নিরিখ বা মূল্যের তালিকা টাঙানো থাকত, কিন্তু ক্রেতারা তো নিরক্ষর; নিরিখ পড়বে কে? মোট কথা, এই মজুর বেচারাদিকে সবাই ঠকাত। P. W. D. বাবুদের থেকে আরম্ভ করে ডাক্তার, পুলিস, অন্নসত্রের আমলা (civil officer), সকলকেই এ বেচারাদের দস্তুরী দিতে হত। R. ও আমি দুজনেই ছিলাম সংসার সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কি উপায়ে এই দীন-দরিদ্রদের সত্যি সাহায্য করতে পারা যায়, তা তো জানতাম না। মাঝে মাঝে রাগের মাথায় তাণ্ডব শুরু করে দিতাম। তাতে যে ফল একেবারে না হত, তা নয়। তবে আমাদিকে পরে নানারকম বিপদে পড়তে হত। R. বেচারাকে তো একবার এক ওভার-সিয়ার ফৌজদারী আদালতে খাড়া করে দিলে। ক্যাম্পের বেনেরা আমাদের চোখের আড়ালে নানা প্রকার রদ্দীমাল চালিয়ে দিত—চুন-মেশানো চাল, কাঁকর-ভরা ডাল, ধুলোসুদ্ধ বাজরীর আটা ইত্যাদি। বেচারা কুলিরা তো একে অস্থি-চর্ম সার, তার উপর হাড়ভাঙা খাটুনি, এ রসদ তাদের সহ্য হবে কেন! ক্যাম্পের পর ক্যাম্পে কলেরা আরম্ভ হয়ে গেল। আমাদের কাজ বাড়ল। সরকারের কল তো খুব শনৈঃ শনৈঃ নড়ে! মড়ক শুরু হয়ে গেছে, অথচ অনেক জায়গায় কলেরা মিক্সচার আসে নাই। দুই-একজন ডাক্তার চড়টা চাপড়টা যে খান নেই, তা শপথ করে বলতে পারি না। তবে তাদের বাঁধা ওজর ছিল —ইণ্ডেণ্ট করেছি মশায়, এখনো ঔষধ এসে পৌছায় নেই। শেষে হল কি, কমিশনার সাহেব আমাদিকে ডেকে ছোটো ছোটো শিশি করে কি-এক সবুজ ঔষধ দিলেন। বললেন, "Never mind the doctors, তোমরা এই ঔষধ খাইয়ে চিকিৎসা করতে থাক।" সে ঔষধ খেয়ে অনেকগুলি লোক বাঁচল।

কিন্তু বিভ্রাট কি এইখানেই থামল ? মড়ক এসে প্রথম উপস্থিত হতেই ক্যাম্পের মুর্দাফরাসের দল পলায়ন দিতে লাগল, পুলিস পাঠিয়ে তাদের অধিকাংশকে গেরেপ্তার করে আনা হত বটে, কিন্তু বাসি মড়া তো আর পড়ে থাকতে পারে না, একদিন R. ও আমি ক্যাম্পে গিয়ে দেখি, যেখানে সেখানে মানুষ মরে পড়ে রয়েছে, গোটা তিরিশেক হবে। মজুর সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। আর ক্যাম্পের বাবু কজন হাসপাতালের ডাক্তারখানা ঘরে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছেন। শবগুলো জ্বালিয়ে দেবার কথা বলাতে তাঁরা উত্তর দিলেন, "মড়া তোলে কে ? ঢেড়রা সব পালিয়েছে।"

আমি হিন্দুর ছেলে, বলতে আমার একটু সংকোচ হল। কিন্তু R. সাহেবের বাচ্চা, সে চেঁচিয়ে উঠল, "তোমরা ওঠো। আমাদের দুজনকে সাহায্য করো। আমরা সব করছি।"

তাঁরা জাতের কথা তুলে একটু ইতস্তত করছেন দেখবামাত্র R.-এর চাবুক উঠল। যাক্, ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর একটা ব্যবস্থা করে ফেলা হল। কারবলিক্ দিয়ে হাত-টাত ধুয়ে মাইল খানেক দূরে গিয়ে এক তেঁতুলগাছ-তলায় বসলাম। সেই একটা গাছে পাতা ছিল। আশে-পাশে সব গাছের পাতা কোন্ কালে শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। আমাদের ভয়ানক খিদে পেয়েছে। দুজনের উটের পিঠে বাঁধা টিফিন বাক্স ছিল। খুলে খেতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু যা মুখে দিই, তাতেই দুর্গন্ধ। হঠাৎ দেখি কয়েক হাত দূরে মাটির ভেতর থেকে একটা মড়ার হাত বেরিয়ে রয়েছে! হাতে সবুজ রঙের চুড়ি। খাবার-দাবার ফেলে দিয়ে উটে চেপে বাড়ি-মুখো হলাম। কোশ সাতেক পথ গিয়ে তিনটার সময় বাড়ি পৌঁছলাম। স্নান-টান করে মুখে জল দিতে পেলাম। এরকম ব্যাপার নিত্য হত, তা নয়। তবে মোটের উপর বলা যেতে পারে— সে কয়েক মাস পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া, আরাম-আয়েস, নিতান্তই দুর্লভ জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই যে আমাদের ক্যাম্প, অন্নসত্র ইত্যাদি চলছিল, এগুলোকে লোকে কি ঘৃণার চোখে দেখত, তার আভাস একবার কি করে পেয়েছিলাম বলি। একদিন আমি এক দূর কুলি-ক্যাম্পে টঙ্গায় চড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ ঘোড়া দুটো চমকে পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠল। কোনোরকমে তাদের ঠাণ্ডা করে নেমে পড়লাম। দেখি ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা একজন আধবয়সী লোক মড়ার মতন পড়ে রয়েছে। তার পিঠে মাথায় হাত বুলোতে সে চোখ খুললে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

"কি হয়েছে? তোমার অসুখ করেছে?" সে কথা কইতে পারলে না। একটু ঠোঁটের কোণে হেসে পেটে হাত দিলে। আমি বললাম, "আমি অমুক তলাওয়ে (ক্যাম্পে) যাচ্ছি। আমার গাড়িতে আয়। সেখানে অন্নসত্রে খেতে পাবি।" দুর্ভিক্ষের অন্নসত্রকে লোকে খিচড়িখানা বলত। বোধ হয় ইংরেজি কিচেন শব্দের অপভ্রংশ। এ মানুষটি ভ্রূকুটি করে ভাঙা গলায় বললে, "কোথায়? সরকারী খিচড়িখানায়? না, তুমি যাও, যাও। আমি এইখানেই মরব।" লোকটার উপর সরকারী কিচেন-এ কি জুলুম হয়েছিল, কে জানে! আমি সন্তর্পণে বললাম, "আচ্ছা যেতে হবে না। আমার সঙ্গে যে রুটি আছে, তাই একটুখানি খা।" সে চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিলে, "কি! মুসলমানের রুটি আমি খাব! যাও যাও সাহেব, তুমি যাও। আমাকে চুপচাপ মরতে দাও।" আমার মুখ দিয়ে কথা বেরল না। ধন্য বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করেছিলেন ঋষি মহারাজেরা! কি করব! আমার কাজের সময় বয়ে যাচ্ছে। লোকটার হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে টঙ্গার দিকে ফিরলাম। সে তার সমস্ত জোরটুকু খরচ করে টাকাটা আমার গায়ে ছুঁড়ে মারলে। আমি আমার কাজে চলে গেলাম। টাকাটা সেই ধুলোতে পড়ে রইল। ফেরবার পথে দেখি বেচারা মরে গেছে। তার প্রাণহীন দেহটা ভুঁইয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। টাকাটা কিন্তু কে তুলে নিয়ে গেছে। দুই-একজন লোক ডেকে গর্ত খুঁড়িয়ে লোকটাকে কবর দিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

কিছুদিন পরে R. ও আমি অন্য কার্যে মোতায়েন হলাম। ততদিনে কলেরার প্রকোপ কমে গেছে। লোক যা অনাহারে মরবার, তাও মরে গেছে। ক্যাম্পগুলোতে অনেকটা শৃঙ্খলা এসেছে। এবারে আমাদিকে লাগানো হল গ্রামের ভিতর। অধিকাংশ গ্রামে দুঃস্থ লোকদিগকে কাঁচা সিধা বিতরণ হচ্ছিল। সিধা দিত গাঁয়ের পটেল তলাটি। তদবির করতেন তহশীলদার সাহেব। কিন্তু ইদানীং তহশীলদারের কাজ এত বেড়ে গেছল যে তাঁদের পক্ষে এই সিধা-বিলানো ব্যাপারের উপর কড়া নজর রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই আমাদিকে ঠেলে দেওয়া হল ঐ কাজে। সেরকম নজর না রাখতে পারলেও, মাঝে মাঝে দণ্ড চালনার দ্বারা গ্রাম কর্মচারীদের মনে ধর্মভয়টা জাগিয়ে রাখতে পারব। সত্যি কাজ আমরা কতটা করতে পেরেছিলাম, জানি না। তবে হট্ হট্ করে ঘুরে বেড়ানোর কসুর করি নেই।

একটা ঘোড়া আর একটা উট এসে যেত রোজ। সাধারণত একটা আন্দাজ গ্রাম পরিভ্রমণ শেষ করতাম। তবে মাঝে মাঝে দুপুরের খাবারটা বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম, ফিরতাম সন্ধ্যায়। কখনো কখনো বা গাঁয়ে চণ্ডীমণ্ডপে (চাত্তরীতে) রাত কাটাতাম। চাষীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল।

ইতিমধ্যে আর-একটা ব্যাপার এসে পড়ল আমাদের হাতে। একদিন কমিশনার সাহেব আমাকে ডেকে দুহাজার টাকার এক তোড়া দিয়ে বললেন, "তুমি খুব ঘুরে বেড়াচ্ছ, শুনতে পাই। এই টাকাগুলো গরিব দুঃখীকে দিও।" সেই থেকে যে কত হাজার টাকা বিলালাম, তার গুণতি নেই। টাকা খয়রাতের, সুতরাং চুল-চেরা হিসেব রাখতে হত না। সঙ্গে আমলা-মুহুরি কেউ থাকত না, সেপাই কনস্টেবলও বড়ো একটা জুটত না। কত রাত কাটিয়েছি টাকার তোড়া মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে। একমাত্র প্রহরী আমার ছোটো পিস্তলটি। কখনো কখনো বেশি টাকা সঙ্গে থাকলে পুলিস-সাহেব এক-আধ জন কনস্টেবল দিতেন। একবার এক তলোয়ার-ধারী পাঠান কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে গেছলাম। সে দুদিন ধরে এমনই তাণ্ডব নেচে বেড়ালে, যে আমি বিব্রত হয়ে উঠলাম। তার পর থেকে আর প্রহরী নিয়ে যেতাম না। টাকা কোনোদিন চুরি যায় নেই। কিন্তু কিছুদিন বাদে একবার এক ভারি মজা হয়েছিল। কদিন আমার ডেরা ছিল রেল থেকে কয়েক মাইল দূরে এক ছোট্ট গ্রামের বাহিরে। রসদ আসত সদর থেকে রেলে। একদিন পথে আমার রসদ (অর্থাৎ গোটা আষ্টেক পাউরুটি) লুট হয়ে গেল। সাহেবের পাউরুটি লুট! কি ভয়ানক ব্যাপার! পুলিস তো জগঝম্প লাগিয়ে দিলে। দিন-তিনেক বাদে পাঁচজন অস্থিচর্মসার কোলী চালান হয়ে এল ডাকাতির চার্জে, আমারই আদালতে! তারা অম্লান বদনে জবাব দিলে, "তিনদিন খেতে পাই নেই। পেট জ্বলে যাচ্ছিল। খাবার সামনে পেয়ে কি ছেড়ে দেব?" সত্যিই তো, ছেড়ে কি করে দেবে! কিন্তু আমিই বা ওদের ছেড়ে দিই কি করে? পুলিস যা প্রমাণ এনেছিল, সেটাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অপরাধটা চুরির কোঠায় ফেললাম। তার পর সাজা লিখলাম— একদিন জেল, আর আট আনা করে জরিমানা। লিখলাম তো এইরকম কিন্তু লজ্জায় ও-দিকে মুখে বললাম, "যা, ছেড়ে দিলাম। আর চুরি করিস না।" জরিমানাটা আমারই গাঁট থেকে গেল।

টাকা বিতরণের কাজে সব গাঁয়েই পাটীদার বা পটেল জাতটার কাছে

যথার্থ সহায়তা পেতাম। তারা নিজেরা তো খয়রাতী পয়সা ছোঁবে না, কিন্তু দাঁড়িয়ে টাকা দেওয়াতো গরিব-দুঃখীকে। বলে দিত, কে যথার্থ দুঃস্থ, কে নয়। পাটীদারগুলো একটু হাঁদা, কিন্তু বড়ো সৎলোক। এদের মান-ইজ্জতের জ্ঞানও খুব প্রখর।

একরকম কাজ কিন্তু ছিল, যাতে কারো সাহায্য পেতাম না। নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে যা পারি করতে হত। এমন সব ভদ্রবংশীয় রাজপুত ও মুসলমান পরিবার ছিল, যাদের পুরুষেরা হয় মরে গেছে, নয় রোজগারের চেষ্টায় বিদেশে বেরিয়ে গেছে। মেয়েরা পর্দানশীন, কারো সামনে বেরবে না, মুখে কিছু চাইবেও না। এইরকম অনেক স্ত্রীলোক ছেলেপিলে নিয়ে নিঃশব্দে না খেতে পেয়ে ধীরে ধীরে মরছিল। লোকমুখে এই কথা আমার কানে এসেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমি হিন্দী উর্দু দুই ভালো বলতে পারতুম, গুজরাতীও ততদিনে বেশ শিখেছি। প্রথম বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে, অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় জমালাম। তারপর তাঁদিকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা-পড়া করে, দুঃস্থ মহিলাদের একটা ছোটোখাটো তালিকা করে ফেললাম। প্রতি সপ্তাহে নিজে গিয়ে সেই লিস্টমত টাকা মেয়েদের হাতে চুপি চুপি দিয়ে আসতাম।

উপরে গ্রামের তলাটিদের নাম করেছি। এই তলাটিরা ছিল সরকারী মাইনে করা গোমস্তা। জাতে অধিকাংশ বামুন কি বেনে, লেখাপড়াও শিখেছে, অথচ কষ্ট দিয়েছিল এরাই সবচেয়ে বেশি। সর্বদা তাকে তাকে ফিরত কিসে দু-পয়সা হাতাতে পারে! আমরা বোকা আনকোরা নূতন হাকিম, আমাদিকে ঠকানো সহজ হবে। এই ভেবে এই জাতীয় কতকগুলো লোক মোটে আমাদের সঙ্গ ছাড়ত না। নানারকম খিদমত করে আমাদিকে খুশি করার চেষ্টায় থাকত। R. বেচারা আমার চেয়ে সহজে এদের খর্পরে পড়ত, কেননা ভারতবর্ষের লোক সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিল না। মনে ভাবত, ফরসা কাপড়-পরা ইংরেজি জানা লোক মাত্রই তার সমশ্রেণীর gentleman। একবার একজন তলাটি আমাদের দুজনকে তার গ্রামে নিমন্ত্রণ করে চর্ব্য-চোষ্য খাইয়ে, পরে তারই জোরে চারপাশের গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা আদায় করেছিল। সবাইকে বলেছিল— 'এ ছোকরা সাহেব দুটো তো আমার মুঠোর ভেতর। আমাকে খুশি কর, যা চাস্ পাইয়ে দোব।"

বেচারার ভোগে কিন্তু সে টাকা এল না। পটেলরা চুপি চুপি আমাকে বলে গেল, কি হয়েছে। শুনে আমি আহমদাবাদে গিয়ে R.কে বললাম। দুজনে আবার সেই গ্রামে গেলাম। তলাটিকে ফেরৎ দিতে হল সে পাঁচশো টাকা। কি উপায়ে ফেরৎ দেওয়ালাম, আপনাদের শুনে কাজ নেই।

যখন বর্ষা এল, তখন আমি মহকুমার ভার পেয়েছি। এইবার পটেলদিকে সাহায্য করার সময় এসেছে। তারা খয়রাত নেয় নেই। কোনোরকমে ধার-ধোর করে এই কমাস পেট ভরিয়েছে। কিন্তু বেচারাদের বলদ নেই, ঘরে বীজ নেই। অবিলম্বে এ দুটোরই ব্যবস্থা করে দিতে হবে। গভর্নমেণ্ট যত চাই দাদন দিতে এখন প্রস্তুত। বোম্বাই সরকার অল্পে সারবার চেষ্টায় ছিলেন বটে। কিন্তু লাট কার্জন নিজে এসে সারা গুজরাত ঘুরে দেখে গিয়ে দরাজ হাতে টাকার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সরকারের আবার গলদ তো নানা রকমের! বলদ আনাবার ভার পড়ল কৃষি-বিভাগের উপর। তারা এক ঠিকাদারের মারফৎ মালোয়া থেকে বলদ কিনে পাঠালেন। আমার প্রথম পাল জানোয়ার যেদিন এসে পৌছল, সেদিন কি আনন্দ, কি উৎসাহ! চারি দিক থেকে পটেলরা এসেছে বড়ো বড়ো পাগড়ি বেঁধে। সকলের মুখে হাসি। মনের আবেগে আমি একটা ছোটোখাটো বক্তৃতাই করে ফেললাম। কিন্তু অল্পক্ষণেই হরিষে বিষাদ হল। চল্লিশ টাকার বলদ এই! কোনোটা বুড়ো, কোনোটা খোঁড়া, কোনোটা কানা, শতকরা তিরিশটা নিখুঁত জানোয়ার আছে কি না সন্দেহ। যাই হোক, কেউ নিলে না সে বলদ। আমি অত্যন্ত বোকা বনে গেলাম। কমিশনারকে তার করলাম, "বলদগুলো কোনো কর্মের নয়। আমি চাষাদিকে বলদ কিনে দিতে পারি কি?" লীলী সাহেব red-tape-এর ধার ধারতেন না। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারো। ঝাঁসীর বলদ ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।" তার পর ধুম পড়ে গেল বলদ কেনার। দালাল সঙ্গে নিয়ে এ হাটে ও হাটে ফিরে নিজেই কপাল ঠুকে কতকগুলো কিনে ফেললাম। পটেলরা সেগুলো খুশি হয়ে নিলে। এক ঠিকাদারও খাড়া করলাম। সে সাতদিনের মধ্যে সেই ঝাঁসী থেকে উনচল্লিশ টাকা করে চমৎকার বলদ এনে হাজির করলে। পটেলরা সেগুলো কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যেতে লাগল। পরে শুনলাম যে এই উনচল্লিশ টাকার মধ্যে আবার জানোয়ার

পিছু এক টাকা করে আমার এক কর্মচারী সেলামী নিয়েছিলেন। তা হলে বুঝুন কৃষি-বিভাগের ঠিকাদার কি কাণ্ড করেছিল!

অনেক সময় গভর্নমেণ্টের এই ডিপার্টমেণ্ট-ভেদের দরুণ নানা উৎপাত উপস্থিত হয়। আমরা শহরবাসী নিজেদিকে যত সভাই মনে করি না কেন, এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের দেশের লোক বলতে যারা, তাদের বুদ্ধি primitive শিশুর মতন। একটি হাকিমকে দুঃখের কথা জানাতে পারলেই তারা খুশি। তারা কি এত বোঝে, রাজস্ব-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, পূর্ত-বিভাগ, স্বাস্থ্য-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ! যখন ছাপ্পান্ন সংবতে দুর্ভিক্ষের প্রথম সূত্রপাত হল, গভর্নমেণ্ট তো লীলী সাহেবের কথায় কানই দিলেন না। তার পর যখন relief ক্যাম্প আরম্ভ করলেন, তখনো এমন মজুরি ধরে দিলেন যে তাতে একটা লোকের পেট ভরতে পারে না। সবচেয়ে জুলুম হল যখন সেই আধপেটা মজুরিও খানিকটা কেটে নেওয়া হতে লাগল জরিমানা বলে। আমি এমনও দেখেছি যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটা ক্যাম্পের সমস্ত মজুরের জরিমানা হচ্ছে। ওভারসিয়াররা বলতেন, "মজুরগুলো ভয়ানক কুঁড়ে। নইলে কাজ এত কিছু বেশি ধরে দেওয়া হয় নেই।" R. ও আমি বেশ নজর করে দেখতে লাগলাম, কিন্তু কুঁড়েমির লক্ষণ কিছুই ধরতে পারলাম না। শরীরের ঐ অবস্থায় ওর চেয়ে বেশি কাজ করা অসম্ভব। একদিন দেখি এক তলাওয়ে কুলিরা সবাই শক্ত কালো এঁটেল মাটি কোপাচ্ছে, আর P. W. D.র টিকিটে লেখা রয়েছে— সাধারণ বালি-মাটি। আমি ওভারসিয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এরকম জুলুম করছেন কেন মশায়।" তিনি হেসে উঠলেন, "স্যর, গুজরাতের সব মাটিই যে ধরে নিতে হবে বালি-মাটি। এই আমাদের নিয়ম।" চমৎকার নিয়ম! এর উপর আর কথা কি! কমিশনারকে জানালাম। কার্জন সাহেবের হুকুমে পরে এই গরিব বেচারাদের মজুরি কিছু বাড়ানো হল। এই আমাদের মস্ত লাভ। লাট কার্জন বাঙালী Bourgeoisie-র পরম শত্রু হলেও হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর উদারতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই সাহেবের গুজরাত-পরিদর্শনের দুটো একটা গল্প করব। শোনা গল্প, কেননা আমার মতন সামান্য লোক দূরে দূরেই ছিল।

আহমদাবাদ স্টেশনে লাট নামলে নগরশেঠ মণিভাই তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। লীলী সাহেব মণিভাইয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। লাট-সাহেব

করমর্দন করতে করতেই গোটা দশেক প্রশ্ন ফায়ার করলেন— মেশিনগানের গুলির মতো জবাবের জন্য এক সেকেণ্ডও থামলেন না। "ওঃ! আপনি মণিভাই? প্রেমাভাই বুঝি আপনার বাপের নাম? আপনাদের বুঝি পদবি থাকে না? আপনি নগরশেঠ? তার মানে তো লর্ড মেয়র? আচ্ছা, কত পুরুষ আপনারা মেয়রী করছেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। মণিভাই আমাকে পরে বললেন যে, আর-একটু হলেই তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যেতেন। ভাগ্যিস লাট-সাহেব আর-একজনকে নিয়ে পড়লেন।

আহ্মদাবাদের কাছে এক গাঁয়ে গোবিন্দভাই বলে এক বৃদ্ধ বিচক্ষণ পটেল ছিলেন। তাঁর ডাক পড়েছিল বড়োলাট-সাহেবের হুজুরে। মণিভাইয়ের মতো তাঁকে খাড়া থাকতে হয়েছিল Lewis Gun-এর সুমুখে। তবে ভদ্রলোক জাতে পাটীদার, মাথা ঘুরে পড়বার পাত্র তো নয়! লাটকে পালটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লেগে গেলেন, "বিলেতে গ্রাম আছে, হুজুর? না সবই শহর? গ্রামের পটেল আছে তো? পটেলরা কি জাতে সাহেব?" ইত্যাদি ইত্যাদি। কমিশনার তাকে থামিয়ে দিলেন চুপি চুপি এই কথা বলে, "লাটকে সওয়াল জিজ্ঞাসা করতে নেই, পটেল।" গল্পটা করে বললেন, "সাহেব, তোমাদের কলকাতার লাট খুব বুদ্ধিমান। তবে যতটা হুঁশিয়ার নিজেকে মনে করে, ততটা নয়।"

এই তো গেল লাট-সাহেবের সাধারণ ভদ্রলোকদের সঙ্গে ব্যবহার। আমলাবর্গের সঙ্গে ব্যবহার একটু অন্যরকমের। স্টেশন থেকে লাট আমাদের কালেকটরকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। যেতে-যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস্টার G., রানী-সিপ্রীর মসজিদ কোনখানটায়?" G. নম্রভাবে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে আমি জিজ্ঞাসা করে বলছি।" কার্জন চেঁচিয়ে উঠলেন, "জিজ্ঞাসা করে বলবেন! আপনি নিজে জানেন না।" G. বললেন, "আজ্ঞে না, দেখবার সময় পাই নেই। দুর্ভিক্ষের কাজে ব্যস্ত আছি।" লাট এবার চেঁচালেন না। খুব চিবিয়ে চিবিয়ে টিপ্পনী কাটলেন, "সময় পান নেই! না দেখা দরকার মনে করেন নেই? এ বিষয়ে আমারও একটা মত আছে। সেটা জেনে রাখুন। একজন সিনিয়র কালেকটর নিজের জেলার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এতে সরকারের ইজ্জৎ বাড়ে না।" G. ততক্ষণে ভীষণ চটে গেছে। কোনো রকমে রাগ হজম করে উত্তর দিলে, "I am sorry, Sir."

এই ঘটনার ফলে আর-এক মজা হল। গুজরাত থেকে লাট-সাহেবের

সওয়ারী যাওয়ার কথা বিজাপুরে। পাঠক নিশ্চয়ই জানেন যে বিজাপুর আদীল-শাহী রাজাদের প্রাচীন রাজধানী। সেকালের অধিকাংশ ইমারৎ আজও দাঁড়িয়ে আছে। তখন বিজাপুরের কালেকটর ছিলেন এক বৃদ্ধ সিবিলিয়ান, D.। D. চমৎকার লোক ছিলেন, কিন্তু একেবারে লালমুখো বিফখোর জন বুল। তার জীবনে কখনো নেটিবের ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামায় নেই। সে কার্জন-গিব-সংবাদ শুনে চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল। করে কি? সেখানকার ইঞ্জিনীয়ার আহমদী সাহেবের হাতে পায়ে ধরে, তাকে দিয়ে এক ছোট্ট বই লিখিয়ে নিয়ে সেটা আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেললে। বুড়ো বয়সে এমন মুখস্থ করলে যে দেড় বছর বাদে যখন আমার সঙ্গে আলাপ হল, তখনও একটা কথা ভোলে নেই।

G. ধমকানি খেলে পুরাতত্ত্ব নিয়ে। কিন্তু পাঁচ মহলের কালেকটর S. সাহেব একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। বেচারা লাটকে নিয়ে খুব বুক ফুলিয়ে গোধরার relief-ক্যাম্প দেখাচ্ছে। মস্ত ক্যাম্প, কুলিরা পর্যন্ত পরিষ্কার কাপড় পরে রয়েছে, চারি দিক ঝক ঝক করছে, কোথাও একটি কুটো পড়ে নেই। লাটকেও বেশ সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে সবাই পৌছলেন বেনের দোকানের কাছে। লাট এ দিকে নজর করে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস্টার S., এই দোকানের সামনে একটা দরের tariff তালিকা টাঙিয়ে রাখবার কথা না?" S. বেশ বৈঠকী মানুষ ছিলেন। অমায়িক হাসি হেসে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ! বোধ হয়!" "এখনই যান, খবর নিন কেন tariff টাঙানো হয় নেই।" S. চোখ রাঙা করে দোকানের ভেতর চলে গেল। তুমিনিটে বেরিয়ে এল এক তক্তা হাতে করে। বললে, "এই তো রয়েছে নিরিখ tariff!" কার্জন চলে যেতে যেতে বললেন, "দোকানের ভেতর থাকার কথা নয়। বাহিরে টাঙিয়ে রাখা নিয়ম। আপনি আগে এখানে যখন এসেছিলেন তখন টাঙানো দেখেছিলেন কি?" S. অনেকদিন সে ক্যাম্পে আসেন নেই, কি বলবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। লাট সকলের সামনেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "আপনি এ ক্যাম্পে আগে কখনো আসেন নেই না কি? দেখুন মিস্টার S., কালেকটরের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে আমারও একটা ধারণা আছে, জানবেন।" বলে S.এর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন।

G.র গল্পটা G. নিজেই আমাকে বলেছিলেন। S.এর গল্পটা শুনেছিলাম

আর-একজন বড়ো সাহেবের কাছ থেকে। তিনি উপস্থিত ছিলেন সেখানে। গল্পগুলো থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে লাট কার্জন কারও খাতির রেখে কথা কইতেন না, সাহেবদেরও না।

এই দাম্ভিক কার্জনকে একদিন কর্নেল লরেন্স Versailles-এ কাঁদিয়েছিলেন, গল্পটা পাঠকের মনে আছে কি? লর্ড সেসিল তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "চোখ মুছে ফেলো শিগগির। বিদেশীগুলো দেখলে মনে করবে কি?"

কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম। আজ এইখানেই বন্ধ করি।

২

এবারে আমাকে একটু অপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প আরম্ভ করতে হচ্ছে। তরুণ বয়সে আমার অপ্রিয় সত্য বলার বাতিক ছিল কি না, তা এখন মনে নেই। তবে, আজকাল মোটের উপর মন-জোগানো মিষ্ট কথাই বলে থাকি— তা সত্যই হোক, বা অসত্যই হোক। আর এই যে পুরানো কথা লিখছি, এও তো সেরেফ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য। এর ভেতর নজির-প্রমাণাদি আদালত-সুলভ পদার্থ কতটুকুই বা আছে! তবু, সত্যটাকে একেবারে ছেঁটে ফেলে দেওয়াও তো চলে না! তাই এই কৈফিয়তের অবতারণা।

আমাদের ভারতখণ্ডে একদিন দুই জাতি ছিল— শ্বেতকায় আর্য ও কৃষ্ণকায় অনার্য। আজও ভারতবাসীকে মোটামুটি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই যে বর্ণ সমস্যা, এ নানা অনর্থের মূল। প্রাচীন-কালে অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে, আজও ঘটাচ্ছে। কতদিনে এ সমস্যার সমাধান হবে কে জানে! তবে এক দিকে যেমন কৃষ্ণভক্ত গোরা দু-দশটা দেখা দিয়েছে, অন্য দিকে তেমনি গৌরভক্ত কৃষ্ণেরও অভাব নেই। আমার আশা যে, একদিন এই দুইদল ভক্তের দ্বারাই এই অভাগা দেশের উদ্ধার-সাধন ঘটবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে বর্ণ-বিপর্যয়ের দরুণ মানুষকে অনেকরকম গোলযোগে পড়তে হচ্ছে, উপায় নেই। আমাকেও আর পাঁচজনের মতন একটু আধটু অসুবিধা পোহাতে হয়েছে বইকি! সেগুলো সব সাশ্রুনয়নে বর্ণনা করে কোনো লাভ নেই। তবে দুচারটে না বললেও নয়। কেননা, সংসারে পাঁচটা জিনিস দেখতে দেখতেই তো মানুষের চোখ খোলে। অবশ্য যারা চিরদিন

নবজাত খোকাটির মতন একান্ত নির্ভরশীল স্তন্যপায়ী জীব হয়ে থাকতে চায়, তাদের কথা স্বতন্ত্র।

আমাদের কালে বিলেতে এক সমিতি স্থাপিত হয়েছিল— তার নাম N. I. A.। মিস মেনিং বলে এক ভালোমানুষ মেমসাহেব এই সমিতির অধিনেত্রী ছিলেন। আর ভারত-ফেরত ইংরেজ ও বিলেত-প্রবাসী ভারতীয় অনেকগুলি ছিলেন এর পাণ্ডা। এরা মাঝে মাঝে soiree বা সান্ধ্য চায়ের বৈঠক বসিয়ে আমাদের ছাত্রমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করতেন। কু-লোকে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে এই বৈঠকে বড়ো বড়ো সাহেব-মেমেরা এসে খুব জোরে জোরে ছাত্র বেচারাদের পিঠ চাপড়ান। আমি তাই ভয়ে ঐ সমিতির কাছে ঘেঁষি নেই। পিঠে হাত বুলানো অনেক বরদাস্ত করেছি বটে, কিন্তু পিঠ চাপড়ানো জিনিসটাকে চিরদিনই বড়ো ডরাই। তার পর দেখুন, গেছি বিলেত দেশে, সাহেব-মেম দেখার তো আর কসুর ছিল না! সেজন্য মিস মেনিং-এর আঁচল কেন ধরব বলুন!

এ তো গেল বিলেতের কথা। কিন্তু আহ্মদাবাদে চাকরি করতে এসে দেখি, এখানেও কমিশনার-গিন্নী এক N. I. A. খাড়া করেছেন। প্রমাদ গণলাম। বিলেতে স্বাধীন ছিলাম, যা খুশি করেছি। কিন্তু এখানে মাইনে-খোর চাকর বই তো নয়? কি করা যায়? কাকেই বা জিজ্ঞাসাবাদ করি? আপন মনে অনেক গবেষণা করে সিদ্ধান্ত করলাম যে, সরকার-বাহাদুর ও কমিশনার সাহেব দুটো আলাদা পদার্থ, আমি মাইনে খাই সরকারের, কমিশনারের তো নয়— দরকার পড়ে তো সাহেবকে এই প্রভেদটা বুঝিয়ে দেব। কিন্তু আমার সাহেবের মেজাজ যে রুশিয়ার জারেরও বাড়া, তা তখন ভুলে গেছি। ফলও ভুগতে হল।

প্রথম বছরখানেক বছর দেড়েক বেশ কেটে গেল। দুর্ভিক্ষের হাড়ভাঙা খাটুনির মাঝে কারোই এসব ছোটো জিনিসের দিকে নজর দেবার সময় ছিল না। কিন্তু তার পরে একদিন হঠাৎ এক পত্র পেলাম N. I. A.র মুনশি মহাশয়ের কাছ থেকে। পত্রের মজকুর— It is expected that the following gentlemen have sympathy with the objects of this Association. They should send their subscriptions to the Secretary before the end of the month— আমাদের ধারণা যে N.

I. A.র উদ্দেশ্যের সহিত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের সহানুভূতি আছে। তাঁহারা যেন এই মাসের মধ্যেই অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের দেয় চাঁদা মুনশি সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। নীচে সহি খুদ কমিশনার-সাহেবের! নামগুলির মধ্যে প্রথম নামই আমার। পরোয়ানাও এসে হাজির! এখন কর্তব্য কি? উপায় নেই, সাহেবকে বোঝাতে হবে যে তিনি ও সরকার-বাহাদুর দুটো পৃথক পদার্থ। মুনশি মহাশয় গুরুজন-স্থানীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমাকে স্নেহ করতেন। কিন্তু তিনি আমার দুঃখ বুঝবেন না। তাঁকে পত্র লিখতে হল— মহাশয় আমার কোনো সহানুভূতি নাই আপনাদের উদ্দেশ্য বা কার্য-কলাপের সহিত। আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এ পত্র না লিখলেই হত ভালো। কিন্তু পাঁচরকম কারণে আমার সে সময় বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন সম্ভবপর ছিল না। সব কথা তো লিখতে পারি না। তবে কারণটা ওরই মধ্যে একটু পরিষ্কার করে বলি।

একবার বড়ো মেমসাহেবের নিতান্ত ধরাধরিতে আমাদের বাড়ির এঁরা সমিতির এক পার্টিতে গেছলেন। মেমসাহেব এ দিকে আদর-যত্ন যথেষ্ট করেছিলেন। কৌচে নিজের পাশে নিয়ে প্রায় সারাক্ষণ বসেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সৌজন্যে কোনো ফল হয় নেই। কেননা, এঁরা সেখানে বৈঠকের মোটামুটি যা ব্যবস্থা দেখে এলেন, তাতে ভবিষ্যতে আর এদের কোনো N. I. A.র পার্টিতে যাবার আদবে সম্ভাবনা রইল না। আমি যে বর্ণনা শুনলাম, তা কতকটা এই-রকম— শাহীবাগের বড়ো হল-ঘরের একটা দিকে মেম-সাহেবরা, অন্য দিকটায় দেশী মহিলারা, পরস্পর মুখোমুখি করে বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা, গল্প-গুজব চলছে না। সকলেই নীরব, সকলেই আড়ষ্ট। বড়ো মেম এক-একবার যেই নেটিব লাইনের কাছে যাচ্ছেন, কি অমনই আট-দশ জন মহিলা একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে তাঁর সংবর্ধনা করছেন। এঁরা এই-সব কাণ্ড দেখে সেখানে মিনিট পনেরো কুড়ির বেশি টিকতে পারেন নেই।

আর-এক ব্যাপার ঘটেছিল— সেটাও বলি। পলটনের দুই-একজন ছোকরা অফিসারের সঙ্গে আমার বেশ ভাব ছিল। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোতাম, শিকারেও এক-আধবার গেছলাম। একদিন এদের একজন— বেশ ছেলেটি, এখন নাম ভুলে গেছি— আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "I say, does your Memsaheb go to Mrs. L's Native Ladies'

shows too?—ওহে তোমার মেমসাহেবও কি L-গিন্নীর নেটিব মহিলা প্রদর্শনীতে যায়?"

আমি না বলাতে ছোকরা মহাখুশি হয়ে বললে, "That's right, my dear fellow"। N. I. A.-র ইংরেজ মহলে প্রচলিত নামটা শুনে আমার মনে অনেকটা সমাধান বোধ হল। ভাগ্যিস্‌, ঐ সমিতিতে আমাদের যাওয়া আসা নেই! থাকলে এই সরল প্রকৃতি ভদ্রলোকের ছেলে-বন্ধুটিকে কি বলতাম? সে যে আমাকেও তার নিজের মতো ভদ্রলোক মনে করত!

যাক্‌, আমি সেক্রেটারি সাহেবকে তার পত্রের উত্তর দেওয়ায় তার পরদিন কমিশনার-বাহাদুরের এক চিঠি পেলাম, "যত শীঘ্র সম্ভব আমার সহিত দেখা করিবে। জরুরি কাজ।"

যথাসময়ে হুজুরে হাজির হলাম। সাহেব মুখ গম্ভীর করে বললেন, "তোমার চিঠি পড়ে আমরা (বোধ হয় গৌরবে বহুবচন!) বড়ো দুঃখিত হয়েছি। N. I. A.-র উদ্দেশ্য তোমার অনুমত নয়, এ কথার মানে কি? ইংরেজ ও নেটিবের মধ্যে সদ্ভাব থাকে, এ তোমার ইচ্ছা নয়?"

আমি সবিনয়ে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে সদ্ভাব থাকাতে আমার কোনো আপত্তি তো হতে পারে না! তবে উভয়পক্ষের সম্মান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ব্যবস্থাটা এইরকম হওয়া উচিত।"

"তুমি কি বলতে চাও যে, আমি আমার অতিথিদের সম্মান রাখতে জানি না?"

"আমি জাতীয় সম্মানের কথা বলছি মহাশয়, ব্যক্তিগত ইজ্জতের কথা নয়।"

"এইরকম ভাবে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হওয়ার পরে আমি আমার বন্ধু সেই লেফটেনাণ্টটি যা বলেছিল, সেই কথা সাহেবকে জানালাম। তিনি খুব জোরে হেসে উঠলেন, "ওঃ, পল্টনের অফিসার, তুমি কি ওদের কথা গ্রাহ্য করো নাকি? ওরা তো এদেশে চৌকিদারি করতে আসে। রাজ্য চালাই তুমি আমি।"

আমি রাজ্য চালাই শুনেও খুশি হতে পারলাম না। "রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।"

তার পর N. I. A.-র পার্টির যে বর্ণনা আমি শুনেছিলাম তাও সাহেবের কাছে নিবেদন করলাম, অবশ্য সটীক বর্ণনা। সাহেব একটুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে

হঠাৎ আমাকে ভয় দেখালেন এই বলে, "তুমি জানো, লেডি N. তোমার এইসব কথা শুনলে অত্যন্ত বিরক্ত হবেন!"

কেউ ভয় দেখালে বুদ্ধিটা আমার চট্ করে খুলে যায়। খুব বিনয় করে সাহেবকে বললাম, "এত কথায় কাজ কি মশায়। আমি যা যা বলেছি সেজন্য মাপ চাইছি। আমি সামান্য কর্মচারী, আপনি আমার কমিশনার। একখানা হুকুম লিখে দেন আমি কালই N. I. A.-র চাঁদার টাকা পাঠিয়ে দেব।"

আমার কথা শুনে কর্তা আরো চটে গেলেন। বললেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করছ? এসব বিষয়ে কি সরকারী হুকুম দেওয়া যায়?"

আমাকে একটু ন্যাকা সাজতে হল। উত্তর দিলাম, "আপনি লাট মেম-সাহেবের নাম করলেন বলেই হুকুমের কথা আমার মনে হল। মাপ করবেন। আমাকে অনুমতি দেন তো এখন উঠি। কাছারির বেলা হয়ে এল।"

L. সাহেব নির্বিকার মুখে বললেন, 'হাঁ, উঠতে পারো। আর দেখো, তোমার মহকুমায় যে যে জায়গায় নলকূপ বসানো হচ্ছে, সে জায়গাগুলো সব একবার ঘুরে দেখে এসো। কালই বেরিয়ে পড়ো। আমি তোমার কালেক্টরকে বলব। এই বৃষ্টিতে তাঁবুতে থাকতে একটু কষ্ট হবে, তার আর উপায় কি?"

আমি "যে আজ্ঞে" বলে উঠে পড়লাম। নমস্কার করে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় কর্তা আবার ডাক দিলেন। অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "দেখো Dutt, যদি আসছে হপ্তায় N. I. A-র পার্টিতে উপস্থিত থাকতে চাও, তা হলে না হয় এখনই মফস্বলে গিয়ে কাজ নেই। দু-চার হপ্তা বাদে যেয়ো।"

আমি এক লহমা ইতস্তত করলাম। যাঁরা বর্ষাতে তাঁবুতে ঘুরেছেন তাঁরাই বুঝবেন কেন। তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলাম, "না স্যার, দেরি করে কাজ নেই। আপনার অনুমতি হয় কালই বেরিয়ে যাই। নলকূপগুলো নিজের চোখে দেখে আসি।"

পাঠককে বোঝাতে পারলাম কি না জানি না যে এই কথা-কাটাকাটির মধ্যে কোনো পক্ষেই ভদ্রতার বা সৌজন্যের এতটুকু ত্রুটি হয় নেই। ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের কোনো নিয়মই সাহেব ভাঙেন নেই। আমিও সমস্ত সময়টা প্রায় জোড়হাত করে ছিলাম। তথাপি মাসখানেক পরে বদলির হুকুম পেলাম। বোম্বাই এলাকার একেবারে দক্ষিণের এক জেলায়। যাবার আগে কমিশনার-সাহেবকে বিদায় নমস্কার করতে গেলাম। তিনি আমার

মতন একজন চট্‌পটে বুদ্ধিমান কর্মচারীকে হারাচ্ছেন বলে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমিও দুই-এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলে থাকব, মনে নেই। তবে একটা কথা এখানে বলা দরকার। আমার ঠিক সেই সময়ে অতদূরে যাওয়ার নানারকম সাংসারিক অসুবিধা ছিল। কর্তা সে-সব কথাই জানতেন, ঠিক পাশের জেলায় একটা জায়গা খালি ছিল, সেটা আমাকে দিতে পারতেন। তা না করে সেখানে পাঠালেন একজন অবিবাহিত ইংরেজ ছোকরাকে, আর আমাকে ঠেলে দিলেন চব্বিশ ঘণ্টার রেলের পথ। একেই বলে কার্যকারণ-পরম্পরা। তবে হিঁদুর ছেলে ভুলি নেই যে "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

আমার প্রথম কমিশনার-সাহেবকে কোনোরকমে খাটো করতে আমি চাই না। তিনি উঁচুদরের লোক ছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিল উদার, আমীর-জনোচিত। তবে ভদ্রলোক একেবারে সেকেলে হাকিম ছিলেন। পাঠক হাসবেন না, আমি এখন বৃদ্ধ হলেও তখন অতিমাত্রায় একেলে ছিলাম। অল্পবিস্তর সংঘর্ষ অনিবার্য। তবে সে সংঘর্ষ মানুষে মানুষে নয়, সেকালে ও একালে। আর হয়তো দুটো জাতের দুরকমের complex-এর মধ্যে। আহমদাবাদের সবাই এই লীলো সাহেবের কথায় উঠতেন বসতেন। সাহেব হয়তো আমাকে তাঁর রাজ্যে misfit বেখাপ্পা মনে করলেন।

সেকালের আহমদাবাদ এক আজব শহর ছিল। চারি দিকে কেবল এক খেয়াল—টাকা, টাকা, টাকা! রাষ্ট্রনীতি বলে যে পদার্থটি সারা ভারতকে চঞ্চল করে তুলেছিল এখানে তার কোনো বালাই ছিল না। সমাজের মাথার মণি যে শেঠিয়ারা, mill-owners, তাঁরাও ছিলেন (শেঠ লালভাইয়ের ভাষায়) "সরকার বাহাদুরের টাকার থলি। মেহেরবান কমিশনার সাহেব মরজিমত হাত ঢোকাচ্ছেন আর টাকা বের করছেন।" এ হেন স্থানে এসে মানবচরিত্রের একটা দিক দেখার আমার খুব সুযোগ হল। আমাদের হিন্দু সমাজকে মোটামুটি বোধ হয় চার ভাগ করা যায়, দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ-প্রধান, আর্যাবর্ত ক্ষত্রিয়-প্রধান, বঙ্গদেশ শূদ্র-প্রধান, আর গুজরাত বৈশ্য-প্রধান। বৈশ্য-ধর্মকে কুবের-পূজা বললে, আশা করি কেউ রাগ করবেন না। আজ আমার বাংলা দেশকে এই ধর্মে দীক্ষিত করবার এত আয়োজন হচ্ছে বলে ভয় হয়।

যাক্‌গে আমি সেকেলের কথাই বলি। সবে আহমদাবাদ এসেছি খুদে হাকিম হয়ে। আমার বাংলার সুমুখেই থাকতেন এক সম্রান্ত পারসী শেঠ— নাম নওরোজী উকিল। কিছুদিন আগে এই শেঠজি কমিশনার সাহেবের হাতে এক লাখ টাকা দিয়েছিলেন, শহরে এক চোখের হাসপাতাল খোলবার জন্য। সেই হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে মহা ধুমধামের ব্যবস্থা হয়েছিল। নওরোজী শেঠ সরকারি বে-সরকারি সকলকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আর পাঁচজনের মতো আমিও একখানা কার্ড পেয়েছিলাম। তবে যাব কি যাব না করছিলাম। কিন্তু শেঠজি নিজে এসে এমন করে ধরলেন যে না গিয়ে উপায় রইল না। গেলাম উৎসবের আসরে। এক প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। তার এক দিকে ঠিক মাঝখানটায় মঞ্চের উপর কমিশনার-দম্পতির জন্য সিংহাসনের মতন ব্যবস্থা। মাথার উপর জরি-মখমলের চাঁদোয়া। মঞ্চের ডাইনে সাহেব-মেমেদের জন্য গ্যালারি, বাঁয়ে পদস্থ নেটিবদের স্থান। সামিয়ানার দ্বিতীয় ধারটা নেটিব মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। তৃতীয় ধারে এক সারি বেঞ্চ-পাতা— সাধারণ নেটিবরা কেউ তাইতে বসবেন, কেউ-বা পেছনে দাঁড়াবেন। আমি বসি কোথায়? শেঠজি তো আদর-অভ্যর্থনা করে আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললেন সাহেব-পাড়ায়। সমবেত সাহেবরাও "হ্যালো"! ইত্যাদি নানারকম আনন্দসূচক ধ্বনি তুলে স্বাগত করলেন! উঠে গিয়ে বসলেই চুকে যেত হাঙ্গাম। কিন্তু তা হলে আর misfit বলেছে কাকে! জাতীয় গৌরব বলে যে ভূতুড়ে ব্যাপারটা উঠেছে তাই নিয়েই তো যত গোল! আস্তে আস্তে গিয়ে নেটিব পাড়ায় বসলাম। কাছাকাছি যে-সব ভদ্রলোকেরা বসেছিলেন তাঁরা "আহা, আহা, করেন কি, ও দিকে গিয়ে বসুন" ইত্যাদি উপদেশ দিতে লাগলেন। এমন সময় বড়ো সাহেব ও তাঁর মহিষী এসে পড়লেন। সঙ্গে আঁটাসোটাধারী চোপদারবর্গ। ব্যাণ্ড বেজে উঠল "Rule Britannia"। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে রাজ-প্রতিনিধির সংবর্ধনা করলাম। কেউ কেউ মনের আবেগে একটা কিরকম অস্ফুট হ্রেষারব তুললেন। সেটাতে আর আমি যোগ দিতে পারলাম না।

যথাসময়ে কার্যক্রম শুরু হল। Taylor বলে এক বৃদ্ধ পাদরী সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে যিশুর নাম স্মরণ করে এক প্রার্থনা করলেন। আবার সবাই দাঁড়িয়ে উঠল। এবার আমি বসেই রইলাম। আহমদাবাদের মতো জৈন-

বৈষ্ণবের শহরে এক পারসী-শ্রেষ্ঠীর টাকায় হাসপাতাল তোলা হচ্ছে, এখানে যিশুর নাম কেন! ভগবান যিশুকে হয়তো আমি অনেক সাহেবের চেয়ে বেশি ভক্তি করি। তখনো করতাম; কিন্তু কেমন মনে হল যে, এই উৎসবে জবরদস্তি করে খ্রীস্টানি ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদিগকে খাটো করার মতলবে। দাঁড়িয়ে উঠতে পারলাম না। বসেছিলাম বড়ো সাহেবের কাছেই। তিনি বার দুই কটমট করে তাকালেন, হয়তো আমাকে অসভ্য বেয়াদব ভেবে বিরক্ত হলেন। কিন্তু উপায় কি?

প্রার্থনার পর ভিত্তিস্থাপন করার জন্য সাহেব উঠলেন। একটা হৈ চৈ হল। সেই সুযোগে আমি সটকে বেরিয়ে বাড়ি পালালাম। শেঠজি উৎকৃষ্ট জলযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেটা আর আমার অদৃষ্টে জুটল না।

ব্যাপারটা অকিঞ্চিৎকর। আমাকে কর্তাদের কাছে বকুনি খেতে হয় নেই। কিন্তু শহরের ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল বইকি, কেননা পরে আট-দশদিন পর্যন্ত আমাকে নিন্দাবাদ ও স্তুতিবাদ দুই শুনতে হয়েছিল। আমি তো তখন ছেলেমানুষ, এই একটু notoriety (কুখ্যাতি) বেশ ভালোই লেগেছিল।

১৯০৮ সালে আমি দ্বিতীয়বার আহমদাবাদে চাকরি করতে যাই। কিন্তু তখন আবহাওয়া একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। গুজরাত তখন ধীরে ধীরে গান্ধীজির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে কি ভালো, কি মন্দ তা আমি বুঝি না। সরকারী মানুষের বোঝার কথাও নয়। তবে আট বছর পরের আহমদাবাদের সঙ্গে সামাজিক হিসাবে আমার বেশ বনেছিল।

এইবার পল্টনের লোকেদের সম্বন্ধে দুটো একটা গল্প বলব। বাক্-বিতণ্ডার কথা কিছু নয়। সামান্য ব্যাপার। তবু এর থেকেও আমার শিক্ষা যথেষ্ট হয়েছিল। তখনকার দিনে আহমদাবাদ ক্যাম্পে সদাসর্বদা গোটা দুই পল্টন থাকত। আমাদের আমলা মহলের প্রথা এই ছিল যে, কেউ নূতন লোক এলে সে অফিসারদের mess-এ একটা কার্ড ছেড়ে আসত, আর তার এই সৌজন্যের বদলে রেজিমেণ্টের বড়ো কর্তা তাকে mess-এর মেম্বার করে নিতেন। আমার অদৃষ্টে গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া ছিল। তাই আমার এক সাহেব মুরুব্বির পরামর্শে তোপখানার মেসে টিকিট রেখে এলাম। অফিসাররা কিন্তু আমাকে মেসে মেম্বার করলেন না। আমার ইংরেজ বন্ধুরাই সুযোগ পেয়ে

এই বিষয় নিয়ে আমাকে বেশ একটু রগড়ালেন। তাঁদের একজন এই বলে খুব দরদ দেখালেন, "পল্টনের লোকগুলো বড়ো অসভ্য গোঁয়ার। তোমাকে ইচ্ছা করে অপমান করলে।"

কথাটা কিন্তু একেবারে মিথ্যা। পল্টনের লোকেরা অন্য সাহেবদের চেয়ে ঢের বেশি gentleman— জাতে নয়, স্বভাবে। আমাদের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ এই কথা বলতেন। তাঁর চেয়ে বেশি আর সাহেব-সুবোকে কে দেখেছে! আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম কোনোদিন দেখি নেই। এই আহমদাবাদ তোপখানার বড়ো কর্তা মেজর D. সৌজন্যে উদারতায় কারো চেয়ে খাটো ছিলেন না। আমাকে mess-এ নিলেন না বটে, কিন্তু অন্য সকলের আগে সপরিবারে আমাদের বাড়ি call (দেখা-শুনো) করে গেলেন। পল্টনের ছোকরারা সাদাসিধে খোলাখুলি আমুদে মানুষ ছিল। আগেই বলেছি দুই-একজনের সঙ্গে আমার খুব বনে গেছল। অবশ্য একবার আক্কেল-সেলামীর পর আমি আর কোনো mess-এ কখনো কার্ড রাখতে যাই নেই। কিন্তু সেজন্য আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। এ-সব ব্যাপারে মান-অভিমান করাই বৃথা। কোনো রকমে নিজের মান ইজ্জত বাঁচিয়ে চলতে পারলেই হল। এর বেশি করার কারো সাধ্য নেই। তখনো ছিল না, আজও নেই।

D. সাহেবের একটা গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। বেশ মজার গল্প। পাঠক বুঝবেন যে, সরকারী চাকরিতে departmental-বিদ্বেষ জাতি-বিদ্বেষের চেয়ে বড়ো কম যায় না। একবার আমি দুর্ভিক্ষের কাজে প্রান্তীজ বলে এক স্থানে গেছি। সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছে ডাকবাংলায় যাওয়া মাত্র আমার বয় দুখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, "ব্যাটারির মেজর সাহেব এই বাংলায় ছিলেন। আজ সকালবেলায় চলে গেছেন। কাল আপনার জন্য তিনিই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, আমাকে কিছু করতে দেন নেই। আমাদের জিনিসপত্র স্টেশন থেকে আজ সকালবেলা আনিয়েছি।"

চিঠি দুখানা খুললাম। দুটোই মেজর D. লিখেছেন। একটা আগের দিন ডাকবাংলাতেই লেখা। আর অন্যটা সেইদিনই সকালবেলা রেলওয়ে স্টেশনে লেখা। প্রথম খানার মজকুর, "কাপ্তান C. ও আমি দুজনেই সারাদিন শিকার করে বড়ো শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। শুতে চললাম। অপরাধ নিয়ো না।

তোমার শোবার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে। আমার বয় গরম সুরুয়া ও ঠাণ্ডা শিকারের মাংস তোমার জন্য তৈরি রেখেছে। সকালবেলা দেখা হবে।"

দ্বিতীয় চিঠিখানাতে লেখা ছিল— "আমরা চললাম। তোমার সঙ্গে দেখা হল না। সেজন্য বড়ো দুঃখিত। আজ একটা বড়ো বদ ঘটনা ঘটেছে এই স্টেশনেই। তোমার একজন পুলিস সেপাই আমাকে অপমান করেছে। প্রভুভক্তি খুব উত্তম জিনিস, এ কথা আমি মানি। কিন্তু আমার প্রাপ্য সম্মানে আমাকে বঞ্চিত করলে আমি তা বরদাস্ত করব কেন? তোমার সেপাইকে এটা, আশা করি, বুঝিয়ে দেবে।"

বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছিল রে স্টেশনে?"

সে বললে, "সাহেব, আমাদের কোনো কসুর নেই। আমাদের মালের জন্য খানতিনেক গোরুর গাড়ি ধরা হয়েছিল। মেজর সাহেবের দুজন গোরা এসে সেই গাড়ি নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। মহম্মদ খাঁ সেপাই কিছুতেই গাড়ি ছাড়লে না। বললে, তোমরা অন্য গাড়ি ধরো গিয়ে। গোরারা বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল। কিন্তু খানিক পরে মেজর সাহেব স্টেশনে এসে মহম্মদকে ডেকে পাঠিয়ে খুব গালাগালি করলেন। সেও একটু চোখাচোখা কথায় জবাব দিলে। সাহেব চটে তাকে এক ধাক্কা মেরে বললেন, "নিকল যাও উল্লু! আমি তোমার সাহেবের কাছে রিপোর্ট. করব।" মহম্মদ এইটুকু বলেছিল বটে, "সাহেব, তুমি আমার গায়ে হাত দিও না, আমি অন্য অফিসারের সেপাই।"

পরদিন মহম্মদ ও অন্যান্য চাকর-বাকরদের জিজ্ঞেস-পড়া করে বুঝলাম যে, বয় আমাকে সত্যি কথাই বলেছিল। স্টেশন-মাস্টারবাবুও আমাকে একই কথা বললেন। মহম্মদ কিছু দোষ করেছে বলে তো মনে হল না। তবু তাকে একটু ধমকে দিয়ে বললাম, "তুই সাহেব-সুবোর সঙ্গে বে-আদবি করিস, এত বড়ো তোর স্পর্ধা!" সে অম্লানবদনে উত্তর দিলে, "হুজুর, আমি তোমার নোকর, মেজর সাহেবের তো নই। তুমি যা সাজা দেবে দাও।"

D.-কে চিঠি লিখলাম, "সেপাই মহম্মদ খাঁকে খুব ধমকে দিয়েছি। পুলিস-সাহেবের কাছে তোমার চিঠিখানা পাঠিয়েছি। তিনি যেরকম ভালো বুঝবেন, করবেন। আমি এই ব্যাপারে যথার্থ বড়ো ক্ষুণ্ণ হয়েছি।"

পুলিস-সাহেবের পত্র এল দিন দুই পরে, "মহম্মদ খাঁ সেপাইকে আমার

কাছে পাঠিয়ে দিও। সে বাহাদুর লোক। কিছু বকশিস্ দেব। পল্টনের লোকগুলো বড়ো বাড়াবাড়ি করে তুলেছে।" এই পুলিস-সাহেবও ইংরেজ, D.-ও ইংরেজ। অথচ মহম্মদ খাঁ সত্যিই টাকা পাঁচেক বকশিস্ পেলে!

D.-র কাছ থেকেও উত্তর পেলাম, "তুমি সেপাইকে ধমক দিয়েছ, এই যথেষ্ট। পুলিস স্থপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে কোনো প্রতিবিধানের আশা আমি করি না। তাকে কেন আমার চিঠি পাঠাতে গেলে?"

এ গল্পের উপর কোনো টীকা অনাবশ্যক।

যাক্, এ-সব অপ্রিয় গল্প ঢের বলা হয়েছে। এখন আমাদের ক্যাম্প-জীবনের দু-চার কথা বলি। হয়তো সকলেরই ভালো লাগবে। বোম্বাই এলাকায় প্রান্ত বা মহকুমায় হাকিমদের বছরে মোট সাত মাস ঘুরে বেড়াতে হয়। দেওয়ালী হয়ে গেলেই তাঁরা বেরিয়ে পড়েন, আর মে মাসের শেষে সদরে ফেরেন। মাঝে এক বড়োদিনের ছুটি। তখনো বেশির ভাগ লোক বাড়ি ফেরেন না। কোথাও না কোথাও বড়োসাহেবদের শিকারক্যাম্পে নিমন্ত্রণ জুটে যায়। এই সাত মাস একেবারে পুরোদস্তুর বেদে-জীবন করতে হয়। গড়পড়তা পাঁচদিন করে এক-এক জায়গায় ডেরা থাকে। পাঁচদিনের দিন আবার সাজ সাজ রব। এক-একটা মহকুমায়ও তিনটা তালুক বা তহশীল। প্রত্যেক তহশীলে আবার মুন্সেফ-কাছারি আছে। তহশীলের সদরে সাত-আট দিন কাটাতে হয়, কারণ সেখানে নানারকম খুচরো কাজ থাকে। তবে প্রান্ত-হাকিমের নিত্য কর্ম মানে গ্রাম-পরিদর্শন। এক-এক প্রান্তে প্রায় নয়শো গ্রাম থাকে। তিন বছরে সব গ্রামগুলো একবার করে দেখে আসা চাই। গ্রাম দেখে আসা মানে কি, সেটা আমার পাঠকদের বুঝিয়ে বলছি।

পাঠক বোধ হয় জানেন যে ওদেশে জমিদার নেই। চাষীরা সরকারের রাইয়ৎ। তারা সোজাসুজি খাজনা দেয় সরকারের হাতে। তাই ছোটো-বড়ো সকল হাকিমেরই প্রধান কাজ হচ্ছে খাজনা আদায়।

এই খাজনা আদায়ের জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে পটেল তলাটী নিযুক্ত আছে। এরা আগেকার দিনে নগদ মাইনে পেত না। বংশ-পরম্পরায় চাকরান্ জমি উপভোগ করত। এই পটেলকে সবচেয়ে ছোট্ট হাকিম বলা যেতে পারে। তলাটী হচ্ছেন তাঁর দেওয়ানজি। তাঁর লেখাপড়ার কাজ করে দেন, হিসেব-পত্র রাখেন। তলাটীকে অনেকগুলো খাতাপত্র রাখতে হয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে

ledger, যাকে বলে খাতাবহি। এই ledger-এ প্রত্যেক রাইয়তের নামে এক-একটা আলাদা খাতা আছে। খাজনা বাবদ যা কিছু আদায় হয়, তা তলাটী তৎক্ষণাৎ দাখিল করে প্রথম এই খাতায়, তার পর রাইয়তের নিজের কাছে যে রসিদ বই তাইতে। আমাদের প্রধান কাজ ছিল কুল-রুজুয়াৎ, অর্থাৎ গ্রামে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে হাঁকডাক করে বিশ-পঁচিশজন রাইয়ৎ জমা করে তাদের প্রত্যেককে মুখে-মুখে জিজ্ঞাসা করা, "এ বছর কত উসুল দিয়েছিস?" তার পর রসিদ বই আর খাতাবহি মিলিয়ে দেখা ঠিক জমা হয়েছে কিনা।

গুজরাতে দেখেছিলাম খাজনার সঙ্গে সঙ্গে টাকা-পিছু এক পাই গ্রাম-খরচ ফণ্ড বলে আদায় করা হত। এই ফণ্ডেরও একটা রীতিমত হিসেব রাখত পটেল তলাটী। তবে সে হিসেব তো আর আমাদের সামনে উপস্থিত হত না! প্রথম প্রথম আমি জিনিসটা বুঝতাম না। ছোটো জাতের, কি বুড়ো-হাবড়া কোনো চাষাকে হয়তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি রে কত উসুল দিয়েছিস।" সে উত্তর দিলে, "পাঁচ টাকা পাঁচ আনা পাঁচ পাই।" পাঁচ টাকা তো বুঝলাম, খাজনা। পাঁচ আনা লোকাল ফাণ্ড সেস্, তাও বুঝলাম। কিন্তু পাঁচ পাইটা কি হল? খাতায় রসিদে তো জমা রয়েছে মোট পাঁচ টাকা পাঁচ আনা! পটেলকে জিজ্ঞাসা করায় সে হেসে জবাব দিল, "আনাড়ী চাষী কি না ওরা! ঐ রকম কথা কয় সাহেব।" তার পর হয়তো লোকটার দিকে ফিরে চোখ রাঙিয়ে বললে, "সরকারকে কত দিয়েছিস, ঠিক ঠিক বল।" তখন সে থতমত খেয়ে উত্তর দিল, "সরকারকে দিয়েছি পাঁচ টাকা পাঁচ আনা।" পাঁচ পাইটা ধামা চাপা পড়ে গেল। এইরকম বারকতক হল।

একদিন এক গাঁয়ে চাউরীতে (পটেলের কাছারি-বাড়ি) রাত্রিবাস করছি। নন্দী-ভৃঙ্গি সঙ্গে কেউ নেই। খাওয়া-দাওয়ার পর পাটিদার চাষীরা সব গড়গড়া নিয়ে এসে চারি দিকে বসেছে। বিলেতের, বোম্বাই শহরের, বাংলা দেশের কত কথাই জিজ্ঞাসা করছে। যখন খুব আসর জমেছে, আমি হঠাৎ আমার পাঁচ পাইয়ের সমস্যার কথা পাড়লাম। বললাম, "আজ আমাকে বলতেই হবে এ ব্যাপারটা কি। গাঁয়ে গাঁয়ে তোমরা সব এত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ পাটিদার থাকতে তলাটী এইরকম করে গরিবগুরাবা রাইয়ৎকে ঠকিয়ে পয়সা খাবে।"

আগেই বলেছি পাটিদার জাতটা একটু হাঁদা। আমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ

বলায় ওরা ভারি খুশি হয়ে গেল। আর তখন রাত বারোটাও বেজে গেছে। মনের কথা খুলে কওয়ার ঐ তো সময়! পটেল সব ফাঁস করে দিলে গ্রাম-খরচ ফণ্ডের কথা। পাই পাই করে যে টাকাটা পটেল তলাটী জমা করে, সেটা খরচ হয়ে যায় গ্রামের অতিথিদের সেবায়। অতিথি কে? না, সাধু-সন্ত, কথক-কীর্তনীয়া, সেপাই-পাহারাওয়ালা, ও সবশেষ হাকিম ও হাকিমের পার্শ্বচরবৃন্দ। অতি সংকোচে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে যে আজ খাওয়ালে, সে কি গ্রাম-খরচ ফণ্ড থেকে?"

পটেল হেসে বললে, "না সাহেব, তোমার ভয় নেই। আমার ঘরে যা খুদ-কুড়ো ছিল তাই তোমাকে খাইয়েছি। দু আনার বেশি খরচ হয় নেই।"

আমরা ক্যাম্পে যা খেতাম দেতাম তার দাম বরাবর ধরে দিয়েছি, এ কথা আপনাদিকে হলপ পড়ে বলতে পারি। তবে দাম দিতাম তালুকা-কাছারির নিরিখ অনুসারে। নিরিখের ভাউ আর সত্যিকার বাজার দর, এ দুয়ের মধ্যে যে তফাৎ, সেটা সব বড়ো গাঁয়ে গ্রাম-খরচ ফণ্ড হতে পুরিয়ে দেওয়া হত। নন্দী-ভৃঙ্গিরা কতটুকু কে দাম দিতেন, তা আমি জানি না। আমি নিজেও কি দরে কি কিনতাম তা এখন সব মনে নেই। তবে ছোটো পাঁটা কি ভেড়ার জন্য একটি টাকার বেশি কখনোও দেই নেই। সেই জানোয়ারের ছালটা আবার চাকরেরা পরে আনা ছয়েকে বেচত। কাজেই বুঝতে পারছেন যে গণ্ডা দশেকে একটা পাঁটার ছাল বাদে সমস্ত দেহটা পাওয়া যেত। দুর্মূল্য বলা যায় কি? আমি বিবেকের তাড়নায় আমার বড়ো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে নিদেন দুটো টাকা দিতে পারি কি না। তিনি একটু মনের আবেগেই জবাব দিয়েছিলেন, বেশ মনে আছে, "বাজার-দর বেগড়াবার কোনো অধিকার তোমার নেই।"

আমি তাই বাজার-দর বেগড়াবার কোনো চেষ্টাই করি নেই। অন্যরকমে গ্রামের লোকের কিছু সাহায্য যদি করতে পারতাম তো করতাম। সঙ্গে কিছু কিছু কাপড়-চোপড় কম্বল ইত্যাদি থাকত। বাড়ির এঁরা গরিব-দুঃখী দেখে দুই-একখানা দিতেন, ঔষধপত্রও বিতরণ করতেন। তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে যা দিতাম তার চেয়ে অনেক বেশি নিতাম। জজ হয়েও ক্যাম্প করেছি। তবে তখন আর কোনো ল্যাঠা ছিল না। আর পাঁচজনের

মতো বাজারে নগদ দাম দিয়ে রসদ কিনতে হত। যেটুকু দিতে পারতাম সেটা দেওয়াই হত, কারো কিছু নিতে হত না।

কোনো তালুকায় ক্যাম্পে গেলেই সেখানকার কাছারি হতে দুজন চাপরাশি সাহেবের রসদ-সংগ্রহের কাজে মোতায়েন হত। এ বেচারাদের বড়ো দুর্দশা, কেননা অনেক দেবতাকে তুষ্ট রাখতে হত। সাহেব-মেমসাহেব তো আছেনই। তার উপর আবার সেরেস্তাদার রাও সাহেব, বটলার সাহেব, মেস্ত্রী সাহেব (cook), গারদের নায়েক সাহেব, এদের প্রত্যেকের ফরমায়েশ খাটতে হত। সময় সময় এমনও দেখেছি যে, ক্যাম্পে রজক মহা তম্বি করছে যে তার একটা পুকুর চাই নইলে হুজুরদের কাপড় ধোবে কোথায়!

তবে এরা জাতে চাপরাশি, আপন সুবিধা একটু আধটু করে নিত বই-কি! বেশি বাড়াবাড়ি করলে ধরা পড়ত, নইলে নির্বিবাদে নিজের তথা অন্যের কাজ বাজাত। একটা গল্প বলি উদাহরণ-স্বরূপ। একদিন সকালবেলায় ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের উপর এক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়ে পৌছলাম, গাঁয়ের চারি দিকে উঁচু দেওয়াল, চার কোণে বুরুজ, একেবারে রীতিমত ছোট্টো কেল্লাটি। পাহাড়ের গায়ে সবুজ ঘাসের উপর অজস্র মহিষ, ভেড়া, ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও ক্ষেত-খামারের চিহ্ন দেখলাম না। বুঝলাম এটা ভরোয়াড়দের গ্রাম। এই ভরোয়াড়রা বংশপরম্পরায় মেষপালক। পশুর পাল রাখা আর কম্বল বোনা, এই এদের দুই ধান্দা। চাষ-বাস করা এদের আসে না। লম্বা চওড়া জোয়ান, হাতে লম্বা লাঠি, কাঁধে মোটা কম্বল, ইয়া বেরালের মতো গোঁফ, এরা দেখতে বাস্তবিক সুপুরুষ। গাঁয়ের ফটকে পৌছতেই ছেলে-ছোকরার দল দৌড়ে এল। আমি ফটকের কড়ায় ঘোড়ার লাগাম বেঁধে এগিয়ে গিয়ে চাউরীর দাওয়ায় বসলাম। এক ভরোয়াড়ী বুড়ি কোথা থেকে দৌড়ে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কোনো রকমে তাকে চুপ করিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে বাই? আমাকে বুঝিয়ে বল্।"

সে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলে, "তুমি কোন্ সাহেব বাবা? প্রান্ত সাহেব? আচ্ছা বাবা তুমি দুধওয়ালী ছাগলের মাংস খেতে ভালোবাস?"

আমাকে কবুল করতে হল যে কিরকম ছাগলের কিরকমের মাংস হয় সে বিষয়ে আমি একেবারে অজ্ঞ। বুড়ি ফের আমায় জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে তোমার সিপাই এসে আমার বড়ো পাঁঠীটাকে ধরল কেন?"

এমন সময় পটেল মাতব্বরেরা এসে পড়ল। তারা বুড়িকে তাড়া দিলে, "যা যা সাহেবকে বিরক্ত করিস না। একটা ছোটো বাচ্চা তো নিয়ে গেল সেপাইটা। তার জন্য একটা টাকা পাবি। আবার কত চাই?"

বুড়ি কি সহজে ছাড়বার পাত্র! ফের আমার পায়ে মাথা কুড়তে লাগল, "এক টাকা দিয়ে তোমার যত ইচ্ছা পাঁঠা নিয়ে যাও, সাহেব বাবা। আমি আপত্তি করব কেন? আমি কি নিমকহারাম মানুষ! কিন্তু আমার পাঁচটা টাকা কেড়ে নিয়ে গেল যে তোমার সেপাইটা!"

তখন ধীরে ধীরে জেরা করে যা বুঝলাম তা এই যে, চাপরাশিটা আগের দিন বদমায়েশি করে বুড়ির বড়ো এক দুধওয়ালী পাঁঠী ধরে। তার পর বুড়ি হাতে পায়ে ধরাতে পাঁচ টাকা ঘুষ নিয়ে সেটাকে ছেড়ে দিয়ে এক ছোটো বাচ্চা নিয়ে যায়। লোকটার খুব বুদ্ধি বটে! কিন্তু এইরকম করলে আমার যে রাক্ষস বলে খ্যাতি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়বে! দেখলাম গাঁয়ের পটেল মাতব্বররা এ বিষয়ের কিছু জানে না। ক্যাম্পে ফিরলাম। রসুল সাহেব চাপরাশির কাছ থেকে পাঁচটা টাকা বের করতে বিশেষ কষ্ট হল না। তবে তাকে শাস্তি দিতে পারলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, আমিই বা কিসের এত সাধু পুরুষ! পাঠক মনে রাখবেন আমি তখন একেবারে ছেলে-মানুষ। মনোবৃত্তিগুলোর উপর কড়া পড়ে যায় নেই।

৩

জীবনযাত্রার আরম্ভে এই যে বছরে সাত মাস ঘর-সংসার মাথায় করে গাছতলায় গাছতলায় ঘুরে কাটালাম, এইটাই হল আমার Post-graduate পাঠাভ্যাস। নইলে ও-সব বালাই তো আর বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় নিই।

মনের মতন কলেজ জুটল। বিশাল বিদ্যায়তন, শিক্ষক অগণন, শিক্ষাও শতমুখী। কত কি যে শিখলাম, তা বলে শেষ করা যায় না! তবে এইটুকু বলতে পারি যে, এতদিন জল্পনা-কল্পনা, বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্কের কুয়াশার মাঝে যে মূর্তি আবছায়ার মতো যাওয়া-আসা করছিল, সে মূর্তি আজ দিব্যজ্যোতিঃমণ্ডিত হয়ে পরিপূর্ণ গৌরবে এসে দাঁড়াল আমার মনের পটে। আমি ধন্য হলাম। কার অদৃষ্টে কোথায় দেবীদর্শন লেখা থাকে, তার কি কিছু স্থিরতা আছে?

যাক্, ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে জটলা করে কাজ নেই। আমার ক্যাম্প-জীবনের গল্প করি শুনুন। ক্যাম্প বললেই হয়তো আপনাদের মনে আসবে গ্রাম থেকে বহুদূরে, নদীর কিনারে নিরালায়, আমবনের ঘন-ছায়ার মাঝে, ধবধবে সাদা সারি সারি তাঁবুর চিত্র। কিন্তু সে হল বড়ো বড়ো সাহেব স্থবোর ডেরার ছবি। আমাদের তাঁবুগুলো একে তো ছিল বেশির ভাগ second-hand (পুরানো), তায় আবার বার কতক তোলা-ফেলার পরে তাদের সর্বাঙ্গে ধুলো কাদার ছাপ পড়ে যেত। তাদিকে দুগ্ধফেননিভ কি রজতশুভ্র বলার কোনো উপায় ছিল না। তার পর ছায়াবীথি-তলে তাঁবু খাটানো, তাও প্রথম বছর-দুই বড়ো একটা হয়ে উঠত না। ছাপ্পান্ন সংবতের অনাবৃষ্টির ফলে অধিকাংশ গাছের পাতা সব শুকিয়ে পড়েছিল। দু-তিনটা বর্ষাকাল লাগল গাছগুলার পূর্বশ্রী ফিরে আসতে। দু-চার বার নদীর ধারে ডেরা করেছি বটে, তবে পাঁচ-ছয়দিন অন্তর নূতন নূতন নদী আর কোথায় পাব ঐ পাথর-বালির দেশে। ওরই মধ্যে একটু ছায়া আছে এইরকম দেখে তাঁবু তুলতে হত। তাও আবার সব সময় হয়ে উঠত না পানীয় জলের হাঙ্গামে। কাছাকাছি গোটা দুই ভালো কুয়ো আছে দেখে তবে মামলৎদার (Sub-Deputy) সাহেব ক্যাম্পের জায়গা পছন্দ করে দিতেন। নইলে অতগুলো মানুষ ঘোড়ার জল আসবে কোথা থেকে! স্থতরাং সব সময় গ্রাম থেকে বহুদূরে নিরালায় বাসও সম্ভব হত না। কখনো কখনো সারারাত গ্রামের কুকুরগুলোর কোরাস্ শুনতাম। মেজাজটা আপনা হতেই সকাল নাগাদ হাকিম জনোচিত হয়ে উঠত।

ক্যাম্পের ভেতরের ব্যবস্থার কথা বলি শুনুন। একপাশে আমাদের নিজের বসবাসের দুটো বড়ো তাঁবু থাকত। অন্য পাশে প্রায় একশো কদম তফাতে আমার কাছারি ও আমলাদের দপ্তরের জন্য দুটো মাঝারি গোছের তাঁবু খাটানো হত। মাঝখানের জায়গাটায় থাকত চাকর-বাকরদের ছোটো ছোটো পালগুলো, কানাত-ঘেরা রান্নার স্থান, আর গাড়ি ঘোড়া। এই এতগুলো তাঁবু, সমস্তই জোগাতে হত আমাকে। সেই বাবতে সরকারের কাছ থেকে tentage বলে মাসে এগারো টাকা কয়েক আনা পেতাম। পট্টাবাসের বহর তো শুনলেন, কিন্তু যতদূর সম্ভব সময়টা কাটত বাহিরে গাছতলায় কি বড়ো জোর তাঁবুর বারান্দায়। চাকর-বাকর তো সব পড়ে থাকত খোলা হাওয়াতে। খুব শীত

না পড়লে পালের ভিতর কেউ ঢুকত না। আর আমার at fresco হেঁসেলে পাউরুটি কেক্ থেকে আরম্ভ করে সব জিনিসই রান্না হত। অতিথি-অভ্যাগত কেউ থাকলে আবার আমার পাচক ফরাসী ভাষায় menu লিখে টেবিলে লাগিয়ে দিত। কিন্তু খাওয়াটা হত গাছতলায়।

এ সব হিসেব দিচ্ছি fair weather-এর অর্থাৎ যখন দেবতা পরিষ্কার। কিন্তু মাঝে মাঝে ঝড়-তুফান বৃষ্টিবাদলও তো হত। আকাশে মেঘ উঠলেই সামাল সামাল রব উঠত। চাকর-বাকরেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের mallet (মুগুর) নিয়ে তাঁবুর খুঁটোগুলোর মাথায় ঠকাঠক্ ঠুকতে লেগে যেত। যদি তেমন তেমন দেখত, তো বড়ো বড়ো সওয়াই রশির ডগাগুলো সমস্ত গাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে বেঁধে ফেলত। প্রত্যেক তাঁবুর চারধারে ছোটোখাটো একটা পরিখা খুঁড়ে মাটিটা ঢালু করে দিত কানাতের গোড়ায়। সময় থাকতে এই-সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলে ভেতরে বৃষ্টির জল একটুও ঢুকতে পারত না। ঝড়-তুফানে আমার তাঁবু কখনো সত্যিসত্যি ভূমিসাৎ হয় নেই, তবে সময়ে সময়ে এমন হয়েছে যে ভেতরে হাওয়া ঢুকে তাঁবুর থামগুলোকে এমন নাচাতে শুরু করেছে যে আমরা ভয়ে বাহিরে পালিয়ে গেছি। এরকম সময়ে সবচেয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হত বাতিগুলোকে নিয়ে। খড়-পাতা মেজে, তার উপর একটা বাতি উলটে পড়লেই তো লঙ্কাকাণ্ড! তখনকার দিনে বিজলীর টর্চ ছিল না। থাকলে ঝড়-বৃষ্টিতে আমাদের বড়ো সুবিধা হত।

বৃষ্টি-বাদলকে বরং বাগানো যেত, কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঠ-ফাটা রৌদ্রে। আগেই বলেছি আহমদাবাদের দুর্ভিক্ষের বছর গাছের পাতা সব ঝরে পড়ে গেছল। কাজেই তাঁবুর মাথার উপর ছায়া বড়ো একটা পাওয়া যেত না। তার পর বালির দেশ, এগারোটা বাজতে না বাজতে লু ছুটত। বেলা একটা থেকে তিনটা অবধি তাঁবুর ভেতরটা দারুণ তেতে উঠত। অথচ ঐটাই ছিল বিশ্রামের সময়। কি করা যায়, খস্-খস্ কি জওয়াসারের (camel's thorn) টাটি ভিজিয়ে ভিজিয়ে রেখে তাপটা একটু সহনীয় করে নেওয়া হত। দিবানিদ্রা একটা ব্যসন, তা আমি মানি। কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না। আমার শহুরে পাঠকমণ্ডলী হয়তো ভাবছেন, "ওঃ, এর নাম তুমি চাকরি করতে! সারা বিকেলটা ঘুম!" কিন্তু আমার নিবেদনটা একটু শুনে নিন। তার পর ইচ্ছা হয়, রাগ করবেন। আমি রোজ (রবিবার

ছাড়া) সকালবেলা সাড়ে পাঁচটার সময় ঘোড়া কি উটের পিঠে বেরিয়ে পড়তাম। গড়পড়তা দুটো গ্রাম দেখে, কিছুক্ষণ বা শিকারের ধান্দায় ঘুরে, ডেরায় ফিরতাম বারোটার কাছাকাছি। একটু ঠাণ্ডা হয়ে স্নান ভোজনাদি শেষ করতে একটা বেজে যেত। তার পরে যদি খানিকক্ষণ বিশ্রাম না করতাম, তা হলে বিকেল বেলায় কাছারিতে কলম পেষার কাজ কি মোকদ্দমা-মামলার কাজ সব গুলিয়ে যেত। সেও তো আপনাদেরই কাজ, ভালো করে না করলে আপনারাই নারাজ হতেন। তাই বলছিলাম, একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ছুটি না নিয়ে উপায় ছিল না।

একবার কিন্তু এই দিবানিদ্রা দিতে গিয়ে ভারি জব্দ হয়েছিলাম। সেদিন বেজায় গরম ছিল— তাপ ১১৬ ডিগ্রীর বেশি। আমার ক্যাম্পে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে গেছল। মোকদ্দমা-মামলা কিছু হাতে ছিল না। শুধু গোটা কয়েক ইন্‌কম্ ট্যাক্স-এর আপিল ছিল। তা সেগুলোর তো মা-বাপ নেই— পুরোপুরি কাজির বিচার, বেশি সময় নিত না। তাই দেরি করে আপিসে বসব বলে দিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্যাম্পটা ছিল বিশ্রী জায়গায়। চারি দিকে ক্রোশের পর ক্রোশ নোনামাটির ময়দান ধূ-ধূ করছে। গাঁয়ের কাছাকাছি তিনটে আধমরা নিমগাছের মাঝে আমার জন্য একটা বড়ো তাঁবু কোনো রকমে খাটানো হয়েছিল। মাঠের উপর দিয়ে হু-হু করে লু বইছে। ভিজে টাটির কাছে মাথা রেখে শুয়েছি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। হঠাৎ জেগে উঠলাম। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। গলার উপর, বুকের উপর কে যেন দু মণ পাথরের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। চেয়ে দেখি মাথার কাছে টাটিটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আর তার ভেতর দিয়ে ঝলকে ঝলকে আগুনের মতো গরম হাওয়া ঢুকছে। পাশে একখানা তোয়ালে পড়ে ছিল, সেইটা তাড়াতাড়ি টব-এ ডুবিয়ে নিয়ে মাথায় জড়িয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। কপালের জোরে মাথায় বুদ্ধিটা এল তাই কয়েক মিনিট বাদে সামলে গেলাম। নইলে আপনাদিগকে পুরানো কথা শোনাবার সৌভাগ্য হত না। যে চাকরটার উপর টাটিতে জল দেওয়ার ভার ছিল সে বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার সেই রাত্রে খুব জোরে জ্বর এল, কিন্তু সেও বেঁচে গেল শেষ পর্যন্ত।

ক্যাম্প-জীবনে অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ, শোক-তাপ সবই পোহাতে হয়েছিল। সে তো মানুষকে সর্বত্রই পোহাতে হয়। ইংরেজিতে একটা কথা

আছে— All in the day's work— ও সব নিত্য কর্মের অঙ্গ। কিন্তু এই গাছতলায় বাসের মধ্যে যে মজা আছে, যে রস আছে, তা রাজপ্রাসাদেও নেই। আপনারা সবাই তো picnic (বনভোজন) করতে যান, কেউ কেউ শিকার উপলক্ষেও বাইরে গেছেন, তাতে কত মজা, তা সকলেই জানেন। কিন্তু দিনের পর দিন কাঁথার ঘরে বাস, দিনের পর দিন বনভোজন, দিনের পর দিন শিকার, এ আনন্দের তুলনা নেই। ছেলেবেলায় আমরা সবাই রোদে বৃষ্টিতে ছুটোপাটি করে বেড়াতে ভালোবাসি। তখন কেউ ঘরে বসে থাকতে বললে রাগ হয়। কিন্তু একটু বয়স হলেই কি যেন হয়ে যায়। আর কেউ হাত পা নাড়তে চাই না। তখন জন দশেকে জটলা করা তক্তাপোশে বসে জীবনের একটা বড়ো জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। এটা কেন হয় আমাদের? সাহেবদের তো হয় না। এভারেস্ট-অভিযান ইত্যাদি বড়ো কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রেও ব্যারাকপুর পার্কে দেখতে পাই সারাদিন সাহেব মেমেরা গল্‌ফ্‌ খেলে বেড়াচ্ছে। বোধ হয় আমরা প্রাচীন সাত্ত্বিক জাত বলে নিশ্চল নিষ্ক্রিয় ভাবটা বড়ো ভালোবাসি। কিন্তু সত্ত্বগুণের মাঝে খাওয়ার কি শেষ নেই? হেমচন্দ্র তো অনেক কাল আগে লিখেছিলেন— যাও সিন্ধুনীরে ভূধরশিখরে; গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে, বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে ইত্যাদি ইত্যাদি। কই, আজও তো কোনো ফল হল না! আমি politics এর কথা বলছি না— যাক্‌ গে, এ-সব বড়ো ব্যাপারের গবেষণা করে কাজ নেই, নিজের গল্পই বলি।

আমাদের এই দীর্ঘ বনপ্রবাস যদি শুধু অশ্বারোহণ ও মৃগয়াতেই কাটত তা হলে এত মজা লাগত না, দুদিনে অরুচি ধরে যেত। কিন্তু এর সঙ্গে যে কাজ মেশানো ছিল, সেই কাজটাই যে romance-এ ভরা। সত্যি কিছু করতে পারি আর না পারি, মনে তো হত যে গরিব-দুঃখীর সেবা করছি, প্রবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করছি। এ আদর্শের জন্য মানুষ তো চিরদিনই কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এসেছে! অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে আমাদিকে কোনো যথার্থ কষ্ট সহ্য করতে হত। বরং মনিবের আদেশ ও ব্যবস্থা ছিল যে আমরা কতকটা আমীরি চালে ঘুরে বেড়াই। কারো এই চাল সম্বন্ধে ত্রুটি হলে আমাদের কালে কমিশনার ডেকে কান মলে দিতেন। আমার নিজের গোলযোগ একটু অন্যরকমের ছিল। চাল ছোটো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সেরকম শিক্ষা দুজনার কেউই ছোটোবেলায় পাই নেই। ফলে,

মাইনে যা পেতাম তাতে খরচ কুলাত না। অনেকদিন পর্যন্ত বাড়ি থেকে নানা প্রকার সাহায্য নিতে হত।

উপরে যে কান মলে দেওয়ার কথা বলেছি, কথাটা খুব সত্য। কমিশনারদের প্রধান কাজই ছিল জেলায় জেলায় ঘুরে দেখা মেজিস্ট্রেট সাহেবদের চাল বজায় আছে কি না। তবে তারা যে কেবল গুরুমহাশয়গিরি করতেন তা নয়। সকল রকমের বাচ্চা সিবিলিয়ানদের মুরুব্বি ছিলেন। কারো ঘোড়া নেই ঘোড়া যোগাচ্ছেন, কারো বাসন-কোসন কেনা হয় নি বাসন ধার দিচ্ছেন, এ কতবার দেখেছি। লীলী সাহেবের গল্প গেল বারে অনেক শুনেছেন। এই সাহেব সপ্তাহে সপ্তাহে যে প্রকাণ্ড বড়ো খানা দিতেন তা আজকালকার এই ফোপরদালালির দিনে বড়ো একটা দেখা যায় না। কমের কম, সাত কোর্স খানা ও সাত রকম মদ দিতেন। আমার আর-এক কমিশনার ছিলেন কেনেডি সাহেব। তিনি লীলীর চেয়েও সেকেলে মানুষ ছিলেন। দিল্লীকে বলতেন— ডেল-হাই, কানপুরকে বলতেন— ক-অ-ন-পোরী। সে ভদ্রলোকের বাড়ি খানা খেতে গেলে গুড্‌বাই বলবার সময় চার পাঁচটা হাবানা চুরুট— "নিয়ে যাও, গোটা কয়েক নিয়ে যাও," বলে পকেটে গুঁজে দিতেন। চুরুটগুলো আজকের দিনে অন্তত পাঁচটাকা করে দাম হবে।

কেনেডিদের একটা গল্প বলি। আমি তখন কোলাবা জেলায়। কি জরুরি কাজের জন্য কালেক্টর সদরে ডেকেছিলেন। কাজ শেষ করে নিজের ক্যাম্পে ফিরছি। ধরমতরী স্টেশনে জাহাজে উঠে দেখি, কমিশনার-দম্পতি বসে রয়েছেন। তাঁরা বোম্বাই যাচ্ছেন। বৃদ্ধা কেনেডি-গিন্নি তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীকে নিজের আঁচলে বেঁধে নিয়ে বসলেন, আর ঠায় দুটি ঘণ্টা নানা রকম সদুপদেশ দিলেন, "দেখ, তুমি কখনো তোমার স্বামীকে ফেলে পাহাড়ে পালাবে না। আজকালকার মেয়েদের ঐ এক বাতিক হয়েছে— গরম, গরম। কোথায় গরম! তোমার স্বামী যদি ঐ হাওয়াতে আট-দশ ঘণ্টা খাটতে পারে তো তুমি ঘর বন্ধ করে পাখার নীচে পড়ে থাকতে পার না! তোমার কর্তব্য হচ্ছে, ঘর-দোরের ব্যবস্থা ঠিক করে রাখবে, লোকটা যাতে পেট ভরে পোস্টাই খাবারটা খেতে পায় সেইটে দেখবে।" আপনারা হাসবেন না। সে যুগের মেমসাহেবরা সত্যি এইরকম বুদ্ধিহীন বেরসিক ছিলেন। অজ-বুর্জোয়া! সে যাক্, কেনেডি-মেমের কিন্তু যেমন কথা তেমনি কাজ। দুপুর-বেলা টিফিন-টুকরি খুলে স্বামীকে তথা

আমাদিকে দিব্যি উপাদেয় টিফিন খাওয়ালেন। সাহেব তাঁর চির অভ্যাস-মতো গোটা কয়েক চুরুট গুঁজে দিলেন আমার পকেটে। আমাদের নামবার কথা ছিল করঞ্জা বন্দরে। কিন্তু সেখানে যখন পৌছলাম, দেখা গেল যে সমুদ্র বেশ গরম, জাহাজ থেকে lighter নৌকায় নামা একটু কঠিন। মেমসাহেব আমার স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে কি বুঝলেন জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্বামীকে বললেন, "বব, এই ঢেউয়ের মাঝে এদের এখানে নেমে কাজ নেই। মেয়েটির লেগে-টেগে যাবে।"

সাহেব একটু হেসে উত্তর দিলেন, "অলরাইট, ডিয়ার।" তার পর আমার দিকে ফিরে বললেন, "দেখ, তুমি এই জাহাজেই বোম্বাই চলো। কাল সকালে তোমার ক্যাম্পে যেয়ো।"

আমার ভারি ফুর্তি হল, কিন্তু খুব নম্রভাবে বললাম, "কিন্তু মশায়, তা হলে আমার জেলার বাহিরে রাত্রিবাস হবে যে, আমার মেজিস্ট্রেট সাহেবের অনুমতি নেওয়ার তো সময় নেই, তিনি তো বিরক্ত হবেন।"

কেনেডি জোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "আমি তোমার মেজিস্ট্রেটকে লিখব এখন যে আমার অনুমতি নিয়ে তুমি বোম্বাই যাচ্ছ।"

বোম্বাইয়ে মেমসাহেব তাঁর নিজের গাড়ি করে আমাদিকে হোটেলে পৌছে দিলেন, খুব আনন্দে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটালাম। আশ্রিত-বৎসল না হলে বড়ো-সাহেব কিসের!

আশ্রিত-বাৎসল্যের আর একটা গল্প বলব? ব্যাপারটা কিন্তু বে-আইনী। তা হোক্ গে, এখন তো আর চাকরি যাওয়ার ভয় নেই। একবার বড়োদিনের ছুটিতে আমি কলকাতা এসেছি। চাকর-বাকর মাল-পত্র সব আহমদাবাদ সদরে রেখে এসেছি। দোসরা জানুয়ারি ফিরে ক্যাম্পে যাওয়ার কথা। কোনো কারণে (ঠিক অনিবার্য কারণ বলা যায় না) কলকাতায় একদিন আটকে পড়লাম। কিন্তু দোসরা না ফিরলে নানা গোলযোগ। বড়োদিনের ছুটির সঙ্গে কিছু casual leave জুড়ে দেওয়া যায় না— জমিদারি সেরেস্তা ছাড়া। আমার কর্তাকে তার করলাম, "আটকে পড়েছি। ছুটির একটা ব্যবস্থা করবেন।" তেসরা তারিখে সকালবেলায় আহমদাবাদ স্টেশনে গাড়ি পৌছবামাত্র এক পত্র পেলাম, "এখানে নেমো না। সোজা চলে যাও সানন্দ স্টেশনে। তোমার ক্যাম্প পয়লা তারিখে সেখানে পাঠিয়েছি।" চলে গেলাম সানন্দ। ক্যাম্পে

পৌঁছে শুনলাম বড়ো সাহেব আমার সেরেস্তাদারকে হুকুম করে দিয়েছেন যে, দোসরা জানুয়ারি থেকে যেন সব কাগজ-পত্রে আপিসের ঠিকানা সানন্দ ক্যাম্প দেখানো হয়। এক গোয়ালের গোরু তো—হলই বা একটা সাদা, একটা কালো।

আমার সেরেস্তাদার কাগজ-পত্রে কি ভাষায় সাহেবের অনুপস্থিতি না ব্যক্ত করে সানন্দে ক্যাম্পের অবস্থান দেখালেন তা এখন ভুলে গেছি। তবে এঁরা এক-এক সময়ে আশ্চর্য রকমের শব্দ-যোজনা করতেন। একবার আমি ঘোড়া থেকে বড়ো জোর পড়েছিলাম। দিন পাঁচ-সাত বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। যেদিন নানারকম পটী-টটী মেরে প্রথম আপিসে উপস্থিত হলাম, সেরেস্তাদার রাও সাহেব একখানা কাগজ সহি করবার জন্য আমার সম্মুখে রাখলেন। পড়ে দেখলাম কাগজখানা একটা চালু ফৌজদারী মোকদ্দমার রোজনামা। যে তারিখে আমি ঘোড়া থেকে পড়ে গেছলাম, সেই তারিখে এক endorsement (মন্তব্য) রয়েছে—"On this date a crisis occurred. The Honourable Court fell over a horse. Postponed sine die."

আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা আমাকে সই করতে হবে! আচ্ছা মশায়, fell over a horse লিখলেন কেন?"

রাও সাহেব অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, "হুজুর ঘোড়াসুদ্ধ পড়েছিলেন কিনা, তাই fell over লিখলাম।"

আমি ইংরাজি অব্যয়গুলোকে বড়ো ডরাই। চুপ করে গেলাম। আমার অশ্বকোবিদ বলে খ্যাতি বিংশ-শতাব্দীর মহাভারতে লিপিবদ্ধ হয়ে গেল, যদিচ ভাষাটা আর্ষপ্রয়োগ।

যখন ঘোড়ার কথাই উঠল, আপনাদের সঙ্গে আমার "সুলতান"-এর পরিচয় করে দিই। সুলতানের পৃষ্ঠে চড়েই আমার হাকিমী জীবনে প্রথম প্রবেশ ঘটেছিল। আপনারা ধৈর্য ধরে ওর গল্পটা শুনবেন।

বিলেত থেকে জাত-হাকিম হয়ে এসেছি ভেবে আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে এক দামী ওয়েলার ঘোড়া কিনে দেবার জোগাড় করেছিলেন। কলকাতায় আমি পৌঁছতেই এক সুন্দর সুঠাম ওয়েলার কব্ এল আমার জন্য আড়গড়া থেকে। ঘোড়াটি দেখে আমার ভারি আনন্দ হল। কিন্তু পিঠে

চড়বামাত্র বুঝলাম যে, এ এক আনকোরা তাজা জানোয়ার, ভালো করে ব্রেক কষাই হয় নেই। আমাকে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় ও গড়ের মাঠে নানাপ্রকার তাণ্ডব-নৃত্য নেচে শেষে বজ্জাতি করে এক গাছের গুঁড়িতে ঢুঁ মেরে আমার পা দুখানা ভেঙে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলে। কোনো ক্রমে হাড়গোড়গুলো রক্ষা করলাম। সে-যাত্রা ওয়েলার ঘোড়া আমার অদৃষ্টে জুটল না। আহমদাবাদ পৌঁছে একটা কম দামী ঘোড়ার সন্ধান করতে লাগলাম। পাঠকের মনে আছে তো, গুজরাতে তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ। তাই আশা ছিল সস্তায় একটা ভালো country bred (দেশী) ঘোড়া পাব।

একদিন সকালবেলা দুজন রাজপুত এক কাঠিয়াবাড়ি ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হল। তারা বললে, "সাহেব, তুমি সওয়ারির জন্য ভালো ঘোড়া খুঁজছ শুনলাম। এ আমাদের আপন ঘরজাত-ঘোড়া (গৃহজাত-অশ্ব)। এর বাপ-মা দুই খাঁটি কাঠিয়াবাড়ি জানোয়ার। আমীর লোকের সওয়ারির উপযুক্ত ঘোড়া, সাহেব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তা হলে তোমরা একে বেচছ কেন ?"

দুজনের মধ্যে যে বড়ো সে ভারী গলায় উত্তর দিলে, "সাধ করে বেচছি না, হুজুর। দুকাল পড়ায় তিনটে জানোয়ারকে খেতে দিতে পারছি না। তাই এর মা আর ছোটো বোনকে ঘরে রেখে একে শহরে বেচতে এসেছি।" বেচাবাদের চোখ ছলছল করে এল।

ঘোড়াটিকে বেশ করে দেখলাম। সর্বাঙ্গসুন্দর। নিখুঁত গড়ন, ঘোর বাদামী রঙ, কপালে সাদা টিকা, লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া কেশর, লেজ পায়ের ক্ষুর অবধি লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার চোখ দুটি, ঠিক যেন হরিণীর নয়ন। আমার এক বিশেষজ্ঞ বন্ধু এসে নানারকম পরীক্ষা করে রায় দিলেন, কোনো আয়েব নেই। একশো টাকায় সওদা হয়ে গেল। মালিক দুজন কিন্তু তখনই চলে গেল না। অনুমতি নিয়ে সারাদিন আস্তাবলে বসে রইল ঘোড়ার কাছে। সন্ধ্যাবেলা তার গলা জড়িয়ে কত কাঁদলে, কানে কানে কত কি বললে, কত চুমু খেলে, তার পর চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। যাবার সময় আমাকে বলে গেল, "ওকে যত্ন-আত্তি কোরো, সাহেব। কখনো বেইমানি করবে না।" বেইমানি কোনোদিন করে নেই সুলতান। রাজপুতের ঘরের ঘোড়া, রাজপুতের মতনই ইমানদার ছিল।

তবে সে মনিব ছাড়া আর কারো ধার ধারত না। একদিন সহিস বিনা

অনুমতিতে জিন কষে পিঠে চড়েছিল বলে তাকে প্রায় প্রাণে মেরে ফেলেছিল। পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে দড়াম করে এমন পড়ল যে লোকটা আর একটু হলে পিষে মরত। আর একদিন আমার এক বন্ধু জবরদস্তি করে লাফিয়ে সুলতানের পিঠে চড়লেন। চড়বামাত্র সুলতান এক লাফ মেরে ছুটল পাগলের মতো কম্পাউণ্ডে এক ইঁদারা ছিল তার দিকে। বন্ধু অসাধারণ সওয়ার ছিলেন, তাই লাফিয়ে পড়ে নিজে বেঁচে গেলেন, ঘোড়াকেও বাঁচালেন।

কিন্তু আমি "সুলতান" বলে ডেকে কাছে গেলেই বড়ো বড়ো চোখ করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আমি বেশ করে বসে ইশারা না করা পর্যন্ত এক পা নড়ত না। আস্তাবলে আপন ধ্যানে দাঁড়িয়ে থাকত শান্ত হরিণ ছানাটির মতন। আমার স্ত্রী ভেতরে গিয়ে কখনো cosmetic দিয়ে তার তেড়ি কেটে দিতেন, কখনো-বা চুল বিনিয়ে দিতেন। চুপটি করে গলা বাড়িয়ে দিত।

ঘোড়াটা বাজনা শুনতে বড়ো ভালোবাসত। ক্যাম্পের পল্টন ব্যাণ্ড বাজিয়ে কাওয়াজ করতে বেরলে আমি সময় সময় ওকে নিয়ে যেতাম। এমন সুন্দর ঘাড় বাঁকিয়ে নাচত ব্যাণ্ডের তালে তালে যে সবাই মোহিত হয়ে দেখত।

এক বড়ো মজার খেলা ছিল ওর। পথে যেতে যেতে কালো হরিণ দেখলেই তাকে তাড়া করে যেত। প্রথমটা আমি ঠিক ধরতে পারতাম না, কুকুরের মতো হরিণকে তাড়া করে কেন? তার পর ক্রমশ, আন্দাজ করলাম যে ওর আগের মনিবরা হয়তো অশ্বপৃষ্ঠে বল্লম নিয়ে হরিণ শিকার করতেন। একদিন আমিও পিস্তল হাতে নিয়ে সুলতানকে ছোটালাম এক কৃষ্ণসারের পেছনে। চমৎকার ছুটল। বোঝাই গেল যে, সুলতান ও-খেলাতে অভ্যস্ত। এর পরে আরো অনেকবার ঐ রকম ছুটেছি। শক্ত জমির উপর হরিণ সহজেই বেরিয়ে যেত, কিন্তু নরম কি ভিজে মাটিতে পালাতে পারত না। দুচারবার গুলি ছুঁড়তে পেরেছিলাম, কিন্তু নিজের নিশানার দোষে কখনো হরিণ ফেলতে পারি নেই।

সুলতানের দুষ্টুবুদ্ধি অনেক রকমের ছিল। হয়তো গ্রামের মাঝখানে ঘোড়া থামিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কইছি। হঠাৎ এক লাফ দিয়ে পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠল। "এই! কি করছিস্?" বলতেই লক্ষ্মী ছেলেটির মতো আবার চুপ করে দাঁড়াল। কখনো হয়তো হঠাৎ অতর্কিতে একটা

লোকের পাগড়ি দাঁতে ধরে তুলে নিলে, সে লোকটা হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। আমি "সুলতান" বলে ধমকে উঠতেই আবার পাগড়িটা তার মাথার উপরেই ফেলে দিলে। সকলে হো হো করে হেসে উঠল। বেশ বুঝতে পারত যে তার খেয়ালটা সকলের ভালো লাগছে।

আশ্চর্য খাটতে পারত ঘোড়াটা। আমার মতো ভারী লোককে নিয়ে অবাধে দশকোশ পথ ছুটত। রোদ বৃষ্টিকে দৃকপাত করত না। বালির উপর, কাদার উপর, কি সুন্দর দৌড়াত, কখনো একটি বার পা হড়কায় নেই।

আমি আহমদাবাদ থেকে বদলি হওয়ার কিছুদিন আগে বেচারার গায়ে জোরে বরসাতী ঘা বেরল। ও ঘা কখনো সারে না। শীতকালে একটু কমে, বর্ষার দিনে আবার বাড়ে। সবাই বললে যে, ও আর মফস্বলের খাটুনি খাটতে পারবে না। কি করি, বরোদার এক ধনী সরদারের কাছে সুলতানকে বেচে বিজাপুর চলে গেলাম। ভাবলাম, ভালোই হল, যত্নে থাকবে। পাহাড়ে-দেশে নিয়ে এলে হয়তো আরো বেশি কষ্ট পেত। কিন্তু ভুলতে তাকে পারি নেই। এর পরে আমার আরো দু-তিনটা ভালো সওয়ারির ঘোড়া হয়েছিল, কিন্তু তারা কেউ আমাদের এমন আপনার জন হয় নেই।

দুর্ভিক্ষের সময় কাজ শুধু একটা ঘোড়ায় হত না। তাই এক উটও রেখেছিলাম। হাতি-ঘোড়া চড়ার অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই ছিল। কিন্তু কুব্জপৃষ্ঠ-ন্যুব্জদেহ উষ্ট্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আহমদাবাদে, প্রথম পরিচয়ে খুব সুখী হয়েছিলাম তা বলতে পারি না। বরং গায়ের ব্যথা মরতে সাতদিন লেগেছিল। আমি ভেবেছিলাম প্রকাণ্ড জিনের উপর বসে, রেকাবে পা দিয়ে দিব্যি আরামে উটে চড়ব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলাম, আরাম দূরে থাক, সামান্য একটু সোয়াস্তিও পাওয়া যায় না। প্রথমত প্রত্যেক হাড়ের জোড় ক্রমাগত ঝাঁকানি খায়। তার পর, হঠাৎ অতর্কিতে নীচে হতে কত রকম ধাক্কাধুক্কি যে সর্ব শরীরে লাগে, তা অবর্ণনীয়। কেন যে বারবার পড়ে যাই নেই, সেটা আজও বুঝতে পারি না। একবার এক গোরা চাকরিসূত্রে মিশর দেশে গেছল। সে যখন আপন গ্রামে ফিরে এল, সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "কিহে, উট-সওয়ারি কি রকম হল?" লোকটা তো প্রথমে জবাবই দেয় না। শেষে একদিন বিরক্ত হয়ে বললে, "Cup and ball খেলা দেখেছ? ছোটো ছেলেরা যে বাটির ভেতর একটা বল রেখে তাকে নাচায়, কতকটা সেইরকম।"

তবে এ ক্ষেত্রে বলটা লাফিয়ে উঠে সব সময়ই বাটির ভেতরই পড়ে না। বর্ণনাটা গোরা-জনোচিত হলেও কতকটা ঠিক। অথচ মজা দেখুন। মাস দুয়েকের মধ্যে আমি চলন্ত উটের উপর বসে সব কাজই করতে শিখলাম। পিপাসা পেলে সোডার বোতল খুলে খেতাম। পকেট-বইতে নোট লিখতাম। বন্দুক চালিয়ে sand-grouse মারতাম। এই পক্ষীকে গুজরাতে 'বটের' বলে। বটের শিকার বেশ মজার। আপনাদিকে বলি কিরকম। এ পাখি বাংলাদেশে বোধ হয় নেই। অবশ্য বিকানীরে যে বড়ো imperial sand-grouse-এর শিকার হয়, যেখানে ফি বছর হাজার হাজার পাখি মারা পড়ে, তার কথা আমি কিছুই জানি না। আমি কখনো একসঙ্গে দু-দশটার বেশি দেখি নেই। উত্তর গুজরাতের মরু-প্রান্তরের মধ্য দিয়ে উটে চড়ে যেতে যেতে লোকালয় থেকে বহুদূরে আমরা এই পাখি দেখতে পেতাম। বালির ভেতর ছোটো ছোটো বাটির মতো গর্ত করে তাইতে চুপটি মেরে বসে রোদ পোহাত। তফাৎ থেকে মনে হত যেন কতগুলো মাটির কি গোবরের তাল পড়ে আছে। কিন্তু তাদের কাছে যাওয়া বিষম মুশকিল ছিল। মনে এতটুকু সন্দেহ হয়েছে, কি মুহূর্ত মধ্যে উড়ে একেবারে মাইল খানেক পথ পালাবে। এদের শিকার করার একমাত্র উপায়, উটের বেগ একটু না কমিয়ে সমানে চারি দিকে চক্কর দেওয়া আর চক্কর দিতে দিতে আস্তে আস্তে অন্তরটা কমিয়ে যাওয়া। তার পর, যেই পাখি বন্দুকের পাল্লার ভেতর এল, কি তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে দুটো নলই আওয়াজ করা, একটা বসা-পাখি লক্ষ্য করে আর দ্বিতীয়টা ওড়ার উপর। এইরকম গোটা তিনেক sand-grouse পর্যন্ত একসঙ্গে ফেলা যায়। কিন্তু এজন্য উটটা খুব ভালো শিক্ষিত হওয়া চাই।

পাঠক যেন মনে না করেন যে উট আস্তে আস্তে চলে। ভালো সওয়ারির সাণ্ডণী ঘণ্টায় আট মাইল স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। আর যখন ভয় পায় কি ভড়কায় তখন দশ-বারো মাইল পর্যন্ত দৌড়ায়। আপনারা জানেন তো উটের রাশ মানে নাকের সঙ্গে বাঁধা একটা রশি। রশি উটেরই লোম দিয়ে তৈরি, বেশ মজবুত। তবে কখনো কখনো এ রাশও ছিঁড়ে যায়। আমার একবার গেছল। উটটা যখন ব্যাপার বুঝতে পারলে তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে এক দিকে ছুটল। গাছের ডালে লেগে আমার টুপি, আমার সারথির পাগড়ি, জিনে-ঝোলানো চামড়ার থলি (holster) সব উড়ে গেল। উটের অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হল।

শেষে মাইল দুয়েক পাগলের মতো দৌড়ে শ্রান্ত হয়ে এক গ্রামের কাছে এসে আপনা হতে ধপ করে বসে পড়ল। উটগুলো স্বভাবত দুর্দান্ত নয়। হাতির মতনই পোষ মানে। মুখের হুকুম শোনে। তবে পোষা জন্তুরও সময়ে সময়ে স্কন্ধে ভূত চাপে তো!

একবার আমার উট আমাকে sun-stroke-এর হাত থেকে কিরকম রক্ষা করেছিল শুনুন। দুপুর রোদে এক প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি। সারা সকালটা দুর্ভিক্ষের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ফিরে বড়ো শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কেবল ভাবছি কখন আমার ডেরাতে ফিরব। হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরতে লাগল, ভয় হল এইবার উট থেকে পড়ে যাব। একবার যদি ছায়াতে দুদণ্ড বসতে পেতাম তো ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু গাছপালা ঘরবাড়ি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কি উপায়? আমার সারথিকে বললাম, "ওরে! আমার মাথা কেমন করছে। একটু কোথাও ছায়ায় নিয়ে চল।" সে উত্তর দিল, "ছায়া এখানে কোথায় পাব হুজুর! তবে এক কাজ করতে পারি। আমার সাণ্ডীকে দাঁড় করাই। আপনি তার ছায়াতে শুয়ে থাকুন।" এই বলে জিন-ঢাকা সতরঞ্চিটা মাটিতে বিছিয়ে আমাকে তার উপর শোয়ালে। শুইয়ে তার পর তার উটকে এমনভাবে দাঁড় করালে যে আমার সর্বাঙ্গে ছায়া পড়ে। এইরকম দাঁড়িয়ে রইল আধঘণ্টা আমার বাহন। সোডাওয়াটার দিয়ে বেশ করে মাথা মুখ ধুয়ে একটু জিরিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। প্রাণটা বেঁচে গেল।

৪

আগে ছাপ্পান্ন সংবতের ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা বলেছি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের জের তো এক বছরেই মেটে না! সাতান্ন সংবতেও বৃষ্টি পুরোপুরি হল না। যেটুকু বা হল তাও সকলে কাজে লাগাতে পারলে না বলদ ও বীজের অভাবে। সরকার যতই পয়সা বিতরণ করুন, তার একটা সীমা তো আছে। কিন্তু একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এক বছর সব জমি খালি পড়ে থাকার দরুণই হোক কিম্বা অন্য কারণে হোক, সেবার সারা গুজরাতময় যেখানে সেখানে 'সামো' বলে একরকম বুনো শস্য এত জন্মাল যে লোকে খেয়ে শেষ করতে পারে না। তবু সে-বছর সরকার তরফের রিলিফের কাজ চালু রইল। তবে সাতান্ন সংবতের রিলিফ একটু অন্যরকমের। কর্তারা স্থির করলেন যে লোক

যাতে গাঁয়ে বসেই মজুরি পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে, কেননা লোকে আবার এক বৎসর ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ালে গ্রামের জীবন একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

এই রিলিফ-কাজের ভার পড়ল আমাদের ওপর। ইঞ্জিনীয়ার সাহেবরা অবজ্ঞার হাসি হেসে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যতটা পারেন আমাদের কাজে বাগড়া দিতেও কসুর করেন নেই। সরকার থেকে হুকুম বার করালেন যে আমরা যেন কোনো প্রকার ইরিগেশন খাল-বাঁধের কাজে হাত না দেই, যেন গ্রামের মধ্যে খুচরো রাস্তা মেরামত কিম্বা গোরু-বাছুরের জল খাবার ডোবা সংস্কার এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। বলা বাহুল্য আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমি তো আমার প্রান্তে যে কটা কাজ করিয়েছিলাম সবই ইরিগেশান সংক্রান্ত। আমার কালেক্টর ও কমিশনার সাহেব কথা দিয়েছিলেন যে তাঁরা দেখেও দেখবেন না। কিন্তু প্রায় ধরা পড়ে গেছলাম আর কি! গোটা তিনেক ছোটোখাটো ইরিগেশানের (জল-সেচনের) বাঁধ ও পুকুর যথা সময়ে শেষ হল, কিন্তু বাঁধে পয়নালী না বসালে চাষারা তো বাঁধ ভেঙে জল নেবে, ফলে বছর দুয়েকের মধ্যে সব কাজটা পণ্ড হয়ে যাবে। নল পাই কোথায়? কর্তাদিকে লিখলাম যে আমাকে শ'দুই নল আনিয়ে দেওয়া হোক। কমিশনার সাহেব বড়ো ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে তলব করলেন সেই নলের জন্যে। সেই সাহেব কিন্তু শুনেই গাঁক করে উঠলেন, নল তো দিলেনই না, উপরন্তু কৈফিয়ৎ চাইলেন যে অমুক তারিখের সরকারী মন্তব্য অগ্রাহ্য করে ইরিগেশান কাজে হাত দেওয়া হয়েছে কেন? কালেক্টর আমার কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে একখানা confidential পত্রও লিখলেন—গোলযোগে পড়েছ যেমন করে পার নিজেকে বাঁচাও। আমি উত্তরে রিপোর্ট করলাম যে আমার লেখার ভুল হয়েছিল, নলের কোনো প্রয়োজন নেই। আমার প্রবীণ কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলাম কি করা যায়। তাঁদের মধ্যে একজন খুব সাহসী ও কর্মঠ লোক ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আমাদের বাঁধগুলো নিখুঁত করতেই হবে। আমি আমার এলাকার সমস্ত কুমোরদের ডেকে পাঠাই গে। এক হপ্তা পরে আপনাকে জানাব কি ফল হয়। এক হপ্তাও লাগল না, কুমোররা মহা উৎসাহে কাজে হাত দিলে। একটা সুবিধামত জায়গা ঠিক করে নিয়ে কুড়ি তিরিশ জন কুমোর লেগে গেল পয়নালী

শেষে মাইল দুয়েক পাগলের মতো দৌড়ে শ্রান্ত হয়ে এক গ্রামের কাছে এসে আপনা হতে ধপ করে বসে পড়ল। উটগুলো স্বভাবত দুর্দান্ত নয়। হাতির মতনই পোষ মানে। মুখের হুকুম শোনে। তবে পোষা জন্তুরও সময়ে সময়ে স্কন্ধে ভূত চাপে তো!

একবার আমার উট আমাকে sun-stroke-এর হাত থেকে কিরকম রক্ষা করেছিল শুনুন। দুপুর রোদে এক প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি। সারা সকালটা দুর্ভিক্ষের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ফিরে বড়ো শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কেবল ভাবছি কখন আমার ডেরাতে ফিরব। হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরতে লাগল, ভয় হল এইবার উট থেকে পড়ে যাব। একবার যদি ছায়াতে দুদণ্ড বসতে পেতাম তো ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু গাছপালা ঘরবাড়ি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কি উপায়? আমার সারথিকে বললাম, "ওরে! আমার মাথা কেমন করছে। একটু কোথাও ছায়ায় নিয়ে চল।" সে উত্তর দিল, "ছায়া এখানে কোথায় পাব হুজুর! তবে এক কাজ করতে পারি। আমার সাণ্ডণীকে দাঁড় করাই। আপনি তার ছায়াতে শুয়ে থাকুন।" এই বলে জিন-ঢাকা সতরঞ্চিটা মাটিতে বিছিয়ে আমাকে তার উপর শোয়ালে। শুইয়ে তার পর তার উটকে এমনভাবে দাঁড় করালে যে আমার সর্বাঙ্গে ছায়া পড়ে। এইরকম দাঁড়িয়ে রইল আধঘণ্টা আমার বাহন। সোডাওয়াটার দিয়ে বেশ করে মাথা মুখ ধুয়ে একটু জিরিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। প্রাণটা বেঁচে গেল।

৪

আগে ছাপ্পান্ন সংবতের ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা বলেছি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের জের তো এক বছরেই মেটে না! সাতান্ন সংবতেও বৃষ্টি পুরোপুরি হল না। যেটুকু বা হল তাও সকলে কাজে লাগাতে পারলে না বলদ ও বীজের অভাবে। সরকার যতই পয়সা বিতরণ করুন, তার একটা সীমা তো আছে। কিন্তু একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এক বছর সব জমি খালি পড়ে থাকার দরুণই হোক কিম্বা অন্য কারণে হোক, সেবার সারা গুজরাতময় যেখানে সেখানে 'সামো' বলে একরকম বুনো শস্য এত জন্মাল যে লোকে খেয়ে শেষ করতে পারে না। তবু সে-বছর সরকার তরফের রিলিফের কাজ চালু রইল। তবে সাতান্ন সংবতের রিলিফ একটু অন্যরকমের। কর্তারা স্থির করলেন যে লোক

যাতে গাঁয়ে বসেই মজুরি পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে, কেননা লোকে আবার এক বৎসর ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ালে গ্রামের জীবন একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

এই রিলিফ-কাজের ভার পড়ল আমাদের ওপর। ইঞ্জিনীয়ার সাহেবরা অবজ্ঞার হাসি হেসে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যতটা পারেন আমাদের কাজে বাগড়া দিতেও কসুর করেন নেই। সরকার থেকে হুকুম বার করালেন যে আমরা যেন কোনো প্রকার ইরিগেশন খাল-বাঁধের কাজে হাত না দেই, যেন গ্রামের মধ্যে খুচরো রাস্তা মেরামত কিম্বা গোরু-বাছুরের জল খাবার ডোবা সংস্কার এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। বলা বাহুল্য আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমি তো আমার প্রান্তে যে কটা কাজ করিয়েছিলাম সবই ইরিগেশান সংক্রান্ত। আমার কালেক্টর ও কমিশনার সাহেব কথা দিয়েছিলেন যে তাঁরা দেখেও দেখবেন না। কিন্তু প্রায় ধরা পড়ে গেছলাম আর কি! গোটা তিনেক ছোটোখাটো ইরিগেশানের (জল-সেচনের) বাঁধ ও পুকুর যথা সময়ে শেষ হল, কিন্তু বাঁধে পয়নালী না বসালে চাষারা তো বাঁধ ভেঙে জল নেবে, ফলে বছর দুয়েকের মধ্যে সব কাজটা পণ্ড হয়ে যাবে। নল পাই কোথায়? কর্তাদিকে লিখলাম যে আমাকে শ'তুই নল আনিয়ে দেওয়া হোক। কমিশনার সাহেব বড়ো ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে তলব করলেন সেই নলের জন্যে। সেই সাহেব কিন্তু শুনেই গাঁক করে উঠলেন, নল তো দিলেনই না, উপরন্তু কৈফিয়ৎ চাইলেন যে অমুক তারিখের সরকারী মন্তব্য অগ্রাহ্য করে ইরিগেশান কাজে হাত দেওয়া হয়েছে কেন? কালেক্টর আমার কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে একখানা confidential পত্রও লিখলেন— গোলযোগে পড়েছ যেমন করে পার নিজেকে বাঁচাও। আমি উত্তরে রিপোর্ট করলাম যে আমার লেখার ভুল হয়েছিল, নলের কোনো প্রয়োজন নেই। আমার প্রবীণ কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলাম কি করা যায়। তাঁদের মধ্যে একজন খুব সাহসী ও কর্মঠ লোক ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আমাদের বাঁধগুলো নিখুঁত করতেই হবে। আমি আমার এলাকার সমস্ত কুমোরদের ডেকে পাঠাই গে। এক হপ্তা পরে আপনাকে জানাব কি ফল হয়। এক হপ্তাও লাগল না, কুমোররা মহা উৎসাহে কাজে হাত দিলে। একটা সুবিধামত জায়গা ঠিক করে নিয়ে কুড়ি তিরিশ জন কুমোর লেগে গেল পয়নালী

গড়তে আর সেগুলোকে ভাটিতে পোড়াতে। কয়েক সপ্তাহ তারা সেইখানেই ক্যাম্প করে রইল। অনেক নল ভাঙল অনেক ফুটল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার দরকারের বেশি নল হাতে এল। বাঁধগুলো সর্বাঙ্গসুন্দর হল, একটা বাঁধ কমিশনার নিজে দেখে খুব খুশি হয়ে গেছলেন। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে কাগজ-পত্রে এ কাজগুলোকে সমস্তই দেখানো হয়েছিল গোরু-মহিষের জল খাবারের ব্যবস্থা বলে। বৃদ্ধ লীলী সাহেব খুব হেসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন— ওহে, তোমার গোরুগুলো ওই নলে মুখ লাগিয়ে জল খায়, না, জলটা বাইরে এলে খায়? আমাদের গুজরাতের বড়ো ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন এক white সাহেব। তিনিও আমাকে একদিন এ বিষয়ে ঠাট্টামস্করা করেছিলেন। মুখে হাসিঠাট্টা চলে, সরকারী চিঠিপত্রে ও আর চলে না। আমার অকর্মের কৈফিয়ৎ দিতে গেলে বিপদেই পড়তাম। তবে তখন আমীর-ওমরাহদের দিন একেবারে যায় নেই! প্রাণে ভরসা ছিল যে লীলী সাহেবের মতো মুরুব্বি শেষ পর্যন্ত তাঁবেদারকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে দেবেন, লালফিতের খপ্পরে পড়তে হবে না।

এই সাতান্ন সংবতে গভর্নমেণ্ট আমাদিগকে সাহায্য করবার জন্য special relief officer বলে কয়েকজন জীব নানাস্থান থেকে আমদানি করেছিলেন। আমার ভাগ্যে তাঁদের দুটি পড়েছিল, একটি সেই Smith সাহেব যার প্রেতাত্মার তাণ্ডবের কথা আগেই আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছি। এ ভদ্রলোক ছিলেন উত্তর ভারতেব একজন পেনসনপ্রাপ্ত পুলিস ইনস্‌পেক্টর, নিরীহ ভালো মানুষ, সাতেও থাকতেন না, পাঁচেও থাকতেন না, নিজের ব্যসনের কোনোরকম ব্যাঘাত না হলেই হল। তাঁর সঙ্গে সহজেই একটা রফা করে ফেলেছিলাম। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন না, আমার কথামত তালুক আর সদরে বসে কিছু দপ্তরের কাজ করে দিতেন। অন্যজন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের মানুষ ছিলেন; বয়সে তরুণ, জাতে পার্সী, উচ্চ আশা। তিনি সমস্ত মহকুমার নানারকম গুপ্ততথ্য সংগ্রহ করে আমার কানে বর্ষণ করতেন। তাতে কিছু ক্ষতি হয় নেই, কেননা দুর্মুখজাতের ওপর কোনো বিশ্বাস আমার কোনো দিনই ছিল না; কিন্তু পরে জানলাম যে লোকটি খোদ কমিশনার সাহেবের কাছে দুই সপ্তাহ অন্তর গুপ্ত রিপোর্ট পাঠাত। আর সে গুপ্ত রিপোর্টের সঙ্গে ফেমিন-রিলিফের কোনো বিশেষ সম্পর্কও ছিল না। অবশ্য ভদ্রলোকের

গোয়েন্দাবৃত্তির খবর পাওয়ার পর তাকে সরাতে আমার বেশি দিন লাগল না। তবে তার দুষ্কর্মের ফল থেকে আমার কর্মচারীদের বাঁচাতে আমায় অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। উত্তরকালে এঁর যথেষ্ট পদোন্নতি হয়েছিল, আর-একটা মজার কথা— বারদৌলীতে বাজেয়াপ্ত করা জমি যখন নিলামে চড়ানো হয় ইনিই তার অধিকাংশ ডেকে নিয়েছিলেন।

কোনো দেশের জমির মালিক কে, রাজা না প্রজা, এ সম্বন্ধে চিরদিনই মতভেদ আছে। কখনো-বা রাজা নিজেকে বিশারপতি নৃপতি বলেছেন, কখনো-বা ভূপতি বলেছেন। গুজরাতের পাটিদার প্রজারা কিন্তু চিরদিনই নিজেদিকে তাদের ক্ষেতের মালিক বলে জানে; কেননা তাদের জমি তারা দান করতে পারে, আর যতদিন খাজনা উস্থল দেয় ততদিন তাদের হাত থেকে জমি ফিরিয়ে নেওয়ার হাত রাজারও নেই। আমি অনেকবার তাদের মুখে শুনেছি যে তারা খাজনা দেয় রাজ্য-চালনার খরচ-খরচার দরুণ। তাই বলে তারা কারো গোলাম নয়। তাদের মনে এই বিশ্বাসটা এত বদ্ধমূল থাকার দরুণই বোধ হয় গান্ধীজির খেড়া-বারদৌলী আন্দোলন এতটা কৃতকার্য হয়েছিল। আমি আহমদাবাদ ছাড়বার আগে সরকার land revenue code-এ এক নতুন ধারা প্রবর্তন করতে চাইলেন যাতে করে মুকরারী প্রজারও জমি বিক্রি করার বা বন্ধক দেওয়ার কোনো হক্ থাকবে না। এই প্রস্তাব শুনে গুজরাতের পাটিদাররা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠল। গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি করে তারা প্রতিবাদ করতে লাগল। আমাদের কাছে সর্বদা পটেলদের ভিড় লেগে থাকত, তারা কাতর হয়ে বারবার বলত—“সাহেব, যেমন করে পার এ আইন রদ করাও। মালিখানা রায়তের সঙ্গে আর আমাদের তফাৎ কি রইল! এরকম ব্যবস্থা যদি হয় তো আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে, মজুরি করে তো যেখানে খুশি পেট ভরাতে পারি।”

কে একজন কালেকটর এইরকম সভাসমিতিতে যোগ দেবার জন্য কয়েকজন পটেলকে বড়ো-তরফ করেন। তারা কমিশনারের কাছে আপীল করে। লীলী সাহেব এ হুকুম তো রদ করলেনই, উপরন্তু গুজরাতের ছোটো বড়ো সকল হাকিমকে একত্র করে বুঝিয়ে দিলেন যে গ্রামের পটেল শুধু সরকারী লোক নয়, সে তার গ্রামের লোকের প্রতিনিধি। গ্রামের ভালো মন্দের জন্য সে

সভাসমিতি করতে পারে। প্রতিবাদ সত্ত্বেও নতুন আইন যথাসময়ে পাস হল। ভোট দেওয়ার আগে ফেরোজশাহ প্রমুখ লোকনেতারা সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। সভা থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা অনেকের চোখে নাটুকে ঢঙ বই কিছু নয়, কিন্তু বিলেতি খেলা খেলতে গেলে বিলেতি ঢঙ তো আর ছাড়া যায় না! এই সময়ে আমাদের জেলায় A. বলে এক সাহেব ছিলেন। এই ঢঙের খবর আমরা যখন পেলাম, তখন আমরা কয়েকজন একত্র চায়ের টেবিলে বসে, সবাই জাত সাহেব আমি ছাড়া, A খুব রসিকতা করে বলে উঠল—The monkeys are learning tricks (বাঁদর খেল শিখছে)। আমার সামনে কথাটা বলায় বড়োসাহেব একটু অপ্রস্তুত হলেন, বোধ হয় আমাকে একটু আশ্বস্ত করার জন্যই কানে কানে বললেন, "fancy, A. calling anybody a monkey!"

A. সত্যই কতকটা কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত ছিল। একবার কি কীর্তি করেছিল আপনারা শুনুন— আহমদাবাদ জেলার উত্তর ভাগে সরকারী salt range আছে, সেই range-এর সীমান্তে কড়া পাহারা। দুটো বেড়ার মাঝখান দিয়ে লম্বা রাস্তা চলে গেছে, মাঝে মাঝে সিপাহিদের ঘাটি; বিনা অনুমতিতে সে রাস্তায় কারো চলার হুকুম নেই, বিশেষত রাত্রে। একদিন A. অন্য এক সাহেবের তাঁবুতে খেয়ে ফেরার পথে গভীর রাত্রে সেই রাস্তায় ঢুকে পড়েছিল। সে নিজে হাকিম, নিয়মকানুনের কদর তার জানা উচিত ছিল। ঘাটির সিপাহি যখন "হল্ট, হুকুমদার" বলে হাঁকল তখন তার থামা উচিত ছিল। তা না করে সে 'চুপ রও' বলে ঘোড়া আরো ছুটিয়ে দিল; সেপাইদের বাঁশী বেজে উঠল, চারি দিক থেকে পাহারাওয়ালা এসে A.-কে হেঁচড়ে ঘোড়া থেকে টেনে পাড়লে, তার পর ধাক্কা মারতে মারতে গারদে নিয়ে গেল। তখনো A. নিজের পরিচয় দিলে না; ভোরবেলা ইনস্পেকটরের কাছে খবর গেল যে এক গোরা নিমক-চোর ধরা পড়েছে, তাকে গারদে পুরে রাখা হয়েছে। ইনস্পেকটর তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে A. রাগে ফুলছে। একটা মিটমাট হয়ে গেল। সকালবেলা A. তার ক্যাম্পে ফিরে চাকর-বাকরদের চিন্তা দূর করলে। এ হেন লোকের ফেরোজ শাহকে বাঁদর বলা একটু হাস্যাস্পদ বই কি!

উপরে এইমাত্র বললাম যে লীলী সাহেব পটেলকে গ্রামের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। শুধু লীলী সাহেব কেন, বোম্বাই সরকারেরও এই

বিশ্বাস ছিল। আমাদের ক্যাম্প-প্রবাসের সময় যে সমস্ত কাজ করতে হত তার মধ্যে জমাবন্দি একটা খুব বড়ো কাজ ছিল। একটা কোনো সুগম দেখে স্থান বেছে নিয়ে সেইখানে জমাবন্দি ক্যাম্প হত। এক-একদিন পঞ্চাশ ষাটটা গ্রামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রান্ত-সাহেব দেখা করতেন, আর প্রত্যেক গ্রামের দেয়-খাজনা কি সেইটে সরকার তরফ থেকে জানাতেন। অবশ্য একবার জরীপ ও ব্যবস্থা হয়ে গেলে দেয়-খাজনা বাঁধা হয়ে যেত; তবু এই প্রাচীন প্রথাটা আমাদের সময় কায়েম ছিল। নদীর চরে তরমুজ কি খরমুজার চাষের দরুণ সরকারের যেটা প্রাপ্য সেটা প্রতিনিধিদের শুনিয়ে দেওয়া হত, কারণ এই প্রাপ্যটা বছর বছর বদলাত। যা হোক্ মোট কথাটা এই যে সাহেব দরবার করে বসে প্রত্যেক গ্রামের পটেল তলাটী ও দু-একজন মাতব্বরকে জানিয়ে দিতেন যে গ্রামের দেয়-কর মোট কত; যেন এই প্রতিনিধিরাই সারা গ্রামের তরফ থেকে এই দেয়-করটা মেনে নিতেন। এর পেছনে আমি তো দেখি একটা পরিষ্কার village community-র ধারা অর্থাৎ সমস্ত গ্রাম মিলে যেন সরকারের কাছে খাজনার জন্য দায়ী। জমাবন্দিতে কোনো প্রজার স্বতন্ত্র উল্লেখ হত না। গ্রামের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে পান আতর দিয়ে এক এক দল মাতব্বর বিদায় করতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগত না। red tape-এর দিক থেকে দেখতে গেলে এই জমাবন্দি ক্যাম্পকে সহজেই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এর একটা মহত্ত্ব ছিল তখনকার দিনে, হয়তো আজও আছে।

এই গুজরাতের পাটিদারদের কথা বারবার এত করে বলছি তাদের আমি বড়ো ভালোবাসতাম বলে। বেশ solid (সারবান) মানুষ— যেরকম লোককে বিলেতি ভাষায় hearts of oak ইত্যাদি কত কথাই বলা হয়েছে। গ্রামের ভার গ্রামের স্বাধীনতা এদের হাতে সঁপে দিয়ে একদিন গুজরাতের লোকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারত। এক Village Hampden-এর গল্প বলি শুনুন— আমরা দুটি প্রাণী, একটি কালো ও একটি সাদা সাহেব শিকার করে বেড়াচ্ছি। স্থানটা গ্রামের কাছে না হলেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মনসা-বেড়া দিয়ে ঘেরা পটেলদের ক্ষেতের মাঝখানে; হঠাৎ একটা বড়ো ঝাঁক পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। বন্ধু হাঁকলেন, mark! অমনি দুটো বন্দুক একসঙ্গে ছুটল, গোটা কুড়িক নিরীহ পাখি (নিরীহ কিন্তু অতি সুস্বাদু) চারি দিকে টপ টপ করে পড়ল। অধিকাংশ পড়ল সরকারী পোড়ো জমিতে কিন্তু গোটা কয়েক পড়ল এক পটেলের ক্ষেতের

বেড়ার মধ্যে। পাখি আনতে সেপাই পাঠানো হল। সেপাই এসে রিপোর্ট করলে হারামখোর পটেল কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। ছ' ছটা পাখি ছেড়েও তো দেওয়া যায় না! অগত্যা দুই সশস্ত্র হাকিম হানা দিল পটেলের ক্ষেতে। পটেল এসে বেড়ার ফাঁকে দাঁড়াল। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, হাতে প্রকাণ্ড হুঁকো, কিন্তু নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের মতো, একেবারে নিরস্ত্র। গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আমার ক্ষেতে তোমরা কি হকে ঢোকো সাহেব?" সত্যিকারের সাহেবটি— অর্থাৎ Hampden-এর দেশের লোক ভাঙা গুজরাতিতে উত্তর দিল, "আমাদের পাখি পড়েছে তোর ক্ষেতে, আমি নিশ্চয় নিয়ে যাব, জোর করে।" পটেল পা ফাঁক করে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে, "নিয়ে যাবে, নিয়ে যাও; কিন্তু আমার সাধ্য যতক্ষণ আছে আমি আটকাব।" গল্পটা সামান্য কিন্তু যথার্থ peasant proprietor কি প্রকার লোক হয় তা চোখে দেখলাম। পাখি কটা রণক্ষেত্রে ফেলে দিয়েই শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলাম।

আহ্মদাবাদ জেলার পাটিদারেরা কুঁদুলে মানুষ নয়, কতকটা গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু পাশের জেলাতে (খেডায়) তাদের প্রতিপত্তি অন্যরকম। সেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনখারাবি সবেতেই পটেলরা অগ্রণী। অবশ্য ব্রোচ জেলার পাটিদার বোহ্‌রারা এ দিক দিয়ে আরো খ্যাতি অর্জন করেছিল। তবে তারা পাটিদার হলেও মুসলমান, তাদের কথা স্বতন্ত্র, অস্ত্রের ব্যবহার তারা এখনো ভোলে নেই। খেডা জেলার একটা গল্প বলি শুনুন। একটি বেশ বড়ো গ্রামে দুই পটেলে অনেকদিন থেকে মামলা-মোকদ্দমা ঝগড়া-কাজিয়া চলছিল। এই গ্রামের লাগা নদীর কিনারায় এক মস্ত সরকারী বাবলা-বন ছিল। এদের একজন সরকারে দরখাস্ত করে খবর দিলে যে অন্য একজন অনেকগুলো বাবলাগাছ কেটে চুরি করে নিয়ে গেছে। সদর থেকে একজন কর্মচারী খোঁজ করতে এল, সঙ্গে চাপরাশি চৌকিদার, গ্রামের পটেল তলাটী, গ্রামের লোকও সবাই জমা হল, তার মধ্যে ফরিয়াদী ও আসামী। স্থানটা নির্জন, গ্রাম থেকে বহুদূরে, কাছে চাষবাসও নেই। সরকারী লোক চলেছে আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ফরিয়াদী কাটা গাছগুলো দেখাতে, "রাও সাহেব, এই পয়লা, এই দোসরা, এই তেসরা।" আসামী "আর এই চৌঠা" বলে হাঁক মেরে এক চৌকিদারের হাত থেকে টাঙ্গি ছিনিয়ে নিয়ে এক কোপে ফরিয়াদীর মাথা

উড়িয়ে দিল। দিন দুপুরে এতগুলো লোকের সাক্ষাতে এরকম ব্যাপার শোনা যায় সীমান্ত প্রদেশেই হয়। যে যেখানে ছিল সবাই পালাল। যখন পুলিস বিকালবেলা বাবলা-বনে গেল, তখন সেখানে লাশের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। সত্যি, মানুষের লাশ পাওয়াই যায় নেই, এক চটের থলিতে সেলাই করা দু দশটা হাড় নদীগর্ভে পাওয়া গেছে বলে পুলিস হাজির করে। কিন্তু ডাক্তার সাহেবদের মন ভোলাতে পারে নেই। ঘটনাটা আমি চোখে দেখি নেই, মোকদ্দমা আমার এজলাসে হয়েছিল, আর আশ্চর্য এই justice is blind। লোকটাকে আমি ছেড়েও দিয়েছিলাম।

পাটিদারদের সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই বললাম, দোষগুণে তারা একটা বড়ো জাত। গুজরাতের ভবিষ্যৎ পলিটিক্যাল উন্নতির ধারা তাদের উপর অনেকটা নির্ভর করছে।

কিন্তু এই পাটিদারদের চেয়েও আর-একটা জাতের সঙ্গে আহমদাবাদ জেলায় আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তারা গিরাসিয়া রাজপুত। প্রাচীনকালে যোদ্ধা ছিলেন, এখন আর যুদ্ধ করেন না। আভিজাত্যের সকল গুণই তাঁদের মধ্যে আছে, কেবল পয়সা নেই। আমার প্রান্তে অনেকগুলো গ্রাম তালুকদারী গ্রাম ছিল, অর্থাৎ সেখানকার ভূস্বামী প্রজাদের কাছে খাজনা সংগ্রহ করতেন আর গ্রামের দেয়-কর সরকারকে দিতেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকেরা আয় ব্যয়ের ওজন কিছুতেই ঠিক করতে পারতেন না। আমার সময়ে অধিকাংশ তালুকদারী গ্রামের ভার সরকার নিজের হাতে নিয়েছিলেন, আর তালুকদার মশাইকে পেনসন-স্বরূপ কিছু দিতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশই অতীব গরিব। কোনো রকমে ঘরদোরের বাইরের চাকচিক্য বজায় রাখতেন। কিন্তু গরিব হলে কি হয়, কি আশ্চর্য খানদানী এদের চাল, কথাবার্তা কইতেন কি সুন্দর ভাষায়। যে গুজরাতি একটা নিতান্ত আটপৌরে-বড়োবাজারের বুলি তাই এদের মুখে শোনাত যেন মোগল দিল্লীর কি বুরবঁ প্যারিসের চোস্ত জবান। কাজ উপলক্ষে গ্রামে গেলেই তালুকদার মহাশয়ের বৈঠকখানায় অন্তত আধঘণ্টার জন্যে বসতে হত। একটা ছোটোখাটো দরবার গোছের হত। কোথা থেকে বেরত এক রূপার আতরদান, কোথা থেকে আসত এক জীর্ণ কাশ্মীরী শাল অতিথির আসনের জন্য। আমি সব সময়ে কথার মাত্রা ঠিক রাখতে পারতাম না। ভাবের

আতিশয্যে দুচারটে নিতান্ত অর্থহীন সমবেদনার কথা বলে ফেলতাম। অথচ তাদের সত্যি উপকার করবার কোনো ক্ষমতাই আমার ছিল না। একবার হোলির সময় আমার ক্যাম্প পড়েছিল কতকগুলি রাজপুত গ্রামের মাঝে। কদিন ধরে গ্রামের মেয়েরা দলে দলে গান করতে করতে আবির কুমকুমের থালা হাতে আমার ক্যাম্পে আসতে লাগল। আমার করণীয় কি তা ঠিক জানতাম না, গ্রামের লোকের সঙ্গে হোলিখেলায় মেতে ওঠা ঠিক যুক্তিসংগত নয় এটাও বুঝলাম, অথচ এ বেচারারা সাধ্যের অতীত খরচ করে আবির কুমকুমের ভেট নিয়ে এসেছে। শেষে ভেবে চিন্তে অনেকগুলো টাকা নানা-রকমে ওই কয় গ্রামে খরচ করে ঋণমুক্ত হলাম। একবার করলাম কি উদয়পুর থেকে একজন ভালো চারণ আনালাম। সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই ক্যাম্পে গানের মজলিস করে আশেপাশের গিরাসিয়া তালুকদার ও অন্য সাধারণ রাজপুতদের নিমন্ত্রণ করলাম। তাঁরা সবাই মহা আগ্রহে গান শুনতে এলেন, আর আমি যে তাঁদেরই জন্য উদয়পুর থেকে বারোটজীকে নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলাম এতে তাঁরা সত্যই বড়ো খুশি হয়েছিলেন। অনেক গিরাসিয়া বৃদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে আমি তাঁদের একজন দরদী বন্ধু।

গুজরাতের আর-একটা কথা বলেই এবারকার প্রসঙ্গ শেষ করব। একদিন আমি মীড্ বলে এক সাহেবের সঙ্গে এক ক্যাম্পে রয়েছি, সন্ধ্যাবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর চারপাই-এ শুয়ে শুয়ে দুজনে গল্প করছি, হঠাৎ মীড্ চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ ডাট্, আমি কেম্ব্রিজে এক আশ্চর্য বাঙালীকে চিনতাম। নানারকমে আশ্চর্য মানুষ, তার খবর তুমি কিছু জান? নাম ঘোষ। আমাদের সার্ভিস পরীক্ষায় পাস হয়েছিল কিন্তু চাকরি পায় নেই।" আমি বললাম, "আমি তাকে চিনি না, কিন্তু সে নিশ্চয়ই অরবিন্দ ঘোষ, বরোদা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।" মীড্ বললে, "তুমি চেন না? চেষ্টা করে আলাপ করো, জানবার মতো মানুষ।" আমিও মনে মনে স্থির করলাম যে যত শীঘ্র পারি অরবিন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ করব। ঘটনাক্রমে এর মাস দুই পরেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল। বোম্বাই যাচ্ছি, বরোদা স্টেশনে দেখি চিত্রকর শশিকুমার হেশ। তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছেন তিন চারজন ভদ্রলোক। হেশ তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথমজন একজন কৃশকায় বাঙালী চোগা-চাপকান পরা, মাথায় বাউরী কাটা চুল, তার উপরে পিরিলী পাগড়ি, স্বল্পভাষী, মুখে মিষ্টি

হাসি। চোস্ত ইংরাজিতে ভদ্রলোক বললেন, "এত কাছাকাছি আমরা দুজন বাঙালি থাকি তবু আজও আমাদের আলাপ হয় নি, আশ্চর্য! আমি আসব আপনার কাছে।" অরবিন্দের আত্মীয়-স্বজন অনেককেই জানতাম, তাঁর কথা সবই শুনেছিলাম, চিনতে একটুও দেরি হল না। আমি সাদরে নিমন্ত্রণ করলাম। কিন্তু দুজনার সত্য পরিচয় হতে আবার বছর চারেক দেরি হয়েছিল। দ্বিতীয় জন একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক, সৌম্যমূর্তি, নাম দেশপাণ্ডে, অরবিন্দের পরম বন্ধু। পরে এঁর সঙ্গেও খুব ভালো করে জানাজানি হয়েছিল। তৃতীয় জনের নাম যতীন্দ্রনাথ, জাতে কনৌজিয়া, ধর্মে হিন্দু, পেশা বরোদা পল্টনে সেপাহিগিরি, দীর্ঘকায়, বিরাটবক্ষ, দেখলে কারো মনে সন্দেহ থাকে না যে সিপাহী হবার জন্যই তাঁর জন্ম; কিন্তু সিপাহী বেশি দিন থাকতে হল না। কর্তৃপক্ষ খবর পেলেন, সে ভদ্রলোক জাতে ঠিক কনৌজিয়া নহেন, বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী ব্রাহ্মণ। তাঁকে বরোদা ত্যাগ করতে হল। যতীন্দ্রনাথকে নিরালম্ব স্বামীরূপেও অনেকে দেখেছেন। বরোদা স্টেশনের ঘটনাটা উল্লেখ করে রাখলাম যদিচ আমার কাছে ছাড়া অন্যের কাছে এর কোনো মূল্য নেই।

৫

যথাসময়ে বিজাপুর রওয়ানা হলাম। আমাকে যাঁরা গাড়িতে তুলে দিতে স্টেশনে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন N. I. A-র মুনশি মহাশয়, লালশঙ্কর ভাই। তিনি ট্রেন ছাড়বার সময় চুপি চুপি আমাকে উপদেশ দিলেন, "তুমি যত শিগগির পার জজ হয়ে যেয়ো, তাতে ঢের কম হাঙ্গামা পোহাতে হবে। কালেক্‌টরি করা তোমার মতো মেজাজী মানুষের পোষাবে না।" আমি ভালো-মন্দ কিছুই বললাম না। বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বিদায় নিলাম। জজ হওয়ার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। চাকরি যদি করতেই হয়, চিরদিন কালেকটরিতে থেকে প্রজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখব, এই ছিল আমার মতলব। তখন তো জানতাম না, বুঝতামও না যে চাকরিতে নিজের ইচ্ছা বলে একটা জিনিসের কোনো মূল্যই নেই। লালশঙ্কর ভাই সত্যি অতি চমৎকার লোক ছিলেন। প্রথমবার তাঁর কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকতাম, তিনি অত কমিশনার-ঘেঁষা মানুষ ভেবে। কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার আহমদাবাদ যাই তখন তিনি পেনসন নিয়েছেন। আর ইজার-কোর্তা পরে

আমলাদের পেছনে ধাওয়া করতে হত না। আহমদাবাদে যত সংকর্ম, যত সার্বজনিক কাজ, সবের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। সেবার আমি তাঁর যথার্থ স্বরূপ চিনলাম। আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হল। কত রকমে তিনি যে আমাকে ঋণী করলেন তার ইয়ত্তা নেই।

লীলী সাহেবের যথার্থ ডান হাত ছিলেন আর-এক ভদ্রলোক। তাঁর নামটা আর করব না, কিন্তু ভদ্রলোক অসাধারণ মানুষ ছিলেন। পনেরো টাকা কেরানিগিরি থেকে নিজগুণে চড়ে উঠেছিলেন, যতদূর ডেপুটি কালেকটরের চড়া সম্ভব। উন্নতির চরম সীমায় তিনি ওঠেন নিজের বড়োসাহেবের উপর গোয়েন্দাগিরি করে। এই বড়োসাহেবটিও সেকালের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁরও নাম করে আজ কোনো ফল নেই। ভদ্রলোক বড়োসাহেব হলেও অর্থের প্রতি তাঁর মমতা সাধারণ পাহারাওয়ালার মতোই ছিল। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। তাঁর দান-খয়রাতের গল্প আজও অনেকে করে থাকে। ক্লাইবের দিনে আমলাবর্গের, Naboob-দের রজত-প্রীতির কথা ইতিহাসে পড়েছেন। সেই নবাবের দল কিছু একশো বছরে সমূলে লোপ পায় নেই। উনিশ শতকেও এমন অনেক বড়োসাহেব ছিলেন, যাঁরা লোকের কাছে রাজা, নবাব, আমীর ইত্যাদি আখ্যা পেয়েছিলেন। তাঁরা যেমন দুহাতে অর্থ সঞ্চয় করতেন, তেমনই দরাজ হাতে আবার সে-টাকা ছড়াতেন। এই-সব আমীর সাহেবদের বাগান-ফোয়ারা বিবিখানা সংবলিত প্রাসাদতুল্য বাড়ি আজও বোম্বাইয়ের স্থানে স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে যখন কোম্পানির রাজত্ব উঠে গেল, তখন ধীরে ধীরে হাকিমদেরও চাল-চলন বদলাতে আরম্ভ হল। কিন্তু পুরানো হাকিমদের সরাতে কিছু বেগ পেতে হয়েছিল আমাদের নূতন সরকারকে। এই দুর্নীতিদমনের কাজে যে সমস্ত নেটিব আমলা-কর্তাদের বিশেষ রকমের সাহায্য করেছিলেন, তার মধ্যে মুখ্যতম ছিলেন আমার আহমদাবাদের বন্ধুটি। সাধারণ লোকে তাঁকে বাঘের মতো ভয় করত। আমাদের মতো চুনোপুঁটি হাকিমদের তো তিনি একরকম অভিভাবকই ছিলেন। আমাদের বাংলা ভাড়া করে দেওয়া, ঘোড়া কিনে দেওয়া, ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা পাস করিয়ে দেওয়া, এ-সব কাজে তিনি আমাদের মুরুব্বি ছিলেন। আমাকেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন তিনি। তবু তখনকার দিনে তাঁকে ভালোবাসতে পারি নেই। আজ বুড়োবয়সে বুঝতে পারি যে

তাঁর দেহে সেই যুগের দোষগুলোও যেমন ভরা ছিল, গুণও তেমনি পূর্ণমাত্রায় ছিল। এককথায় তিনি একজন কর্মীপুরুষ, মস্তলোক ছিলেন। লালশঙ্কর ভাইয়ের মতো তিনি তো ব্রাহ্মণ ছিলেন না! তাই তাঁর কোনো শুচিবাই ছিল না। তখনকার আবহাওয়াই অন্যরকম ছিল। ম্যাক্স ওরেল জন বুলের কথা কি লিখে গেছেন, পাঠকের মনে আছে তো। ইংরেজ বাপ ছেলেকে কর্মক্ষেত্রে পাঠাবার সময় এই বলে না কি আশীর্বাদ করতেন, 'দেখিস বাছা পয়সা রোজগার করিস। ধর্মপথে থেকে পারিস তো খুব ভালো কথা, কিন্তু পয়সা আনাই চাই।' ইংরেজ বাপই যে একলা ছেলেকে এই আশীর্বাদ করতেন, তা আমি বিশ্বাস করি না। সে যুগে অনেক দেশের ছেলেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কাজ করতে বেরতেন। যাক্ গে, আমার বন্ধুটির কথা বলি। তিনি আমাকে সর্বদা বলতেন, "You must always be discreet।" সাবধান করে দিলেন, "My boy, beware of the Deccani tongue-waggers."

চমৎকার কথা নয়? যারা একদিন সারা ভারতবর্ষকে নিজের মুঠোর ভেতর প্রায় ভরেছিলেন তাঁরা tongue-waggers-ই বটে। আর-একটি লোকের কথা বলে আহমদাবাদের কথা শেষ করব। আমি যখন প্রথম চাকরি নিলাম তখন যে-কটি তরুণ গুজরাতীর সঙ্গে আলাপ হল, তার মধ্যে একজন ছিলেন বর্তমান কংগ্রেস-নেতা ভুলাভাই দেশাই, তিনি তখন অ্যাডভোকেট পরীক্ষার জন্য পড়ছেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলে, আর যাকে বলে keen as mustard (সর্ষের মতো ঝাঁঝালো)। তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হবে তা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম।

আগেই বলেছি যে আমার ঠিক এই সময়ে বিজাপুর যাওয়ার নানারকম সাংসারিক অসুবিধা ছিল, তবু বিজাপুরের মতন একটা পুরানো রাজধানী দেখবার আগ্রহও মনে খুব জেগেছিল। কেবলই মনে করতাম যে এইবার সব সেকেলে মুসলমান খানদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে। গুজরাতে সে-রকম সাবেক ঘরানার মুসলমান বড়ো একটা দেখি নেই। যা দুই-একজন দেখেছিলাম তাঁদের চাল-চলন ধরণ-ধারণ একেবারে গিরাসিয়া রাজপুতদের মতো। আর আহমদাবাদ শহরের মুসলমান ভদ্রলোক যাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল তাঁদিকে বিশেষ ভালো লাগে নেই। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে

এমন ব্যাপার দাঁড় করিয়েছিলেন যে, আহমদাবাদ আঞ্জুমান-ই-ইসলামের সেক্রেটারি হয়েছিলেন লালশঙ্কর ভাই— জাতে নাগর ব্রাহ্মণ। তাই বিজাপুর যাওয়ার আগে ঘুরে ঘুরে কেবলই এই কথা মনে হত যে এইবার সত্যি বনেদী ঘরের মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে ভাব হবে, আর তাদের প্রাণে একটা নূতন উৎসাহের সঞ্চার করবার সুযোগ পাব। বাস্তবিক উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতের মুসলমান জাতটা এত নিরুদ্যম ভগ্নোৎসাহ ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল যে তাদের সংস্পর্শে এলেই আমার মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে যেত। মনে হত এ জাত আবার না জেগে উঠলে ভারতে মহাজাতি সংগঠনের চেষ্টা বৃথা।

তাই চাকরির শেষ পর্যন্ত যখন যেখানে সুবিধা পেয়েছি মুসলমান সমাজকে একটু সামনে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছি। শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীও তো সাহায্য করেছিল। আজ মুসলমান সম্প্রদায় নূতন জীবনের সন্ধান পেয়ে আনন্দে অতি-মাত্রায় অধীর হয়েছেন। এতে অ-মুসলমান অনেকেই বিরক্ত। কিন্তু আমার কেবলই মনে হয় যে আমার স্বপ্ন সত্য হয়েছে, আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি সামান্য প্রচেষ্টাগুলো আজ সার্থক হচ্ছে।

সত্যিকার বিজাপুর দেখলাম আমার স্বপ্নের আদিলশাহী বিজাপুর থেকে একেবারে আলাদা। বিজাপুর শহর ও তার আশপাশ যেন একটা মহা-শ্মশানের মতন। চারি দিকে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল পাথরের স্তূপ আর পোড়োবাড়ি। তার মাঝখানে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহম্মদ আদিল শাহের সমাধি গোল-গুম্বজ। রেলে আসতে আসতে বহুদূর থেকে নজরে পড়ে এই প্রকাণ্ড গুম্বজ। আপনারা অনেকেই এই সমাধি-মন্দিরের ছবি দেখেছেন, তাই আমি এর বর্ণনা করে আপনাদের বিরক্ত করব না। তবে এইটুকু বলি যে গুম্বজের পাদমূলে যে balconyটা চারি দিকে ঘুরে গেছে সেটা এত চওড়া যে দু-তিনখানা মোটরগাড়ি পাশাপাশি তাতে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। এই গুম্বজের আর-এক নাম বোল-গুম্বজ, কেননা balconyতে কোনো একটা আওয়াজ হলে বেশ মিনিট দুই ধরে বারবার তার প্রতিধ্বনি হয়। নানারকম লোকে সেই balconyতে উঠে গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা আনন্দে কাটিয়ে দিত। আবার বেশি মার্জিত-রুচি কেউ কেউ তার ভিতরে পিস্তল ছুঁড়ে আমোদ করতেন। গুম্বজের ভিতরে অনেক

জায়গায় পিস্তলের গুলির দাগ দেখেছিলাম। মহম্মদ আদিল শাহের অদৃষ্ট! এই সমাধির বাইরে যে নক্করখানা বা দেউড়িঘর আছে সেইখানে আগে সাহেবদের ডাক-বাংলা ছিল। সেকালের কোন্ বিচক্ষণ হাকিমের হুকুমে এ সুব্যবস্থা হয়েছিল তা আমি জানি না। তবে কার্জন সাহেব বছরখানেক আগে যখন বিজাপুরে এসেছিলেন তখন এক কলমের খোঁচায় এই অতি বিসদৃশ ব্যাপার খতম করে দিয়ে গেছলেন। মহম্মদ শাহের স্মৃতির অবমাননা শুরু করেন কিন্তু তাঁর আপন সন্তান আলী আদিল শাহ। বাপের উপর টেক্কা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই আলী নিজের জন্য এমন এক বিশাল সমাধি-মন্দির তুলতে আরম্ভ করেছিলেন যে তার চূড়ার ছায়া গিয়ে পড়বে গোল-গুম্বজের চূড়ায়। কিন্তু বেচারার ইচ্ছা পূর্ণ হল না। আলী রোজার দোতলা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই আলি ইহলোক ত্যাগ করলেন। সেই অসম্পূর্ণ ইমারতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খিলানগুলোর মাঝে সমাধিস্থ হলেন আলী আদিল শাহ। আজও সেই রোজার খিলানের বহর দেখলে আন্দাজ করা যায় যে ইনি কি বিশাল সমাধি-মন্দিরই ফেঁদেছিলেন! বিজাপুরের ইমারতগুলোর প্রধান সৌন্দর্য আমার যা চোখে লাগত সেটা তার বিশাল গঠন। নইলে কারুকার্য খোদাই বা mosaic বা জালির কাজে বিজাপুরের বাড়িগুলো আহমদাবাদের কি দিল্লী-আগ্রার ইমারতের কাছেও লাগে না। এক চিনি-মহলের ভেতরে শুনতে পাই সর্বত্র চিনেমাটির বিচিত্র রঙিন টালি বসানো ছিল, কিন্তু ক্রমশ সেগুলো হস্তান্তরিত হয়ে দূর বিদেশে চলে গেছে। আমার সময় আর প্রায় ছিল না। কে নিয়েছিলেন বা কাকে কত দামে দিয়েছিলেন সে-সব অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। আরশ-মহল বলে আর-এক সেকেলে প্রাসাদ ছিল তাতেও তো আরশের (শ্বেত-পাথরের) চিহ্নমাত্র বর্তমান ছিল না। সে-সব পাথরই বা কে নিলে! আমাদের নেবব্-সাহেবদের আমলে যাকে বলে পুকুর-চুরি কত যে হয়ে গেছে তার কি গুণতি আছে!

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাস করতেন 'দুই বোন' বলে এক জোড়-গুম্বজের একটার তলে। এই 'দুই বোন'ও ছিল এক প্রাচীন সমাধি-মন্দির। এর মেজের নীচে ছিল বিখ্যাত উজীর খাওয়াস খান ও তাঁর মুরশিদের কবর। আর উপরে আমরা খানাপিনা নাচ গান করতাম। একটা সভ্য জাতের পক্ষে কি করে এটা সম্ভব হয়েছিল আজ বোঝা শক্ত। বিজাপুরের

মজাই এই ছিল যে আমরা সবাই বাস করতাম সাবেক ইমারতগুলোর ভেতরে। যতদূর মনে আছে, আমার সময়ে নূতন একেলে বাংলা বা কাছারিবাড়ি একটাও ছিল না। বাদশাহী আমলে যে বাড়িগুলো বাসস্থান কি আদালত ছিল, সেগুলো কাজে লাগানোতে হয়তো কোনো দোষ নেই, কিন্তু কর্তাদের কোনো বাছ-বিচার ছিল না। সমাধি-মন্দির এমন-কি মসজিদ পর্যন্ত সরকারী কাজে লাগানো হয়েছিল। ডাকঘর ছিল পুরানো বোখারী-মসজিদে। অবশ্য এ-সব হতে পেরেছিল এইজন্য যে বিজাপুরে বনেদী ঘরের মুসলমান প্রায় কেউ ছিলেন না। আদিলশাহীর পতনের পর ধীরে ধীরে সবাই নিজাম রাজ্যে বাস করতে চলে গেছলেন। কার্জন লাটসাহেবকে লোকে যাই বলুক না, তিনি ভারতবর্ষের সাবেক ঐতিহাসিক ইমারতগুলোকে বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। বিজাপুরে এসেও তিনি আদিলশাহী ধর্ম-মন্দিরগুলোকে অবমাননা হতে রক্ষা করবার কড়া ব্যবস্থা করে গেছলেন। গোল-গুম্বজের দেউড়িবাড়ির কথা আগেই বলেছি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও 'দুই বোন' হতে বিতাড়িত হলেন। ডাকঘরও বোখারী-মসজিদ থেকে স্থানান্তরিত হল।

এ সবই sentiment-এর কথা। তবে sentiment-এর কি কোনো মূল্য নেই। আমার নিজের একটা গল্প বলি শুনুন। একবার আমরা একদল ছোটো বড়ো হাকিম অজন্তা-গুহা দেখতে গেছলাম— সাতজন সাহেব ও আমি। প্রাচীন ভারতের চিত্রকলা দেখতে দেখতে ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, তাই দুই-তিন বাক্স ভরে ভোজ্য-পানীয় সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা ধরে গুহাগুলো ঘুরে ফিরে শ্রান্ত হয়ে টিফিন করতে বেরিয়ে এলাম। এক গুহার দুয়ারের কাছে চাদর বিছিয়ে চাকরেরা টিফিন সাজিয়েছিল। রাশি রাশি খাদ্যের স্তূপ! কিন্তু আমার দেখেই হঠাৎ গা ঘিন ঘিন করে উঠল। মনে হতে লাগল কি পাষণ্ড আমি, কতকগুলো বিদেশী বিধর্মীর সঙ্গে জুটে আমার ধর্ম-মন্দিরের অপমান করছি। দাঁড়িয়ে উঠলাম। উঠে আস্তে আস্তে বললাম, "আমি এখানে খাব না, তোমরা খাও।" সে বেচারারা হতভম্ব হয়ে আমার মুখের পানে তাকালে। তারা বুঝতেও পারলে না যে কেন আমি হঠাৎ এরকম বেরসিকের মতন ব্যবহার করছি। চারি দিক থেকে, "Why man? what nonsense!" ইত্যাদি রব উঠল। আমি

অগত্যা আমাদের দলের সবচেয়ে প্রবীণ W.-কে একপাশে নিয়ে গিয়ে বললাম, "W., আমাকে বৌদ্ধ-বিহারের সামনে এই-সব মদ-মাংস খেতে বোলো না, তোমরা আরম্ভ করো, আমি কিছু রুটি মাখন নিয়ে গিয়ে অন্যত্র খাই।" সে ভদ্রলোক তখনো বুঝতে পারে না। বললে, "কেন? তুমি তো বৌদ্ধ নও! আর এই গুহাগুলোও তো এখন ধর্ম-মন্দির নয়, এখানে তো যে যা খুশি করে!" আমি বললাম, "তা হোকগে W., আমার মুখে এখানে খাবার উঠবে না, আমাকে মাপ করো। নিজের দেশের জাতের অপমান আমি এমন করে করতে পারব না।" W. গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন, "All right, Dutt, I understand." ফিরে গিয়ে ধীরে ধীরে সবাইকে বললেন, "এখানে খাওয়া হবে না। চলো নীচে নেমে গিয়ে খাওয়া যাক।" আর কেউ কোনো কথাই বললেন না। বোধ হয় বুঝলে যে একটা-কিছু অন্যায় কাজ করা হচ্ছিল। তার পরে সকলে মিলে মহা হল্লা করে নদীগর্ভে এক স্বাভাবিক পাথরের চাতালের উপর বসে টিফিন টুকরিগুলো খালি করা গেল। কিন্তু সত্যি কথা বলি, আমি নিজে সেদিন হ্যাম-সাণ্ডউইচ্ ও কোল্ড চিকেন খেয়ে কিছু আনন্দ পাই নেই। মনটা কেমন হয়ে গেছল।

যাকগে, sentiment করে কাজ কি! বিজাপুরের যে অংশটায় আমরা থাকতাম ও কাছারি করতাম সেটার নাম আর্ক-কেল্লা (citadel)। আমি যে বাড়িতে থাকতাম তার নাম আনন্দ-মহল। বাদশাহী আমলে সেই বাড়ির দালানে নাচগানের আসর বসত। দালানটা প্রকাণ্ড, কত প্রকাণ্ড তা আপনাদিকে বুঝিয়ে বলা শক্ত। তবে একটা আন্দাজ করে দিতে পারি। সামনে তিনটে খিলান, মাঝের খিলানটার বহর প্রায় ৬০ হাত, পাশের দুটো প্রত্যেকটা ৩০ হাত। এই দালান হতে এক দিকে একটা ছোটো দরজা দিয়ে ঢুকতে হত আমার আবাসে। অন্য দিকে সেইরকম আর-এক দরজা দিয়ে ঢুকতে হত আমার কাছারিতে। মাঝখানটায় সামনের দিকে নীচের তলাটা ছিল আমাদের ক্লাবের বিলিয়ার্ড ঘর ও লাইব্রেরি। তার উপর দুই তলায় থাকতেন জজসাহেব। সমস্ত বাড়িটা চোরকুঠরি ও খুপরিতে এমনই ভরা ছিল যে দেখে লোকের তাক্ লেগে যেত। কি কাজে লাগত এই খুপরিগুলো! লোকে বলত, মহম্মদ আদিল শাহ নাকি লুকোচুরি খেলতেন তাঁর প্রণয়িনী রম্ভাবাইয়ের সঙ্গে এইখানে। এই মহম্মদ-রম্ভার প্রেম বিজাপুরের ইতিহাসের

একটা বড়ো মিষ্টি জিনিস। এদের কত ছবি তখনকার দিনে কিনতে পাওয়া যেত। আবার এই আনন্দ-মহলেই নাকি উজির কামাল খাঁ খুন হয়েছিলেন। গল্পটা আপনাদিকে বলি। প্রথম আদিল শাহ ইউসুফ ছিলেন জাতে তুর্কী, ধর্মে শিয়া, কিন্তু তিনি সবরকমে উদার-হৃদয় মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রধানা বেগম ছিলেন এক মারাঠী হিন্দু মহিলা। যখন ইউসুফ আর্ক-কেল্লা তৈরি করেন তখন কেল্লার ভেতর রেখে দিয়েছিলেন এক প্রাচীন হিন্দু-মন্দির। সে মন্দির আমার সময়েও ছিল। শোনা যায় যে পরবর্তী কোনো কোনো বাদশাহ সেই মন্দিরে পূজা দিতেন। ইউসুফের সেনানী ও আমলাবৃন্দের ভেতর অনেকেই ছিলেন সুন্নী। তাঁর মৃত্যুর পর সুন্নী উজির কামাল খাঁ ষড়যন্ত্র করলেন যে বালক সুলতান ইসমায়েলকে মেরে নিজে সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু ইসমায়েলের মা— ইউসুফের মহারাষ্ট্রীয় মহিষী— সময়ে সব জানতে পেরে এক তুর্কী সৈনিক পাঠিয়ে কামালকে খুন করালেন। রাজ্য বেঁচে গেল। লোকে বলত যে এই কামাল খাঁর প্রেতাত্মা আনন্দ-মহলে ঘুরে ঘুরে বেড়াত অন্ধকার রাত্রে। ভাগ্যক্রমে আমাদের নজরে কোনোদিন পড়ে নেই সেই প্রেতাত্মা। তবে এই বিজাপুর জায়গাটাই এমন ছিল যে কেবল মনে হত যেন প্রেতাত্মার সংসর্গেই বাস করছি। আর্ক-কেল্লার মধ্যের রাস্তাগুলো প্রায় সারাদিনই থাকত কেমন নিঝুম, নির্জন। কখনো কখনো এমনও দেখেছি যে দিনে-দুপুরে দু-তিন ঘণ্টা ধরে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে একটা লোকও যাওয়া আসা করলে না। আনন্দ-মহলের লাগা আর-এক প্রাসাদ, গগন-মহল। তার হাতার মধ্যে ছিল আমাদের ক্লাবের টেনিস খেলার জায়গা। গগন-মহলের তিনটি দেওয়াল মাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেতরে নাকি কাঠ-কাঠরার অনেক কারুকার্য ছিল। লোকে বলত যে সে-সব মারাঠারা ভেঙে নিয়ে গিয়ে তাদের সাতরার রাজবাড়িতে লাগিয়েছিল। মারাঠারা ভাঙাচোরা লণ্ডভণ্ড করার কাজ বড়ো একটা করত না। তবে গগন-মহলের উপর তাদের একটা বিশেষ রকমের বিদ্বেষ থাকার কথা। কেননা এই মহলেই সুলতানের দরবারে পান আতর নিয়ে বিখ্যাত সেনাপতি আফজল খান বেরিয়েছিলেন ছত্রপতি শিবাজীকে ধরে আনতে। গগন-মহলের সুমুখে খাড়া রয়েছে সুন্দর সুদৃশ্য এক খিলান। তার আকার বিশাল, প্রায় চৌষট্টি হাত চওড়া। খিলান আর ইমারতটার মাঝে কি ছিল তা এখন বোঝাবার উপায় নেই।

আফজল খানের কথা বলতে মনে হল যে আমরা আফজল ও শিবাজীর ব্যাপারটার যে বর্ণনা ইংরেজি ইতিহাসে পড়ি সেটা অনেকাংশে রচা কথা। 'বুসাতীন ও সালাতীন' বলে বিজাপুরের এক নিজস্ব ইতিহাস আছে। তাতেও এ ব্যাপারের উল্লেখ আছে। তার থেকে এ কথা মোটেই মনে হয় না যে সমস্ত দোষটা শিবাজীর স্কন্ধে চাপানো যায়। যাই হোক্, রাজায় রাজায় যুদ্ধ তো আর ten commandments-এর নীতি অনুসারে চলে না। সুতরাং আফজল শিবাজীকে ফন্দী করে ধরবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন কি না, তার বিচার আজকের দিনে নিষ্ফল। কেননা, আজ আমাদের চোখে আফজল খান ও শিবাজী, প্রতাপসিংহ ও মানসিংহ, আকবর ও আওরঙ্গজেব সবাই নমস্য ব্যক্তি, সবাই আমাদের ভারত-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

বিজাপুর শহর হতে খানিক দূরে আফজলপুর বলে এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামের কাছে এক পুকুর-পারে ঘন বনের ছায়ায় দেখা যায় সারি সারি ছেষট্টিটা কবর। কিংবদন্তী যে, সেনাপতি আফজল খানের ছেষট্টি জন বেগম ছিলেন, শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে সেনাপতি জানতে পারেন যে আসন্ন যুদ্ধে তাঁর মরণ নিশ্চিত, তাই তিনি স্বহস্তে বেগমদিগকে বধ করে তাঁদের দেহ কবরস্থ করে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিংবদন্তী সত্য কি না বলা শক্ত। তবে এরকম ব্যাপার তখনকার দিনে ঘটত। আমি যে-মুসলমান বন্ধুর মুখে গল্পটা শুনেছি তিনি বিজাপুরেরই লোক, জুমা মসজিদের পুরোহিতবংশে তার জন্ম।

আগে বলেছি যে বিজাপুরের ইমারতগুলোর বিশেষত্ব তাদের বিরাট design। এটাই সাধারণ নিয়ম। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। ইব্রাহিম শাহের সমাধিমন্দির আকারে বৃহৎ হলেও নানারকম সূক্ষ্ম খোদাই-কাজে ভরা। কিন্তু যারা আহমদাবাদের রানী সিপ্রীর মসজিদ কি আবুর দিলবাড়া মন্দির কি আগ্রা ফতেপুর সিক্রীর বিখ্যাত ইমারতগুলো দেখেছেন, তাঁদের ইব্রাহিম রোজা দেখে মন উঠবে না। কিন্তু গোল-গুম্বজের বিশাল ধূসরবর্ণ কায়া, তার মাথার উপরকার প্রকাণ্ড সাদা-সিধে আরব গড়নের dome, তার কারুকার্যবিহীন মস্ত মস্ত দেওয়াল যে দেখবে তারই মন শ্রদ্ধায় ভরে যাবে। উত্তর ভারতের ক্ষীণ কটি ইন্দো-সারাসেনিক-গুম্বজের সঙ্গে খোদাই, mosaic, খুচরো সাজ-সজ্জা শোভা পায়, কিন্তু আসল সারাসেনিক-গুম্বজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। বিজাপুরে এটা খুব বুঝেছিলাম।

তবে এই বিজাপুরেই আবার দুটি এমন সুন্দর ইমারত আছে, যা দেখলে অতি বড়ো কাঠ-খোট্টা আরবেরও চোখ জুড়িয়ে যাবে। একটি হচ্ছে আমাদের আনন্দ-মহলের পাড়ারই মক্কা মসজিদ। ঠিক যেন খেলাঘরের বাড়ি, চারি দিক ঝক্ ঝক্ করছে, ছোট্টটি কিন্তু কি চমৎকার! লোকে বলত যে আগেকার দিনে বেগম-শাহ্‌জাদীরা এই মসজিদে প্রার্থনা করতে আসতেন। কেউ কেউ আবার বলত যে এই মসজিদ আদিলশাহী রাজত্বের চেয়েও পুরানো, হিন্দু রাজাদের আমলে কোনো ভগবদ্ভক্ত পীর রাজার অনুমতি নিয়ে এটা তুলেছিলেন।

অন্য ইমারতটি হচ্ছে মেহতর-মহল। নাম মহল বটে কিন্তু সত্যি একটি মসজিদের সিংহদ্বার মাত্র। কিংবদন্তী যে এক মেথরের অর্থে এই সর্বাঙ্গসুন্দর মহলটি তৈরি হয়েছিল। ইমারতটি বাহির থেকে দেখতে যেমন চমৎকার, ভেতরের খোদাই-কাজও সেইরকম অপরূপ ও বিচিত্র। কিছুকাল আগে এর একটি মিনার ভেঙে পড়ে গেছল। কার্জন লাটের শুভাগমন উপলক্ষে কর্তারা এক নূতন মিনার তৈরি করিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তো আনাড়ি মানুষ, যখন দেখলাম নূতন-পুরানোতে কোনো তফাৎই ধরতে পারলাম না। কিন্তু স্বয়ং লাট বাহাদুরেরও নাকি তাক্ লেগে গেছল। ভারতবর্ষে প্রাচীন শিল্পকারিগরির ধারা আজও একেবারে শুকিয়ে যায় নেই। তবে প্রায় চাপা পড়ে গেছল আর কি!

৬

বিজাপুরের বাদশাহী আমলের ইমারত সম্বন্ধে গবেষণা একটু বেশি মাত্রায় হয়ে যাচ্ছে। পাঠক হয়তো বিরক্ত হচ্ছেন। তবু আর-একটি সাবেক ইমারতের উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। এই ইমারতের নাম আসার-মহল। এর আগে নাম ছিল দাদ-মহল, কেননা তখন এইখানে রাজ্যের প্রধান আদালত বসত। পরে যখন মহম্মদ আদিল শাহ হজরৎ পয়গম্বের শ্মশ্রুর দুচার গাছি কেশ সংগ্রহ করে এই মহলের এক কামরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন থেকে এর নাম হল আসার-মহল (relic), আর এটা একটা পবিত্র পীঠস্থান বলে গণ্য হতে লাগল। বিজাপুরে এই মহাপুরুষের শ্মশ্রুর কেশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নেই। কিন্তু কয়েক বছর পরে সিন্ধের রোহরী শহরে বার-মুবারক বলে আর-এক মন্দিরে দেখেছিলাম। মন্দির লোকে লোকারণ্য। ধূপের

গন্ধে চারি দিক ভরপুর। স্তোত্রগানের গুরুগম্ভীর স্বরে মন্দিরের চূড়া ধ্বনিত। এই আবেষ্টনের মাঝে যখন প্রধান মুল্লা ইসলাম-গুরুর পবিত্র কেশ বার করলেন তখন আমাদের মতো বাজে লোকেরও যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, চোখ ভারী হয়ে এল।

আসার-মহল বাড়িখানা আমার সময়ে বেশ ভালো অবস্থাতেই ছিল, প্রায় ভাঙে চোরে নাই। এর দোতলায় একটা কামরায় অনেক সেকেলে গালিচা ইত্যাদি আসবাবপত্র রাখা থাকত। তারই একটা গালিচার নকসী নকল করে বিজাপুর জেলের বিখ্যাত লাল রঙের পূজার আসন (prayer carpet) তৈরি হয়ে দেশ-বিদেশে চালান যেত। কিন্তু এই মহলের বিশেষত্ব আর-এক কারণে। দোতলায় অনেক কুঠুরির দেওয়ালে অতি সুন্দর নানা রঙের ছবি আঁকা ছিল। আলমগীর বাদশাহের হুকুমে সেই চিত্রগুলি, বিশেষ করে মহম্মদ আদিল শাহের প্রতিমূর্তি নষ্ট করা হয়। দিল্লীর বাদশাহ বিজাপুরে শুধু যে এই একটা নিরর্থক ধ্বংসের কাজ করেছিলেন তা নয়। নগর অবরোধের সময় বিখ্যাত সমাধি-মন্দির ইব্রাহিম রোজার এক অংশও তিনি তোপ মেরে ভেঙে দিয়েছিলেন। আদিলশাহীর পতনের পরে মোগল বাদশাহের বোধ হয় রাগ কতকটা পড়ে গেল, কেননা তিনি দয়া করে রোজার এই ভাঙা অংশ মেরামত করে দিলেন। কিন্তু আসার-মহলের ছবি যেমনকার তেমনি ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রইল। কে জানে হয়তো মুসলমান ধর্ম-মন্দিরে মানুষের মূর্তি আঁকা দেখে অতি-ভক্ত মোগল ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

বিজাপুরে থাকতে কেবলই মনে হত যে মূর্খ মোগল দক্ষিণের মুসলমান রাজ্যগুলো ধ্বংস করবার জন্য কেন এত ব্যস্ত হয়েছিল, কেন এই পাগলামি করতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলে? আমার এক দরজি ছিল। সে উত্তর ভারতের গোঁড়া মুসলমান। নিতান্ত ভালোমানুষ হলেও দিল্লীর অতীত গৌরবে তার মনপ্রাণ সদাই মশগুল থাকত। তার ভাবটা ছিল এইরকম— ভারি তো বিজাপুর রাজ্য, আমাদের বাদশাহ এসে কেমন সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছলেন! তার কথায়-বার্তায় এই ভাবটা কেবলই ব্যক্ত হয়ে পড়ত। তাই বিজাপুরের বাজারে নেটিব মুসলমানদের সঙ্গে বেচারাকে অনবরত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করতে হত। আমার কাছে এসে ক্রমাগত নালিশ করত যে এই-সব বেতমিজ ছোটোলোকদিকে হুজুরের এজলাসে মোকদ্দমা করে সে

উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দেবে। শেষ একদিন বাজারে খুব মারধর খেয়ে লোকটা একেবারে হিন্দুস্তানমুখো হয়ে পলায়ন দিলে। আর ফিরল না। আলমগীরের বিজাপুর অভিযানের ফল কতদূর গড়াল, দেখুন।

দিল্লীর মোগলেরা কি ভাবতেন জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে বিজাপুরের আদিল শাহেরা হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে কি করে রাজ্য চালাতে হয়, তা খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন। আগেই বলেছি যে প্রথম বাদশাহের মহিষী ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়া। এ কথাও বলেছি যে আর্ক-কেল্লার মাঝে একটি পুরানো হিন্দু-মন্দির আজও দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ এমনও বলেন যে বাদশাহেরা সময়ে অসময়ে সেই মন্দিরে পূজা দিতেন। বিখ্যাত ইব্রাহিম আদিল শাহ জগৎগুরু এই হিন্দু-নাম নিয়েছিলেন। তাঁর আমলের অনেক কাগজপত্রের উপর, 'শ্রীশ্রীসরস্বতী জয়তি' এই পাঠ দেখা যায়। এই জনপ্রিয় সুলতান ফারসী ও কানাড়ী মিলিয়ে এক নূতন ভাষা তৈরি করে তাতে স্বয়ং কবিতাদি লিখে গেছেন। কিন্তু শুধু এই-সব কারণেই আমি আদিলশাহী সুলতানদিকে প্রজারঞ্জক বলছি না। বিজাপুর অঞ্চলে মুসলমানদের হাতে বিনষ্ট কোনো মন্দিরেরই চিহ্ন আমি দেখি নেই। সে প্রদেশের বাসিন্দা ছোটো জাতের হিন্দুরা যে কখনো অত্যাচার জুলুমের ভয়ে দলে দলে মুসলমান হয়ে গেছল, তারও কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। সেনাপতি আফজল খান শিবাজীকে সাজা দিতে বেরিয়ে গিয়ে যখন তুলজাপুরের ভবানী মন্দিরের অবমাননা করলেন তখনই না বিজাপুরের ব্রাহ্মণ পেশোয়া শিবাজীর কাছে দূত পাঠালেন। সে পর্যন্ত তিনি বা ক্ষত্রিয় সেনানীরা কোনোরকম নিমকহারামী করেন নেই। এই জেলায় দুবছর ঘুরতে ঘুরতে আদিলশাহীদের দেওয়া দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদির কত দলিল যে দেখেছিলাম তার সংখ্যা নেই। কিন্তু এ-সকলের চেয়ে এক আশ্চর্য জিনিস আমার নজরে পড়েছিল এক দূর পল্লীগ্রামে। গাঁয়ের বাইরে এক টিলার উপরে পীরের সমাধি। আর টিলার ভিতরে ভূগর্ভে গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গ মূর্তি। সমাধি ও লিঙ্গ দুই স্থানেই নিয়মিত পূজা চলছিল যখন আমি সে গ্রামে গেছলাম। তার পর দেখুন, বিজাপুরের নগর-প্রাচীরের উপর মালিক-ই-ময়দান বলে যে প্রকাণ্ড তোপ বসানো রয়েছে, হিন্দুরা ফুল সিন্দুর দিয়ে সেই তোপের আজও নিত্যপূজা করে থাকে। তোপটার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে যে কার্জন লাটসাহেব এই তোপের উপর বসে

ফোটো তুলিয়েছিলেন। আলমগীরের মাথায় বিজাপুর গোলকুণ্ডা জয়ের এত জেদ চেপেছিল বোধ হয় এইজন্য যে এ রাজ্যগুলো ছিল হিন্দু-ঘেঁষা।

পাঠকের হয়তো মনে আছে যে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি বিজাপুরাদি দক্ষিণের পাঁচ মুসলমান রাজ্য মিলে বিজয়নগরের মহাপরাক্রান্ত হিন্দুরাজাকে তালিকোঠার যুদ্ধে হারিয়ে দেন। যুদ্ধের পর হিন্দু রাজার কাটা মুণ্ডটা দখল করলেন আহম্মদ নগরের নিজাম শাহ। তিনি সেটাকে বল্লমের মাথায় বিঁধে নিয়ে গিয়ে তাঁর রাজধানীর ফটকের উপর লাগিয়ে দিলেন। বিজাপুরের আদিল শাহ করেন কি? তাঁরও তো একটা মুণ্ড চাই? তাই তিনি রামরাজার এক পাথরের মুণ্ড তৈরি করিয়ে সেটাকে এনে আর্ক-কেল্লার ফটকের মাথায় লটকে দিলেন। এ কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। কিন্তু পরে সেই পাথরের মুণ্ড যে কোথায় গেল, তার কি হল, তা দেড়শো-দুশো বছর অবধি কেউ কিছু জানত না। আমি বিজাপুব যাবার বছর খানেক আগে এক ব্যাপার ঘটল। তাজাবাউড়ি বলে শহরের যে প্রধান ইঁদারা আছে সেটা অনাবৃষ্টিতে প্রায় শুকিয়ে গেছল। তার পঙ্কোদ্ধার করতে করতে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবরা তলার পাঁকের মধ্যে পেলেন এক প্রকাণ্ড পাথরের মাথা। পুরানো ছবি ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা ঠিক করলেন যে ওটাই সেই রামরাজার মুণ্ড যা তালিকোটার যুদ্ধের পর আদিল শাহ তৈরি করে এনেছিলেন। স্থির হল যে সম্ভবত মারাঠারা রাগের মাথায় ওটাকে তুলে জলে ফেলে দিয়ে থাকবে। এখন সে মাথা কোথায় আছে তা ঠিক জানি না। তবে তখনকার দিনে আমাদের আনন্দ-মহলের নীচে এক কুটুরিতে অন্যান্য পুরানো পাথরের সঙ্গে রাখা থাকত। সাহেব-সুবো অনেকে এসে দেখে যেতেন।

ইতিবৃত্ত, পুরাতত্ত্ব নিয়ে মিথ্যা অনেক জটলা করলাম। এইবার আবার নিজের কথা বলি। আহমদাবাদ ছিল বড়ো শহর। সেখানে থাকতাম ইংরেজ-পল্লী ও ক্লাব থেকে বহু দূরে। মনের মতো দেশী বন্ধুও সেখানে বিস্তর জুটেছিল। তাই ইংরেজি সমাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ যোগ আহমদাবাদে হতে পারে নেই। কিন্তু বিজাপুর ছোটো জায়গা। সাহেবী সমাজ মানে জনা ছয়-সাত মাত্র কর্মচারী। আনন্দ-মহলেই ক্লাব, আনন্দ-মহলেই আমার বাস। কাজেই এখানে এসে রীতিমত সাহেব বনে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজি সমাজে মেলামেশার ভালো-মন্দ দুই দিকই আছে। ইংরেজ বললেই তো আর জুজু বোঝায়

না। হাকিমী মুখোসের আর সরকারী উর্দীর পেছনে যে মানুষটা থাকে, তার দেহে দয়ামায়া যা আছে তা আমাদের চেয়ে তো কম নয়ই, বরং এমন কতকগুলো গুণ আছে যা আমাদের মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ। তবে সব সময় এ-সব কথা তো মনে থাকে না। তাই মাঝে মাঝে একটু আধটু ঠোকাঠুকি লেগে যায়। এ ঠোকাঠুকির জন্য শুধু ইংরেজের দণ্ডই যে দায়ী তা নয়; আমাদের দৈন্য, আমাদের হীনতাও কম পাজি জিনিস নয়। এ-সব ব্যাপারের আলোচনা অপ্রিয় কিন্তু সত্য কথা আর সব সময় প্রিয় কি করে হবে।

বিজাপুর এসে যাঁকে আমার বড়োসাহেব বলে পেলাম, তিনি বয়সে প্রবীণ আর চরিত্রে একেবারে আসল জন বুল। মনে খল কপটতা এতটুকু ছিল না। বর্ণভেদ-জ্ঞানও অতি সামান্য। তাঁরই কথা আগে বলেছি যে কার্জন লাটের শুভাগমন উপলক্ষে এক ছোটোখাটো guide book লিখিয়ে মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। ভদ্রলোক কিন্তু ছেলে-ছোকরাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করতেন। আমি তো তখন সবে দু বছরের সিবিলিয়ান। আমাকে পিঠ চাপড়ে বললেন, "ভালো করে কাজ কর্ম শেখ, আপাতত তোমাকে একটা ছোটো মহকুমার ভার দেব।" বলা বাহুল্য, কথাটা আমার খুব মিষ্টি লাগল না। তবে বুড়ো মানুষকে বলিই বা কি? কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার অল্পদিনের মধ্যেই কার্যত পাল্টা জবাব দেওয়ার সুযোগ মিলল। আমি বিজাপুর আসার ঠিক আগে কালেকটর D. ও তাঁর সিনিয়র সহকারী দুজনে একমত হয়ে এক মামলতদারকে (sub-deputy) ঘুষ খাওয়ার অপরাধে বরতরফ করে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালানোর অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন কমিশনারের কাছে। কমিশনার সাহেব আমাকে হুকুম দিলেন— তুমি নূতন লোক, তোমার কোনো পক্ষপাত নেই; তুমি সব সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে তোমার মতামত রিপোর্ট করো। আমি একমাস ধরে খুব খুঁটিনাটি রকম বিচার করে আমার রায় পেশ করলাম যে মামলতদার সাহেব কোনো কোনো ব্যাপারে নিজের বন্ধু-বান্ধবের অযথা সুবিধা করে দিয়েছেন বটে, তবে ঘুষ খেয়েছেন এ কথা বলতে আমি প্রস্তুত নই। D. খুব চটে গেলেন। আমাকে ধমকালেন, "লোকটা ঘুষ নেয় নেই, তুমি কি করে জানলে? যত সব ছেলেমানুষ—।" কমিশনার কিন্তু আমার মতই গ্রাহ্য করে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাতে দিলেন না। এতে আমার একটু খাতির বাড়ল বইকি।

D.-র আর এক বড়ো দোষ ছিল। জেলা সংক্রান্ত কোনো জরুরি বিষয়ে পরামর্শ করার দরকার হলে দুজন প্রবীণ ডেপুটি কালেকটর ছিলেন, তাঁদের ডাকতেন। আমি বা আমার সহকর্মী T.কে কস্মিনকালেও কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না। প্রথমে আমার মনে হত যে আমি স্বদেশী রঙিন সিবিলিয়ান বলে কর্তা আমাকে এই হেনস্তা করছেন। কিন্তু পরে T.-র মুখে শুনলাম তাঁরও সেই দশা। সে আমার চেয়েও জুনিয়ার ছিল। কখনো কখনো আবার D. করতেন কি, আমাদের অধীনস্থ মামলতদারদিকে আমাদের কিছু না জানিয়ে সরাসরি হুকুম পাঠাতেন। আমি T.কে বললাম, "এসো বুড়োর কাছে গিয়ে দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে আসা যাক, আমরা কি কেউ নই নাকি।" সে কিছুতেই রাজি হল না। বললে, "কাজ কি গোলমালে, করুক-না যা খুশি ওর।" অগত্যা আমি একলাই গিয়ে নালিশ করলাম। সাহেব কোনো জবাবই দিলেন না। শুধু একটা কি রকম থোঁক্ গোছের আওয়াজ করে অন্য কথা পাড়লেন। T.কে জানাতে সে খুব ঠাট্টা করলে, "তোমারও যেমন কাজ নেই, ইচ্ছে করে অপমান হতে গেলে।" ভাবটা এই যে সে বীরপুরুষ, তাই দূরে দূরেই রইল।

মাস দুই পর ব্যাপারটা আরো ঘনিয়ে এল। হল কি, মামলতদারদের কাছ থেকে কালেকটরের নামে খানকয়েক রিপোর্ট আমার কাছে এসে জমা হল। আমি সেগুলোকে আটকে রেখে বেশ চেপে বসে রইলাম। দিনকয়েক বাদে কালেকটরের তাগিদ এল— তোমার অপিসে আমার নামে অনেকগুলো তালুকা রিপোর্ট আটকে রয়েছে, অবিলম্বে সেগুলো পাঠিয়ে দিয়ো। আমি জবাব দিলাম জমাবন্দীর কাজে বড়ো ব্যস্ত আছি, একটু সময় পেলেই ওগুলো ভালো করে দেখে আমার মতামতশুদ্ধ আপনার কাছে পাঠাব। দুই দিন না যেতেই এক সওয়ার এল আমার ক্যাম্পে D.-র জরুরি হুকুম নিয়ে— এই লোক মারফৎ রিপোর্টগুলো পাঠাবে, অনর্থক আমার কাজের ক্ষতি কোরো না। আমি সওয়ারের হাতে রিপোর্টগুলো তৎক্ষণাৎ দিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একখানা formal চিঠিও লিখলাম— মহাশয়ের হুকুম মুজব রিপোর্টগুলো পাঠাচ্ছি, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ যেন ভবিষ্যতে আমি আমার মহকুমা-সংক্রান্ত কথায় আমার মতামত জানাতে পাই, নইলে আমার কাজেরও অনেক ক্ষতি হয়। যখন সদরে ফিরলাম কর্তার কাছে মুখে খুব খানিকটা বকুনি খেলাম বটে, কিন্তু সেই দিন থেকে আমার পদোন্নতি হয়ে গেল, অর্থাৎ কর্তার inuer council-এ পরামর্শদাতার দলে

দাখিল হলাম। ভবিষ্যতে জেলা-সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তিনি আমার সলাপরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন। T.টা করলে না কিছুই, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে তারও হিল্লে হয়ে গেল।

এর পর D. যতদিন আমার জেলার হাকিম ছিলেন তাঁর সঙ্গে কাজকর্ম সম্বন্ধে বা অন্য কোনো সহকারীর কোনোরকম বোঝাপড়ার অভাব হয় নেই। সামাজিক বিষয়ে তো ওরকম মাথাঠাণ্ডা মানুষের ভুলচুক হওয়ার সম্ভাবনা এক-রকম ছিলই না।

কিছুদিন বাদে আমাদের জেলায় R. বলে এক জজ এলেন। বয়স অপেক্ষাকৃত কম। বেচারার স্বাস্থ্য খারাপ, আর বোধ হয় সেই কারণেই মেজাজ একটু রুক্ষ। একবার তাঁর খর্পরে পড়লে কোনো আসামীর খালাস পাওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল। আসামীতরফের উকিলদের সঙ্গে তাঁর নিয়ত খিটির-মিটির চলত ও এই বাবদে দুই-একবার হাইকোর্টে দরখাস্ত পর্যন্ত হয়ে গেছল। আমাদের একটু মুশকিল হল। সাধারণত খুনের ব্যাপারে মোটামুটি কিঞ্চিৎ প্রমাণ থাকলেই আমরা মোকদ্দমা দায়রাসোপর্দ করতাম। করাও বোধ হয় উচিত। কিন্তু R. সাহেবের গতিক দেখে আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম। খুব ভালো করে সাক্ষীদের নাড়াচাড়া না করে মোকদ্দমা তাঁর এজলাসে পাঠানোর সাহস রইল না। শেষ কি হল, দু-দুটা খুনের মোকদ্দমা একেবারে ছেড়ে দিলাম। আমার বড়োসাহেব আমাকে ডেকে খুব ধমক লাগালেন। জবাবে আমি তাঁকে স্পষ্ট বললাম, "রীতিমত প্রমাণ না পেলে R.-এর কাছে মোকদ্দমা পাঠাতে আমার সাহস হয় না। আপনি এ দুটো মোকদ্দমার নথিপত্র বেশ করে পড়ে দেখুন।" মজা হচ্ছে এই যে, এ দুটোর একটাতে চারজন খুনের direct (প্রত্যক্ষ) সাক্ষী ছিল, অন্যটাতে দুজন। প্রথমটা পড়ে D. সাহেব আমার সঙ্গে একমত হলেন। দ্বিতীয়টা দায়রায় পাঠাতে হুকুম করলেন। আমি পাঠালাম। বিচার অন্য জেলার এক বিচক্ষণ জজের কাছে হল। তিনিও প্রত্যক্ষ সাক্ষী দুজনকে অবিশ্বাস করে আসামীকে ছেড়ে দিলেন। মোটের উপর আমারই জিত রইল।

R.-এর সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্রও বে-বনতি ছিল না, যদিচ মাঝে মাঝে দুজনে খুব তর্ক লেগে যেত। তর্ক করতে করতে যখন তিনি খুব গরম হয়ে উঠতেন, তখন সকলে হেসে ফেলত। জনা ছয়-সাত মানুষ নিয়ে ছিল আমাদের সমাজ।

ঝগড়া-ঝাঁটি করার উৎসাহ কারো ছিল না। একবার কিন্তু R. এর সঙ্গে ঝগড়া লেগে যেতে যেতে কোনোক্রমে বেঁচে গেল। গল্পটা মন্দ নয়, আপনাদের শোনাই। আগেই বলেছি, আমি থাকতাম আনন্দ-মহলের এক দিকটায়, আর আমার আপিস ছিল অপর দিকটায়। মাঝখানে নীচে-তলায় ছিল ক্লাব, আর দোতলা তেতলায় বাস করতেন জজ সাহেব। আমি কি কাজে কদিনের জন্য পুনায় গেছলাম। আমাদের খাড়া হুকুম ছিল যে, রাত্রে চারি দিক বন্ধ করে সদর দরজার বাহিরে দালানে একজন চাপরাসী শোবে। দু তিন রাত বেশ কাটল। চতুর্থ রাত্রে ভোরের দিকে একটা চিংকার শুনে আমার চাপরাসীর ঘুম ভেঙে গেল। বেচারা ছিল বুড়োমানুষ, ভয়ে হুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দেখে যে জজ সাহেব দাঁড়িয়ে গর্জন করছেন, "যাও, নিকাল যাও, একদম নিকাল যাও, ইধার ক্যা করতা হো।" সে থতমত খেয়ে জবাব দিলে, "সাহেব, আমি আমার মনিবের হুকুমে এখানে রোজ রাত্রে শুয়ে থাকি।" জজ সাহেব তার ছাতির উপর একটা ধাক্কা মেরে বললেন, "আবভি নিকল যাও ইধরসে, বাংলেকে অন্দর যাকে শোও।" লোকটা বৃদ্ধ চাপরাসী হলেও জাতে মরাঠা। উত্তর দিলে, "আমি অন্য সাহেবের নোকর— তুমি আমার গায়ে হাত দাও কিসের জন্য সাহেব? মনিবের হুকুম এখানে দালানে শোবার, আমাকে এখানে শুতেই হবে।" আনন্দ-মহলের দালানটা প্রকাণ্ড। মাপে অন্তত সাত-আট কাঠা হবে। সেটা আমার একলাকার এলাকা না হলেও R. সাহেবের তার উপর কোনো বিশেষ হক্ ছিল না। সাহেব আর ধাক্কাধাক্কি করলেন না। একটু গালাগালি দিয়ে শাসিয়ে গেলেন—"কাল সকাল বেলায় তোমায় দেখে নেব।" পরদিন সকালে আমার চাপরাসীরা দল বেঁধে গিয়ে কলেকটার সাহেবকে সব ঘটনা জানিয়ে বললে, "আমাদের সাহেব পুণা গেছেন, এখন হুজুরের যেরকম হুকুম হবে, সেই রকম আমরা করব।" D. তাদিকে আমার আদেশ মতো দালানে শুতে বললেন। জজ সাহেবকে তিনি কিছু বলে থাকবেন, কেননা আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি আর কোনো গোলযোগ করেন নেই। আমি ফিরে এসে সব শুনলাম। বুড়ো চাপরাসী নামদেও কাঁদতে কাঁদতে বললে, "এ বিষয়ের বিচার হুজুরকে করতেই হবে।" সন্ধ্যাবেলা ক্লাবের সবাই চলে গেলে আমি আস্তে আস্তে R.-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার চাপরাসীর সঙ্গে তোমার কি হয়েছিল, জজ সাহেব?" দেখি D. তখনো চলে যান নেই, ঘরের কোণে কি

একটা অছিলা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। R. চটে গেল। মুখ বাঁকিয়ে উত্তর দিলে, "তোমার চাপরাসী আমার সঙ্গে বেয়াদবি করেছিল, তাকে সাজা দিয়েছি। আবার কি হবে?" আমি বললাম, "কিন্তু সে তো কবুল করছে না যে সে কিছু বেয়াদবি করেছিল। তা যাই হোক, আমার চাকরকে মারবার অধিকার তোমার আছে কি? এটাতো তোমার ভাবা উচিত ছিল! আমি লোকটাকে ডাকি, তাকে তুমি বল দিকি নি সে তোমার সঙ্গে কিরকম বেয়াদবি করেছিল।" D. একটু কাছে ঘেঁষে এসে বললেন, "দেখ, আমার সঙ্গে R.-এর এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়ে গেছে। ওর সেদিন শরীর খারাপ ছিল, ঘুম হয় নেই, তাই মেজাজটা ভালো ছিল না। R. ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, "হ্যাঁ সত্যিই সেদিন আমার শরীরটা বড়ো বিশ্রী ছিল। সারারাত ঘুম হয় নেই, তার উপর তোমার ওই চাকরটার সেই ভীষণ নাসিকা গর্জন!" আমি দেখলাম R.-এর রাগ পড়ে গেছে। তাই একটু হেসে D.-এর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি চাপরাসীকে ডাকি। জজ সাহেব তাকে দুটো মিষ্টি কথা বললেই সে খুশি হয়ে যাবে।" নামদেও আসতে R. তাকে বললে, "দেখো নামদেও, হাম তুমকো ধাক্কা মারা, এ কাম আচ্ছা নেই কিয়া।" বুড়ো একগাল হেসে সেলাম করে উত্তর দিলে, "হুজুর মালিক, হুজুর মা-বাপ।" গোলমালটা এত সহজে মিটে যাওয়াতে আমাদের তিনজনেরই খুব আহ্লাদ হল। বিজাপুর ছাড়ার পর R-এর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নেই। তবে অন্য ইংরেজ বন্ধুদের কাছে পরে শুনেছিলাম যে বিয়ে-থা করে তার মেজাজ বেশ শুধরে গেছল। যাওয়াই সম্ভব।

১৯০৩ সালে কার্জন বাহাদুর দিল্লীতে যে ব্যাপার করেছিলেন, আমরাও তার একটা ছোটোখাটো রকম অভিনয় করলাম বিজাপুরে। D. আমি ও T. মর্নিং-কোট ইত্যাদি পরে বড়োলাটের ছোটোলাটের ভূমিকা নিলাম। পুলিস সাহেব সমর-সাজে তলোয়ার ঝুলিয়ে D.-এর সঙ্গে সঙ্গে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আমাদের দরবার বসল চীনী-মহলের সেকালের বাদশাহী দরবার হল-এ। সুতরাং নটমণ্ডলী সব চুনোপুঁটি জাতীয় হলেও আমাদের রঙ্গমঞ্চকে তো কেউ ফেলনা জিনিস বলতে পারবে না! D. যখন গম্ভীর স্বরে সম্রাটের ঘোষণা পাঠ করলেন তখন তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল। পরে আমাকে চুপি চুপি বললেন, "আমার কি এসব পোষায়, নাটুকে ঢঙ তো কখনো শিখি নেই। তাঁর মহিষী কিন্তু তাঁর মতন ছিলেন না। তিনি বেদীর

উপর চন্দ্রাতপের নীচে যেরকম জাঁকিয়ে বসেছিলেন, তাতে প্রাচীন চীনী-মহলের অবমাননা হয় নেই। সন্ধ্যাবেলায় D. এক মস্ত পার্টি দিলেন আনন্দ-মহলের দালানে। সারা জেলার গণ্যমান্য সবাই এসেছিলেন। আসর সাজানোর ভার ছিল আমার গৃহিণীর উপর। আনন্দ-মহলের দালানের বহর তো আপনাদিকে আগেই জানিয়েছি। সে দালান সাজানো কি সহজ কথা? তায় আবার বিজাপুরে ফুল জিনিসটা দুর্লভ। কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বুদ্ধি কি হার মানে কখনো? খেজুরপাতা, কাগজের ফুল, রঙীন কাপড়ের থান, জাপানী ফানুস দিয়ে ভদ্রমহিলা যেন ভেল্কি লাগিয়ে দিলেন। কলেকটার বক্তৃতার সময় গদগদকণ্ঠে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন!

এর দু চারদিন পরে D. ছুটিতে বিলেত চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন B. বলে একজন স্বদেশী কলেকটার। এতে আমার খুব আনন্দ হওয়ারই কথা। কিন্তু স্টেশনে ভদ্রলোককে দেখেই হরিষে-বিষাদ উপস্থিত হল। একে ভয়ানক সাহেব, তায় আবার পদগৌরবে আত্মহারা। আমার ইংরেজি সহযোগী T. তো নূতন কর্তাকে দেখেই কেমন মুষড়ে গেল। আমাকে কানে কানে বললে, "By jove এ যে ভীষণ কলেকটার!" সাহেব গাড়িতে উঠেই আমাকে খুব মুরুব্বীয়ানা চালে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের বিজাপুর কি রকম জায়গা হে, দত্ত? আমি আসছি রত্নাগিরি থেকে, জান তো? সে এক অতি হতভাগা জায়গা। Fancy! আমার ছেলের জন্য একটা ফরাসী মাস্টার পেলাম না সেখানে।" তিনি যে রত্নাগিরিতে ছিলেন সেটা আমাদের সকলেরই জানা ছিল, কেননা সেখানে তিনি এক ভয়ানক কেলেঙ্কারী করে এসেছিলেন। শহরের কাছে দালদী (মুসলমান জেলে) পাড়ায় কি মারপিট হয়, সেথায় গোলমাল থামাতে গিয়ে জনা দুই মরাঠা কনস্টেবল দালদীদের হাতে মার খায়, তাতে সারা পুলিস লাইন ভয়ানক খাপ্পা হয়ে ওঠে। এই ব্যাপার নিয়ে আরো একটু আধটু গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তা নয়। তবে রত্নাগিরির লোক স্বভাবত শান্তশিষ্ট। সেখানে এমন-কি গণ্ডগোল হবে, যা জনাদশেক বন্দুকওয়ালা কনস্টেবল আধ ঘণ্টায় ঠাণ্ডা করতে পারে না? অথচ এই কলেকটার সাহেব ঘেবড়ে গিয়ে বোম্বাই সরকারকে তার করে জঙ্গী ফৌজ চেয়ে পাঠিয়ে বসলেন। ফৌজ তো এলই না, উপরন্তু বেশ একটুখানি রগড়ানি খেতে হল। এ ব্যাপার খবরের কাগজেও জাহির হয়ে গেছল।

সুতরাং রত্নাগিরির উপর আক্রোশ দেখে বেশ একটু হাসলাম মনে মনে।

সে কথা যাক্। বিজাপুরে আমাদের ক্লাবটি ছিল মোটামুটি গেরস্থ ঘরের ব্যাপার। কলেকটার D. সেটা বুঝেই চলতেন যদিও তাঁর গৃহিণী মাঝে মাঝে একটু আধটু ভুলচুক করতেন। কিন্তু আমাদের নূতন হাকিম প্রথম থেকেই এমন বেজায় চাল দিতে আরম্ভ করলেন যে আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। T. কে ও আমাকে দিবারাত্র 'my assistant, my assistant' করে লোকের কান ঝালাপালা করে তুললেন। আমার তো ছুঁচো গেলা-গোছ হয়েছিল। স্বদেশী Boss (কর্তা), ঝগড়া করতেও পারি না। দেখতাম ইংরেজেরা কানাকানি করছে, অথচ মুখটি বুজে থাকতে হত। কিছুদিনের মধ্যে বোধ হয় সাহেব আমাদের ভাবগতিক দেখে বুঝলেন যে আমরা তাঁকে নিয়ে একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি, একটা কিছু খোলাখুলি গোলমাল হওয়াও অসম্ভব নয়। তিনি চট করে মফঃস্বলে বেরিয়ে পড়লেন। পালালেনও বলা যায়। কেননা, তখনো সফরের মৌসুম আরম্ভ হয় নেই। কয়েকদিন বাদে যথাসময়ে আমরা সকলেও চারি দিকে ক্যাম্পে রওয়ানা হলাম। বাহিরে ঘুরতে আরম্ভ করে দেখি যে চাষা-ভুষোরা আদপে বুঝতে পারে নেই B. সাহেব নূতন জেলার হাকিম। তারা ধরে নিয়েছে যে আমিই কর্তা, কেননা তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম নালিশ আমার কাছে করতে লাগল। তার মধ্যে একটা ছিল বেশ মজার। সেইটের কথা আপনাদিকে বলি। দরখাস্তটা করেছে অমুক গ্রামবাসীরা মেহেরবান দত্ত সাহেব জেলা হাকিমের হুজুরে। আর্জির মজকুর এই যে গতমাসে আপনার সহকারী B. সাহেব এই গ্রামে দশ দিন ডেরা করেছিলেন, তিনি নানারকমে গ্রামের লোককে উত্ত্যক্ত করে গেছেন, নিজের খাবার জন্য গ্রাম থেকে রোজ একটা ভেড়া আনিয়ে তার একটা (leg) পা রেখে বাকিটা মালিককে ফেরং দিতেন, আর legটার জন্য চার আনা দাম দিতেন। পাঠকের মনে আছে তো যে তখনকার দিনে একটা ছোটো ভেড়ার কি পাঁঠার জন্য মোট এক টাকা দাম দেওয়াই হাকিমদের দস্তুর ছিল। আমার বড়ো সাহেব আবার এর উপরও কারদানি করলেন না কি! কিন্তু আমি কি করি? অনেক ভেবেচিন্তে আর্জিখানা আমার কর্তাকেই পাঠালাম। সঙ্গে একখানা চিঠিও লিখলাম যে এ দরখাস্ত কলেকটার সাহেবকেই করা হয়েছে যদিও ভুল ক্রমে এতে আমার নামটা জুড়ে দিয়েছে— আপনার কাছে পাঠাচ্ছি for favour of disposal।

আমি দরখাস্তখানা সব পড়েছি কিনা তার কিছুই উল্লেখ করলাম না। কর্তা পড়ে কি ভাবলেন বা কি করলেন, তা আমি আজও জানি না। কেননা দু-চার মাস বাদে আমি ছুটি নিলাম আর ছুটির পরে অন্যত্র বদলী হয়ে গেলাম।

বিজাপুরে আমি থাকতে থাকতে সেখানে Irrigation Commissonএর পদার্পণ ঘটল। এই কমিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন Scott Moncrief সাহেব। সভামণ্ডলী সবই ইংরেজ, কেবল একটি ভারতীয়। আরম্ভে জয়পুরের মন্ত্রীপ্রবর কান্তিবাবু মেম্বর ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় বাহাল হলেন মাদ্রাজের এক প্রবীণ সরকারী কর্মচারী রাও বাহাদুর রাজরত্নম্ মুদেলিয়ার। কলেকটার D.র মুখে শুনলাম যে সাহেব মেম্বর কজন তাঁর আতিথ্য স্বীকার করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তা হলে আমি মুদেলিয়ার মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করি?" D. উত্তর দিলেন "তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আবার মিছেমিছি এত খরচপত্র কেন করবে? আর কি জান তোমার সঙ্গে কি একজন সেকেলে গোঁড়া মাদ্রাজীর বনবে?" কথাটা বললেন একটু বিদ্রূপের ছলে। আমার জাতীয়ভাব জেগে উঠল। একটু ঝাঁঝালো স্বরে জবাব দিলাম, "আমার স্বদেশী একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বনবে না, তুমি বল কি!" D. হেসে উঠলেন, "বেশ তো! তুমি ওঁকে বাড়িতে রাখতে চাও তো রাখ না।"

আমি রাও বাহাদুরকে আগ্রহ করে নিমন্ত্রণ করলাম। তাঁর কমিশন তখন পুনায়। ফেরত ডাকে উত্তর পেলাম— আমাকে নিয়ে তুমি বিব্রত হয়ে পড়বে। মাদ্রাজীরা কিরকম গোঁড়া হিন্দু, তাকি তুমি জান না! আমার সঙ্গে লোকজন আছে, আমি সেলুন-এই থাকব। আমি নাছোড়বান্দা, আবার লিখলাম আপনার জন্য আলাদা ঘরদোরের ব্যবস্থা করে দেব। আপনার লোকই না হয় রান্না-বাড়া করবে।

যথাসময়ে আমার অতিথি এসে পৌঁছলেন। আমি তাঁকে আদর করে বাড়ি নিয়ে গেলাম। তাঁর বসবাসের জন্য একটা তলা ছেড়ে দিলাম। বাদশাহী আনন্দ-মহলে তো চাকরদের ঘরের অভাব নেই! তিন-চারটে কুঠুরী ঠিক করে দেওয়া গেল তাঁর লোকজনের জন্য, কিন্তু শুরুতেই এক মুশকিল হল। আমার চাকরেরা পেছনের যে সিঁড়ি দিয়ে যাতায়াত করত, সেটাতে তো ছোটো জাতের ছোঁয়াচ লেগে গেছে! রাও বাহাদুরের সাত্বিক-পাচক জানালে যে সে পথ দিয়ে তার মনিবের খাবার আনা চলবে না। মনিবকে কিছু বলতে আমার

সাহস হল না। তবে তাঁর কুড়ি বাইশের একটি ছেলে সঙ্গে এসেছিল, তার শরণাপন্ন হলাম। মনে করলাম, সে ইংরেজি জানা একেলে তরুণ, আমার দুঃখ বুঝে একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু ব্যবস্থা যা করলে সে অতি অপরূপ। সে বললে যে আনন্দ-মহলের সদর stair case দিয়ে তাদের খাবার নিয়ে আসতে বলে দিয়েছে। আমার তো চক্ষু স্থির! অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ও সিঁড়ি দিয়ে নানারকম অহিন্দু যাতায়াত করে, ওখান দিয়ে হিন্দুর খাবার আনা চলতে পারে না! ছোকরা খুব বিজ্ঞের মতো বার দুই তিন মাথা নেড়ে বললে যে আজকালকার দিনে কতকটা progressive (উদার) না হলে চলে কি? আসতে লাগল রাও বাহাদুরের খানা সদর পথে। পাঠকের মনে আছে তো, যে ওইটেই আমাদের ক্লাব? প্রথম দিন জনাদশেক আমরা দালানে বসে জটলা করছি এমন সময়ে ধীরে ধীরে এক মিছিল সিঁড়ি বেয়ে এল। আগে আগে আমার একজন চাকর ঘটি হাতে জল তড়তড়া দিতে দিতে। তার পেছনে আর একজন ভৃত্য সেই জলের উপর ঝাঁটা বুলোতে বুলোতে আসছে। আর সব পেছনে পাচক ঠাকুর দুই থালে মনিব ও মনিবপুত্রের অন্নব্যঞ্জন নিয়ে গুরুগম্ভীর চালে আসছেন। দৃশ্য দেখে সমবেত সাহেবরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। আমার কেমন লজ্জা বোধ হল। Slave mentality কি না! "আমাকে মাপ করবেন, আমার অতিথিরা এইবার খাবেন" বলে তাড়াতাড়ি আমি পলায়ন দিলাম। অতিথিদের বসে খাওয়ালাম। অবশ্য পাশের ঘরে দোরগোড়ায় বসে। রাও বাহাদুরের ছেলে আগেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তাঁদের খাবার সময় আমরা কেউ যেন ঘরের ভেতর না ঢুকি। কিন্তু পরের দিন বিষম বিভ্রাট ঘটল। ওঁরা খাচ্ছেন, আমি চৌকাঠের বাইরে বসে গল্প করছি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ছোট্টো দেড়বছরের মেয়ে। হঠাৎ এক সেকেণ্ড আমি যেই আনমনা হয়েছি কি আমার বেবী চট করে চৌকাঠ ডিঙিয়ে খাবার ঘরে ঢুকে পড়েছে। অজাতের মেয়ে ঘরে ঢোকবামাত্র বৃদ্ধ ও তরুণ মুদেলিয়ার দাঁড়িয়ে উঠলেন, আর কিছুতেই খেতে বসলেন না। আমি ভয়ানক অপ্রস্তুত হলাম, কিন্তু রাগও হল বইকি! এ কিরকম বিকট শুদ্ধাচার! তবু যদি না শূদ্র মুদেলিয়ার হত! আমাদের বুড়ি ঝি তো চটেই অস্থির, চিৎকার করতে লাগল, "মুয়ে আগুন অমন হিঁদুয়ানির। দু বেলা কাঁড়ি কাঁড়ি মুরগী মটন পেঁয়াজ রসুন খাচ্ছে, ওরা তো মোছলমান।" আমার

স্ত্রী মুখে কিছু না বললেও ভীষণ চটেছিলেন। পরদিন মুদেলিয়ার আমাকে বললেন, "মিসেস দত্তের সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আমার আজও হল না। আমাদের অধ্যক্ষ সাহেব তাঁর কত সুখ্যাতি করলেন। আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না যে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নেই।" আমার স্ত্রীকে জানালাম। তিনি কিন্তু বলে পাঠালেন, "আমাদের বাঙালীর ঘরের মেয়েদের বাহিরের লোকের কাছে বেরোতে নেই। রাও বাহাদুরের মতন একজন মাননীয় হিন্দু অতিথির সামনে আমি কেমন করে এত বড়ো অনাচার করব।" রাও বাহাদুর সত্যি কি ভাবলেন জানি না, তিনি যেন একটু অপ্রস্তত ভাবে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার এরকম অন্যায় অনুরোধ করাই ভুল হয়েছে। আমি জানতাম না যে আপনাদের সমাজে পর্দাপ্রথা আছে।"

কলেকটার D.কে বললুম। তিনি উত্তর দিলেন, "তোমাকে তো বাপু আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, তুমি শুনলে কই।"

৭

আমাদের বিজাপুরের আমলা-সমাজের কত গল্পই তো করলাম। কিন্তু একজনের নাম এতক্ষণ করি নেই এই জন্য যে তাঁকে কখনো আর পাঁচ জনের মতো দুদিনের পথের সাথী মনে হয় নেই। প্রথম পরিচয়ের পর হপ্তাখানেক যেতে না যেতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী অতি সহজেই আমাদের বড়ো ভাই বোনের স্থান অধিকার করে বসলেন। তাঁদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিল যতদিন বন্ধু এ জগতে ছিলেন। ১৯০৮ সালের ঘূর্ণিবায়ুতে পড়ে দু বছরের জন্য আমি বাংলা দেশে চলে এলাম, আর তিনিও চলে গেলেন কোন্ দূর অজানা দেশে। সব সম্বন্ধ ঘুচে গেল। কিন্তু তার আগের সাতটি বছর তাঁদের দুজনের জন্য কখনো বিদেশকে বিদেশ বলেই মনে হয় নেই। কত বার কত জায়গায় তাঁদের সঙ্গে থেকেছি। একবার তো বোনাই-এ সপরিবারে তিন মাস তাঁদের বাড়িতে ছিলাম। বিবি সাহেব মেয়েমানুষ কতকটা সেকেলে, তিনি অতি সহজভাবে বড়ো বোনের মতো আদর যত্ন করতেন, কিন্তু আহমদী কখন অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে আমার অন্তরে গুরুর স্থান অধিকার করেছিলেন তা নিজেই বুঝতে পারি নেই। একটা কথা নিশ্চিত যে বিজাপুরে দুটি বছর ওই ছোট্টো ইংরেজ সমাজের মাঝে কাটানো সত্ত্বেও যে আমার মনুষ্যত্ব উবে যায় নেই সে অনেকটা এই বন্ধুর গুণে।

তিনি নিজে ক্লাবের একজন খুব চাঁই ছিলেন। রসিক পুরুষ, কত রকমের গল্প গুজব শুনতে শুনতে ক্লাবে সকলেরই সন্ধ্যাটা আনন্দে কেটে যেত। কিন্তু মানুষটা তো কোনো ক্রমেই হালকা ছিলেন না, তাই এই সব করেও অনায়াসে নিজের ইজ্জৎ, নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বিবিসাহেব ইংরাজী বলতেন না। ক্লাবেও আসতেন না। সাহেব-মেম বাড়িতে দেখা করতে গেলে একবার দেখা দিতেন মাত্র। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে তার কোনো পর্দাই ছিল না। কলকাতা হতে আমাদের কেউ বিজাপুরে এলে তাঁর রাঁধাবাড়া খাওয়ান-দাওয়ানের ধুম লেগে যেত। শেষে এক মজা হল। ছোটো জায়গায় এরকম কি আর চলে! সাহেবরা আস্তে আস্তে টের পেলেন যে বিবি সাহেবের সত্যি কোনো পর্দা নেই। এক আধজন এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা পড়াও করলেন। দুই বন্ধু পরামর্শ করতে বসে গেলাম, কি করা যায়। একটা খানা-পার্টি না দিলে তো চলে না। কিন্তু গিন্নীকে রাজী করা তো সহজ নয়! ঘণ্টা দুই ধরে নানা তর্ক বিতর্ক করে তাঁকে আমরা বোঝালাম যে একটিবার এদের খাইয়ে না দিলে আর চলছে না। তিনি বললেন, "আপনারা খানা দিন না, আমি কি মানা করছি! মুসলমানের মেয়ে আমি টেবিলে বসব না।" বন্ধু হেসে উঠলেন, "হ্যাঁ, তুমি মস্ত বড়ো পর্দা বিবি! দত্তর ভায়েদের সঙ্গে কি করে খাও?" বিবিসাহেব এখন এমন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "ছি! ও কথা মুখে আনবেন না। তারা যে আমার আপন জন," যে বন্ধু তথা আমি লজ্জায় তখনকার মতন চুপ হয়ে গেলাম। পরে দুচার দিন ধরে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাঁকে একটিবারের মতন সাহেবদের সাথে খানা খেতে রাজী করা গেল। কিন্তু তিনি এক কড়া তাকীদ দিলেন যে সাহেব মেমেরা যেন বাড়ি থেকে মদটদ খেয়ে আসে, টেবিলে সরবৎ বই কিছু থাকবে না। তাই হল। আমাদের আমলা সমাজ খুব আনন্দ করে একদিন খেয়ে গেলেন। তাঁরা সত্যিই আহমদীকে ভালোবাসতেন, ও খাতির করতেন। কালেকটার D. বিবি সাহেবকে বলে গেলেন, "আপনি আমাদের সঙ্গে বসে খেলেন, এজন্য আমরা যথার্থই কৃতজ্ঞ।"

স্বামী স্ত্রী দুজনেই এঁরা কংগ্রেসভক্ত ছিলেন, আর দেশকে ভালোবাসতেন অন্তরের থেকে। আমাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কিছুদিন পরে আহমদী একখানা ছবি তুললেন, বিবি সাহেব, আমার স্ত্রী ও একটি পার্শী মেয়ের সঙ্গে। বিবি সাহেবের হুকুমে ছবিখানার নীচে লেখা হল "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।"

সেই ছবিখানা নিয়ে বিবিসাহেব অনেকদিন ধরে কত sentimental কথাই যে বলতেন! এঁদের বিজাপুরের বাড়িতে এখনকার দুজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। একজন পরম শ্রদ্ধেয় দেশনেতা আব্বাস তৈয়বজী সাহেব, আর একজন হায়দরাবাদের প্রধানমন্ত্রী আকবর হায়দরী সাহেব। আব্বাস সাহেবের তখন প্রৌঢ় বয়স, কিন্তু কি বিশাল বলিষ্ঠ শরীর! আমরা তো জোয়ান ছিলাম। তবু তাঁর একটা ঘুষো খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ ছিল না। ভদ্রলোক খুব আমুদে, বিজাপুরে যে কদিন ছিলেন, দিবারাত্র হৈ হৈ করে কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। বাহির থেকে দেখাত যেন একজন সাধারণ বড়ো ঘরের ছেলে, পয়সা কড়ির অভাব নেই, তাই ভাবনা চিন্তাও নেই। কিন্তু ভেতরে হালকাপনার লেশমাত্র ছিল না। আমার সঙ্গে বেশ ভালো করে আলাপ হয়েছিল। ঐ কদিনের মধ্যেই দু তিনবার আমাকে আলাদা বেড়াতে নিয়ে গিয়ে দেশ সম্বন্ধে, দেশী কর্মচারীর দায়িত্ব সম্বন্ধে, কত উপদেশ দিয়েছিলেন। উপদেশ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মোটেই গুরুমহাশয়ের মতন নয়। তাঁর কথা-বার্তা আমার এমন ভালো লেগেছিল এইজন্য যে তার পেছনে একটা সরল অথচ জ্বলন্ত দেশাভিমান ছিল। ভদ্রলোক বয়োবৃদ্ধ, উচ্চ কর্মচারী, শিক্ষা দীক্ষা আদব কায়দায় বিলাত-ফেরত, জাতে মুসলমান, তাঁর প্রাণে ঐরকম দেশপ্রেম দেখে আমি খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। বন্ধু আহমদীকে বলাতে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আজও মনে আছে—যতদিন যাবে ততই বুঝতে পারবে যে আব্বাসের মতো খাঁটি লোক খুব কম। পরে আব্বাস সাহেবের সঙ্গে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম যে বন্ধু এক বর্ণও বাড়িয়ে বলেন নেই। একটা কথা মনে করে পরে অনেক হেসেছি যে তখনকার আব্বাস আজকের মতোই দেশভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর তখনকার দেশ-প্রেমকে non-violent কোনোক্রমেই বলা যেত না।

আকবর হায়দরী ছিলেন আহমদীর ভাগ্নে। তিনি তখনকার দিনে কলকাতায় finance বিভাগে বড়ো চাকরি করতেন। খোশ মেজাজ লোক ছিলেন বটে, কিন্তু কতকটা চাপা। বেশি কথা কইতেন না। তৈয়বজী পরিবারের অন্য সকলের মতো তিনিও খুব কংগ্রেসভক্ত ছিলেন। মুসলমানদের যে কোনো একটা আলাদা রাষ্ট্রনীতি থাকতে পারে, তা তিনি মোটেই স্বীকার করতেন না। শুধু তাই নয়। কোনো রকম সাম্প্রদায়িক ইস্কুল কলেজকে তিনি

দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। আলীগড় বেনারস-এর নামে জ্বলে উঠতেন। এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ ছিল, তাই দুজনার মাঝে মাঝে বিষম তর্ক লেগে যেত। যখন খুব গরম হয়ে উঠতাম তখন আহমদী হেসে দুজনকেই থামিয়ে দিতেন। হায়দরী আমাকে ঠাট্টার স্বরে বলতেন, "এই তুমি দেশকে ভালোবাস! মোল্লা আর পুরোহিতগুলোকে ছেঁটে ফেলে দিতে পার না।" সেদিনের হায়দরী আর এখনকার Sir Akbar-এ কত তফাৎ। সময় সময় ভাবি। ভেবে মনে আনন্দ হয় না।

আগেই বলেছি যে বিজাপুর শহরে ভদ্র মুসলমানদের বাস বড়ো একটা ছিল না, তবে, গরিব-গুরবো মুসলমান শহরে ও আশেপাশে অনেক ছিল। তাদের মধ্য থেকে অতি অল্প-সংখ্যক ছেলেই ইস্কুলে পড়তে যেত। যাতে আরো বেশি গরিবের ছেলে হাইস্কুলে ঢুকতে পারে সেই উদ্দেশ্যে হেডমাস্টার মহাশয় দরিদ্র মুসলমান ছাত্র ভাণ্ডার নামে এক ফণ্ড করলেন। আহমদীর ও আমার এই কাজে প্রথম থেকেই যোগ ছিল। আমরা সহজেই আমলা-মহল থেকে মাসিক ষাট টাকা চাঁদা তুলে দিতে পারলাম। কিন্তু দরিদ্রের তো নানা বালাই। এক বছর যেতে না যেতেই মুসলমানেরা দুই দল হয়ে গেলেন। আমরা অনেক চেষ্টা করেও মিটমাট করতে পারলাম না। একদল গোঁট ধরলে যে নিরক্ষর মুসলমান সমাজের প্রধান দরকার মকতব, হাই ইস্কুল নয়। তারা কাউকে কিছু না বলে পুরানো সন্দল-মসজিদে এক মকতবের পত্তন করে বসল। কাজেই আমাদের ফণ্ডের টাকা দুভাগ করে দিতে হল। কলেকটার D. যে কতদূর উদারহৃদয় ছিলেন তা এই থেকে বোঝা যায় যে তিনি এক কথায় তাঁর মাসিক দশ টাকা চাঁদা ডবল করে দিলেন। আমরা সকলে তা করে উঠতে পারি নেই।

সারা জেলাতে মুসলমানের বাস কমই ছিল। তবে এক একটা বড়ো গ্রামে অনেক ঘর জোলা মুসলমান বাস করত। তাদের বেশির ভাগ তখনো জাত-ব্যবসা ছাড়ে নেই। এই জোলারা সম্ভবত আগেকার কালে উত্তর ভারত থেকে এসেছিল। খান্দেশ, নাসিক, ঠাণা জেলাতেও অনেক গ্রামে এইরকম হিন্দুস্থানী জোলাদের বসতি দেখেছি। বিজাপুর জেলায় এদের সব চেয়ে বড়ো কেন্দ্র ছিল ইলকল। সেখানকার রেশমী-শাড়ির নাম-ডাক তখনো খুব। তেমন চমৎকার নরম রেশম, তেমন সুন্দর নানা রঙ্গের চৌখুপী বুনন অন্যত্র বড়ো

একটা দেখতে পাওয়া যেত না। এখন সে শিল্পের অবস্থা কি, তা আমি জানি না। সব গ্রামে কিন্তু রেশমী কাপড় হত না। বেশির ভাগ জোলা রঙীন সুতির লুগড়ি (দক্ষিণী শাড়ি) বুনে দিন গুজরাণ করত। সাধারণ লুগড়ির দাম ছিল এক টাকা। কাজেই কারিগরের মুনাফা খুব বেশি থাকত না। এরা কাপড় বুনত সেই সেকেলে মান্ধাতার আমলের তাঁতে। কোনো রকম ঠকঠকি তাঁতের সঙ্গে এদের পরিচয় ছিল না। জেলায় বয়ন-শিল্পের উন্নতি করার উদ্দেশ্যে আমাদের ডিস্ট্রিক্টবোর্ড স্থির করলেন যে ঠকঠকি তাঁতের প্রচলন করতে হবে। নানা তর্ক-বিতর্ক জল্পনা-কল্পনা করে বাংলাদেশ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ আমদানি করা হল। এই expertএর নাম ছিল সতীশবাবু, পদবী এখন ভুলে গেছি। ইনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন একজন ফরাসডাঙার বাঙালী তাঁতি। শহরের মাঝখানে এক লম্বা চালাতে সতীশবাবু তাঁর ঠকঠকি তাঁত দুখানা বসালেন। হাকিমেরা আপন আপন তহশীলের জোলাদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন সদরে এসে নূতন তাঁত দেখে যেতে। আমার মহকুমাতে বড়বন বলে এক বিখ্যাত জোলা গ্রাম ছিল। আমি উৎসাহের আতিশয্যে স্বয়ং সেখানে গিয়ে জনা দুই বুড়ো সর্দারকে ধরে নিয়ে এলাম। কিন্তু এতেও বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। জোলারা একজন দুজন করে এসে নূতন তাঁত দেখে চলে যেতে লাগল, কিন্তু fly-shuttle কেউ কিনতে চাইলে না, শিখতেও চাইলে না। আহমদী ও আমি জেলার নানা জায়গায় ঘুরে বক্তৃতাদি করে এলাম, কিন্তু তাতেও কিছু ফল হল না। বুড়োদের মুখে সেই পুরানো গজগজানি 'ও তাঁতে কোনো সুবিধা নেই, জোরে তো চালান যাবে না, জোরে চালালেই সুতো ছিঁড়ে যাবে' ইত্যাদি। শেষে সতীশবাবুর মাথায় এক ফিকির এল। তিনি এক প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে হিন্দীতে বললেন, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমার তাঁতী যতক্ষণে দুখানা শাড়ি বুনবে ততক্ষণে আপনাদের কোনো জোলা যদি একখানা শাড়ি শেষ করতে পারে তো আমি দশটাকা বাজী হারব। এইরকম একটা অবজ্ঞা-ভরা চ্যালেঞ্জের কথা শুনে জোলারা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বড়বনের এক জোলা সেইখানেই পাল্টা জবাব দিলে, সে দশ রুপেয়া বাজী লাগাতে তৈয়ার আছে। যথোচিত ধুমধাম করে এক শনিবারে ম্যাচ-এর ব্যবস্থা করা গেল। আমলাবর্গ, মহাজন-মণ্ডলী, উকীল-মোক্তার, সকলের সামনে বাজী শুরু হল। তাঁতশালের এক কোণে বাঙালী

তাঁতী কোমরে রঙীন গামছা বেঁধে সতীশবাবুর ঠকঠকি তাঁতে বসল। অপর কোণে বড়বনের জোলাটি তার নিজের ঘরের তাঁতে কাপড় বুনতে আরম্ভ করলে। কত ঘণ্টা বাজী চলেছিল তা এখন মনে নেই, কিন্তু পুরানো তাঁতে যখন একখানা শাড়ি শেষ হল তখন দেখা গেল যে বাঙালী তাঁতি প্রায় আড়াই-খানা বুনে ফেলেছে। সতীশবাবু কিন্তু বাজীর টাকা কিছুতেই নিলেন না। কলেকটার সাহেব দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকেই কিছু কিছু দিলেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের তরফ থেকে ইনাম স্বরূপ। এই বাজীর ফল কিন্তু খুব ভালো হল, কেননা বড়বনের সেই সর্দার জোলাটি তৎক্ষণাৎ fly-shuttle শিখতে লেগে গেল। কিছুদিন না যেতে যেতে সতীশবাবুর আরও অনেকগুলি ছাত্র জুটল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন। ওই তরুণ ভদ্রলোকটির মতো একনিষ্ঠ কর্মী আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি কি পারিশ্রমিক রোজগার করেছিলেন, তা এখন ভুলে গেছি। তবে এইটুকু মনে আছে যে সেটা তাঁর কাজের তুলনায় যৎসামান্য। এই তাঁতের কাজকে তিনি একটা ব্রতের মতো মাথায় তুলে নিয়ে-ছিলেন, কিন্তু বেশিদিন চালাতে পারলেন না। বছর খানেকের মধ্যে শোলাপুরে হঠাৎ কলেরায় মারা গেলেন। বিজাপুরের জোলারা শেষ পর্যন্ত সবাই ঠকঠকির তাঁত গ্রহণ করলে কিনা, তা আমি জানি না। না করে থাকে তো মিলের আড়াআড়িতে কি আর এতদিনে টিঁকে আছে।

এইবার আপনাদিকে বিজাপুর জেলার সাধারণ লোকের বিষয় দুচার কথা বলব। এই জেলাটি কানাড়া বা কর্ণাট প্রদেশের এক ভাগ। লোকের ভাষা কানাড়ী! ভাষাটি তেলেগুর মতো আধা আর্য, আধা দ্রাবিড়ী। মহারাষ্ট্রের লাগা প্রদেশটায় আর্য শব্দগুলোর বেশি প্রয়োগ। তেমনি খাস মহীশূরের কথিত ভাষায় আর্য শব্দের ব্যবহার নেই বললেই হয়। বিজাপুর জেলার চাষী বেশির ভাগই লিঙ্গায়ৎ জাতের। এই জাতকে একটা আলাদা সম্প্রদায় বললেও ভুল হয় না, কেননা এরা ব্রাহ্মণকে মানে না। এদের নিজেদের পুরোহিত আছে। তাদিকে জঙ্গম বলে। প্রত্যেক লিঙ্গায়ৎ কোমরে একটি ছোটো শিবলিঙ্গ ধারণ করে। সাধারণ গৃহস্থ এই প্রতীক এক সুন্দর সুঠাম রুপার বাক্সে রেখে রুপার জিঞ্জির দিয়ে সেই বাক্স কোমরে ঝোলায়। অসমর্থ গরিবের পক্ষে রজতাধারের বদলে লাল শালুর পুঁটুলির ব্যবস্থা। এই লিঙ্গায়ৎরা যে শুধু চাষী তা নয়।

অধিকাংশ ব্যাপারী মহাজনও ছিল এই জাতের। তবে তখনকার দিনে

বিজাপুর জেলায় এদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার চল হয় নেই। তাই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এঁদের তেমন বেশি রেশারেশিও ছিল না। ব্রাহ্মণেরা ছিলেন উকিল, ডাক্তার ও সরকারী আমলা, এঁরা ছিলেন চাষী, ব্যাপারী ও মহাজন। কাজকর্ম একরকম নির্বিবাদে চলে যাচ্ছিল। তবে পাশের ধারোয়াড় বেলগাঁও জেলায় এই দুই জাতের মধ্যে বিদ্বেষ অতি বিশ্রী রকম বেড়ে উঠেছিল। সেখান থেকে মাঝে মাঝে লিঙ্গায়ৎ প্রচারক আসতেন আমাদের জেলায় এই বিদ্বেষের আগুন ছড়াতে। আমি প্রথম প্রথম জিনিসটা ঠিক বুঝতাম না। হিন্দু সমাজের মধ্যে দুটো জাত যে এই রকম নির্লজ্জভাবে পরস্পরের সর্বনাশ করতে কোমর বাঁধতে পারে তা বুঝব কি করে! সাধারণত শহরে ব্রাহ্মণদের জোর ছিল বেশি, কিন্তু দূর পল্লীগ্রামে লিঙ্গায়ৎরাই ছিল সর্বেসর্বা। আমার প্রথম বছরের সফরেই এই বর্ণ-বিদ্বেষের একটা বেশ স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলাম। গল্পটা বলি শুনুন।

এক নূতন ক্যাম্পে এসে পৌচেছি সন্ধ্যা বেলাতে। সারা পথটা হরিণ শিকার করতে করতে এসেছি, তাই বড়ো শ্রান্ত। তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে দেয়ে, শুয়ে পড়বার উদ্যোগ করছি, এমন সময়ে চাপরাসী এসে খবর দিলে যে মামলতদার রাও সাহেব এসেছেন। এত রাত্রে— তখন নটা বেজে গেছে, রাও সাহেবের শুভাগমনে খুব খুশি হলাম তা বলতে পারি না। একবার ভাবলাম, সকাল বেলায় আসতে বলে দিই। ফের মনে হল, ভদ্রলোকের তালুকাতে প্রথম এসেছি, ওঁর সঙ্গে এখনো পরিচয় হয় নেই, ফিরে যেতে বললে হয়তো ক্ষুণ্ন হবেন। বাহিরে চৌকি কেদারা রাখতে বলে বেরিয়ে এলাম। রাও সাহেব যথারীতি আদর অভ্যর্থনা করে বললেন, "এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করছি, মাপ করবেন। কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছে, সেটা আপনাকে জানানো আমার কর্ত্তব্য।" দূরে জনা দুই তিন লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদিকে কাছে ডেকে বললেন, "এঁরা এই গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এঁদের কিছু নালিশ আছে।" আমার বিরক্ত বোধ হল। দাঁড়িয়ে উঠে উত্তর দিলাম, "এত রাত্রে আমি নালিশ শুনতে পারব না, মহাশয়। আপনি ত তালুকা ম্যাজিস্ট্রেট, যাহয় ব্যবস্থা করবেন আজ রাত্রির মতো।" একজন ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকায়, সৌম্যমূর্তি কাছে এগিয়ে এসে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, "শুভমস্তু মহারাজ। আমরা দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সারাদিন উপবাসী, আমাদের পূজা পণ্ড হল, আজ আর জলগ্রহণ করতেও পাব না।

এর কি কোনো প্রতিবিধান নেই এ রাজ্যে ?" ব্রাহ্মণের অনুযোগ শুনে বড়ো লজ্জা হল। তাড়াতাড়ি বসে বললাম, "অবশ্য প্রতিবিধান আছে, শাস্ত্রী মহাশয়। বসুন। বলুন, কি হয়েছে।" ব্রাহ্মণ তখন তাঁদের দুঃখের কথা বললেন, "আজ কার্তিকী একাদশী। আমরা প্রতি বৎসর এই দিনে গোধূলি-লগ্নে আমাদের দেবতাকে মিছিল করে এক মন্দির হতে আর এক মন্দিরে নিয়ে যাই। তারপর সেইখানে যথারীতি সন্ধ্যা-আরতি পূজা-অর্চনা করে উপবাসের পারণ করি। বাদশাহী আমল থেকে এই ব্যবস্থা চলে আসছে। তিন বছর আগে এখানকার লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় আমাদের মিছিল বন্ধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা সময় মতো জেলা হাকিমকে দরখাস্ত করায় কোনো গোলযোগ হয় নেই। এ বছর আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। আগে হতে কোনো ব্যবস্থাই করি নেই। হঠাৎ বাজারের মাঝখানে প্রায় শতখানেক লিঙ্গায়ৎ লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের মিছিলের পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমরা অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম কিন্তু তারা কিছুতেই পথ ছাড়লে না। অগত্যা দেবতাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাও সাহেবকে জানালাম। আপনি এসেছেন শুনে তিনি আমাদিকে আপনার হুজুরে নিয়ে এসেছেন।" সে রাত্রে আর কিছু করণীয় ছিল না। রাও সাহেবকে বলে দিলাম যেন সকাল বেলায় উভয় পক্ষ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত থাকেন। পরদিন প্রায় দুঘণ্টা ধরে উভয় দলের বক্তব্য শুনে, দলিল নকশা ইত্যাদি দেখে আমার কোনো সন্দেহই রইল না যে ব্রাহ্মণেরা কার্তিকী একাদশীর মিছিল গাঁয়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। স্থানীয় লিঙ্গায়ৎদের প্রমুখও এ কথা স্বীকার করলেন। কিন্তু একজন ইংরেজী জানা তরুণ লিঙ্গায়ৎ ছিল, সে কিছুতেই চুপ করে না। বলতে লাগল, "আমরা কিছুতেই যেতে দেব না, সাহেব। আগে ওরা আদালতে ওদের অধিকার সাব্যস্ত করুক।" খবর নিয়ে জানলাম লোকটি ধারোয়াড়ের লোক, পেশা মোক্তারি, এইরকম করে সর্বত্র গোলমাল বাঁধিয়ে দু পয়সা রোজগার করে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি তো বাহিরের লোক, এখানকার ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ?" সে একটু গরম হয়ে জবাব দিলে, "এ আমাদের বীর শৈবসম্প্রদায়ের অধিকারের কথা—।" আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আপনি বীর হতে পারেন, শৈবও হতে পারেন, কিন্তু এখান থেকে মানে মানে আজই সরে পড়ুন। আমি ফৌজদার সাহেবকে বলে দিচ্ছি

আপনার গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে।” লোকটা রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। কিন্তু লিঙ্গায়ৎদের প্রমুখ মহাশয় বললেন, “ফৌজদার সাহেবকে কিছু বলতে হবে না, হুজুর। আমিই ওঁর সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।”

সন্ধ্যাবেলা বাজারের চৌমাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আগের ব্যবস্থামত লিঙ্গায়ৎদের চার পাঁচজন মাতব্বর আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। অধিকাংশই লিঙ্গায়ৎ। কিন্তু কারো হাতে লাঠিসোটা না দেখে আশ্বস্ত হলাম। আমার পেছনে একটু দূরে ফৌজদার (Sub-Inspector) বারোজন বন্দুকধারী পাহারাওয়ালা নিয়ে খাড়া ছিলেন। সকাল বেলায় মাতব্বররা লিখে দিয়েছিলেন যে কোনো গোলমাল হলে তাঁরা দায়ী। তাঁরা গেরেপ্তার হতে প্রস্তুত। ধারোয়াড়ের বক্তাটি ঠিক সরে পড়েছিলেন। একজন মাতব্বর হেসে বললেন, “লোকটা ভালো নয়, সাহেব। ছোকরাগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।” যথাসময়ে ব্রাহ্মণদের মিছিল এসে পৌছল। সঙ্গে রাও সাহেব মামলতদার মাত্র দুজন নিরস্ত্র কনস্টেবল নিয়ে। আমাকে দেখে ব্রাহ্মণদের প্রাণে ভরসা এল। তারা বারবার দেবতার জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। আমি লিঙ্গায়ৎ প্রমুখকে বললাম, “আমি ওঁদের সঙ্গে যাচ্ছি। আপনারাও আসুন-না! প্রসাদভক্ষণ করে ফিরবেন।” “চলুন সাহেব। আপনিই যখন যাচ্ছেন আমাদের কি আপত্তি!” বলে তিনি এগিয়ে এলেন। লিঙ্গায়ৎ যারা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল, ধীরে ধীরে তারাও অনেকে সঙ্গ নিলে। প্রধান ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছলছল চোখে বললেন, “এই রকমই হত সাহেব, আগেকার দিনে। কেন যে আজ মানুষের মাথা বিগড়ে যাচ্ছে, কে জানে!” মন্দিরে পৌছে মহা ধুমধাম লেগে গেল। রাত বারোটা অবধি নাচ গান প্রসাদভক্ষণ চলল। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, ফৌজদার ও সেপাইরা শেষ পর্যন্ত সঙ্গেই ছিলেন, তবে দূরে দূরে। এটা হয়েছিল আমার প্রবীন রাও সাহেবের পরামর্শমত। তিনি আমাকে কানে কানে বলেছিলেন, “তুমি অঘটন ঘটাচ্ছ, তা সত্যি, সাহেব। তবু বন্দুক সঙ্গে থাকা ভালো।”

লিঙ্গায়ৎদের অনেক গল্পই করা যায়। তবে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি হবে। মোটের উপর এদিকে আমার খুব ভালো লাগে নেই। অন্তত গুজরাতের পাটীদারদের মতো লাগে নেই। এদের দেহে গুণের অভাব নেই। চাষী হিসেবে বুদ্ধি-সুদ্ধি যথেষ্ট। ইজ্জতের জ্ঞানও প্রবল, দরকার পড়লে সবাই একজোটও

হতে পারে, তবে বড়ো নিষ্ঠুর জাত। শত্রু নিপাতের জন্য এমন কাজ নেই যা করতে পারে না। একবার কোনো গ্রামের লোক একজোট হয়ে তাদের গ্রামস্থ মহাজনকে খাতাপত্র দলিল দস্তাবেজ সমেত ঘরে বন্ধ করে জ্বালিয়ে মেরেছিল। আর একবার এক চাষী তার দশ বছরের ছেলেকে স্বহস্তে খুন করে, লাসটা শত্রুর বাগানে ফেলে দিয়ে, পুলিসে এত্তেল দিয়েছিল যে অমুক আমার ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার বাগান বাড়িতে বন্ধ করে রেখেছে। এইরকম অনেক ছোটো বড়ো ঘটনার কথা শুনেছিলাম দু-বছরের মধ্যে। আর এইটুকু বলব যে লিঙ্গায়ং সম্প্রদায়ের মহাজনশ্রেণীকে আমার ওরই মধ্যে ভালো লেগেছিল। তারা খয়রাত করত, গান বাজনা কুস্তি কসরতের চর্চাও করত, গুজরাতের বেনেদের মতন সারাক্ষণ কেবল পয়সার ধ্যানে মশগুল থাকত না।

বিজাপুর অঞ্চলে আমার Criminal tribesদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। Criminal tribe মানে এই যে সারা tribeটার জাতিগত পেশা চুরি-চামারি। বাহিরে হয়তো তারা অন্য কোনো রকম ধান্দার ঢং করে, কিন্তু তাদের যথার্থ পেশা বলতে চুরিই বোঝায়। এদের কোনো কোনো জাত ঘরদোর বেঁধে গ্রামে বাস করে, আবার কোনো কোনো জাত বা আমাদের বেদেদের মতন ভবঘুরে, তিনদিনের বেশী এক জায়গায় থাকে না। ছেলেমেয়েরা অতি অল্প বয়স থেকেই জাত-ব্যবসা শেখে, আর সে ব্যবসায়কে কোনোরকমে হীন বা অন্যায় মনে করে না। জাতের কেউ অকালে মরে গেলে, কি জেলখানায় বন্ধ হলে, সমস্ত জাতে মিলে তার ছেলেপিলেদের খেতে পরতে দেয়। ভবঘুরে tribeগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কায়খাড়ি জাত। এদের জাত-ব্যবসা সিঁদকাটা। ছাদের কোণে এমন সুন্দর artistic সিঁদ কাটে যে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। অথচ ছাদ ভাঙবার সময় কোন আওয়াজ হয় না, গৃহস্থের ঘুমও ভাঙে না। কায়খাড়ি মেয়েরা টুকরি সাজি ইত্যাদি ঘরে ঘরে বেচে বেড়ায়, আর কোনো বাড়িতে গহনাপত্র টাকাকড়ি কত আছে বাড়ির লোকে কোন্ ঘরে শোয়, এই সব দরকারী খবর সংগ্রহ করে ক্যাম্পে আনে। তারপর দলপতি চুরির ব্যবস্থা করেন। বড়োলোকের বাড়িতে কিংবা যেখানে ধরা পড়ার ভয় আছে সেখানে, দলপতি স্বয়ং সিঁদ কাটতে যান। ছোটো খাটো চুরি করতে ছেলেছোকরাদিকে পাঠান। প্রত্যেক দলের সঙ্গে একটি চমৎকার ছোট্টো লোহার সিঁদকাঠি বা গাঁতি থাকে। তারা নিত্য ফুল সিন্দুর দিয়ে এই কাঠির পূজা করে। কায়খাড়িরা

বলে যে, তাদের এই দেবতা বজ্র দিয়ে গড়া। ভালো নীল ইস্পাত সন্দেহ নেই। আজ কয়েক বছর থেকে বোম্বাই গভর্নমেণ্ট এই কায়খাড়ি ও অন্য criminal জাতদের চরিত্র সংশোধন করার উদ্দেশ্যে criminal settlement (বস্তী) বসিয়েছেন। সেখানে তাদিকে চাষের জমি দেওয়া হয়েছে, তাতের কাজ শেখানো হচ্ছে, ছোটো ছেলেমেয়েদিকে ইস্কুলে পড়ানো হচ্ছে। এর কত দূর স্থায়ী ফল হবে, তা আরো কয়েক বছর না গেলে বোঝা যাবে না।

বিজাপুরে আর এক criminal জাত আছে, তাদের নাম ছপ্পর-বন্দ অর্থাৎ ঘরামি। তারা কায়খাড়িদের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়ায় না, গ্রামে থাকে, নিয়মিত চাষবাসও করে। ঘরামির কাজ তো বেশ ভালো রকমই জানে। কিন্তু তাদের আসল পেশা, মেকী টাকা তৈরি করা। বর্ষার চার মাস যখন সবাই গ্রামে থাকে তখন কাজও পুরোদমে চলে, আবার মাটির নীচে পাতাল-ঘরে গোপনে অজস্র টাকাও তৈরি হয়। অগ্রহায়ণ মাস নাগাদ জোয়ারীর ফসল ঘরে তুলে দিয়ে জোয়ান মরদরা সব বেরিয়ে যায় মেকী টাকার পুঁজি সঙ্গে নিয়ে। কত দূর দেশ-দেশান্তরে যে এরা চলে যায় এই টাকা চালাবার জন্য! পুবে হংকং, পশ্চিমে জাঞ্জিবার পর্যন্ত এই ছপ্পর-বন্দ coiners সব ধরা পড়েছে। এরা যে শুধু টাকা তৈরি করে তা নয়। দুয়ানি, সিকি, আধুলি, টাকা, গিনি এমনকি সেকেলে আকবরী-মোহর পর্যন্ত এমন হুবহু গড়ে যে সাধারণ লোকের ধরা অসম্ভব। আমি একবার খুব বোকা বনেছিলাম।

এক মোকদ্দমাতে চোরাই মালের ভেতর একখানা পুরানো মোহর এসে পড়ে। কেউ সে মোহর দাবী না করায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হুকুম দেন যে সেটা বিক্রি করে দামটা সরকারে জমা হোক। সোজাসুজি নিলাম না করে তিনি আমাকে এক পত্র লিখলেন, আপনার প্রাচীন মুদ্রার উপর খুব ঝোঁক আছে জানি। তাই লিখছি যে আমার কাছারিতে একখানা আকবরী-মোহর বিক্রি আছে, দাম পঁচিশ টাকা। নেবেন কি? আমি তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়ে দিয়ে মোহরখানা আনিয়ে নিলাম। মোহর যে পুরানো তা দেখেই বোঝা গেল। একখানা পরকলা (lens) নিয়ে পরীক্ষা করতে বসলাম। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও কোনো বাদশাহের নাম বুঝতে পারলাম না। একটা শব্দ 'আল্লাহ' মাত্র পড়তে পারলাম। বন্ধু আহমদী তখন ক্যাম্পে ছিলেন। তিনি ফিরে এলে তাঁর হাতে lens ও ঐ মোহর দিয়ে

বললাম, "দেখত, কোন্ বাদশাহের মোহর।" তিনি অনেকক্ষণ উলটে পালটে দেখে হেসে উঠলেন, "ছপ্পর-বন্দ বাদশাহদের মোহর! এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো আরবী শব্দ নেই এর উপর।" একটু নিরাশ হলাম। আমার স্ত্রী মোহরটা তুলে রাখলেন, পরে গহনা গড়াবার কাজে লাগবে। মাস ছয়েক বাদে কিছু সোনার দরকার হওয়াতে সেটা বার করে এনে সোনারের হাতে দিলেন। সোনার তাকে যথারীতি ঘোরালে ফেরালে, কষ্টিপাথরে ঘষে পরখ করলে, তারপর নিয়ে চলে গেল। আমরা মনে করলাম, যাক্ মোহরটা কাজে লাগল! কিন্তু কাজে তো লাগল না। সোনার সেটাকে ভেঙে দুখানা করে এনে দিলে। ভেতরটা মোটেই সোনা নয়, কিন্তু এমন কোনো মিশ্র ধাতু যে ঝাঁ করে হাতে ওজনে ধরা পড়ে না। বাহিরে পাত, তারই উপর আরবী হরফের হিজিবিজি। সুন্দর কাজ সন্দেহ নেই, তবে কোনো বড়ো মানুষ মার্কিনীকে বেচলেই পারত। শীতকালে ছপ্পর-বন্দ গ্রামে অনেকবার গেছি। বাহির থেকে মনে হত সব সাদাসিধে মানুষ, চাষ মজুরী করে খায়। তবে একটা বিষয় নজরে পড়েছিল বটে যে, গ্রামে জোয়ান বয়সের পুরুষ দেখা যেত না, কেবল ছেলে আর বুড়ো। বুড়োগুলোর নমাজ পড়ার কি ঘটা।

৮

পশ্চিম ভারতে ছপ্পর-বন্দ ও কায়খাড়িদের মতন আরো অনেক criminal tribes আছে, যাদের জাতিগত ধর্ম চুরি করে দিন গুজরান করা। এদের সকলের সঙ্গে কিছু আমার সাক্ষাৎ জানা-শুনো হয় নেই। যাদিকে চিনি তাদেরই গল্প করছি। ফাঁস-পার্ধী বা হরিণ-শিকারী বলে এক জাত আছে। তারা বনজঙ্গলে ফাঁদ পেতে খরগোস, তিতির, বটের, এমনকি হরিণ ছানা পর্যন্ত ধরে, আর গাঁয়ে গাঁয়ে, শহরে শহরে ঘুরে সেইগুলো বেচে বেড়ায়। এদের আসল উৎপত্তি-স্থান গুজরাত, কিন্তু এখন পাকা ভবঘুরে। বেশ চটপটে চালাক মানুষ এরা। কথাবার্তা মিষ্টি, দেখতে সুপুরুষ, কায়খাড়িদের মতন কালো মুস্কো জোয়ান নয়। দিনের বেলায় গ্রামের ঘরদোর রাস্তাঘাট নজর করে দেখে যায়। রাত্রে চুরি করতে বেরোয়। তবে এরা ছিঁচকে চোর, এদের দৌড় ঘটিটা বাটিটা পর্যন্ত, দামী জিনিস বড়ো একটা ছোঁয় না। তাই ধরাও সহজে পড়ে না। আমি কখনো কখনো এদের কাছ থেকে শিকারের পাখি-

টাখি কিনতাম, কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল যখন পুলিস এক gang case এনে উপস্থিত করলে। তখন বুঝলাম যে এদের পেটে পেটে কত বুদ্ধি!

কিন্তু যত চোর ডাকাতের জাত আমি দেখেছি, তার মধ্যে সেরা হচ্ছে রাজপুতানার মীনা-বাউরীরা। এরা চুরি ডাকাতি করে বেড়ায় সারা পশ্চিম ও মধ্যভারত জুড়ে। এদের দল উত্তরে পঞ্জাব, দক্ষিণে কর্ণাট, পশ্চিমে গুজরাত ও পূর্বে নাগপুর এলাকা, সর্বত্র দেখা যায়। প্রকাশ্যে সবাই নানারকম খুচরো ধান্দা করে, কিন্তু এদের মধ্যে সত্যি একজনও সদ্‌গৃহস্থ আছে কিনা সন্দেহ। কায়খাড়ি কি ছপ্পর-বন্দদের চেয়ে এরা সংখ্যায় অনেক বেশি। ছিঁচকে চুরি, সিঁদ কাটা, দল বেঁধে ডাকাতি, সবেতেই এরা সিদ্ধহস্ত। প্রত্যেক দল কতকগুলো চুরি-চামারি করে দিন কয়েকের জন্য দেশে ফিরে যায়। সেখানে চোরাই মালের ব্যবস্থা করে, দিনকতক আরাম করে আবার সফরে বেরোয়। চোরাই মাল পাচার করতে এদের বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। আজমের ইত্যাদি বড়ো বড়ো শহরে গোটা কয়েক বাঁধা দোকান আছে। সেইখানে মাল নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়। এই দোকানদারেরা জাতে মীনা-বাউরী না হলেও কার্যতঃ তাদের সম্প্রদায়-ভুক্ত। মাল সমস্ত ধীরেসুস্থে বিক্রি করে দামটা তহবিলে জমা করে দেয়। এই সম্প্রদায়ের ভেতরের ব্যবস্থা অতি চমৎকার, কায়খাড়িদের চেয়েও পাকা। কাজ কর্ম সমস্ত একটা বাঁধা নিয়মে চলে। বিশ্বাসঘাতককে হাতে হাতে সাজা পেতে হয়। পয়সা-কড়ি সব জমা হয় সম্প্রদায়ের মাতব্বরদের হাতে। তাঁরা বুঝে সুঝে প্রত্যেক দলকে খরচা জোগান, দরকার মতো অস্ত্র শস্ত্রের বন্দোবস্ত করেন, মোকদ্দমা মামলা চালান, বিধবা অনাথদের খেতে পরতে দেন। সেকালের Mafia Carbonari-রাও এদের চেয়ে গূঢ়মন্ত্র ছিল কি না সন্দেহ। মীনা-বাউরীদের চেহারা কতকটা রাজপুত ধাঁচার। বেশ জোয়ান কিন্তু কায়খাড়িদের মতন চোয়াড় নয়। অসাধারণ বুদ্ধিমান। এদের এক gang case আমি মাস তিনেক ধরে করেছিলাম। সেই মোকদ্দমাতে বেচর সিং নামে এক আসামী ছিল। লোকটা নিজের ও অন্য কয়েকজন আসামীর তরফে যে সাক্ষীর জেরা করেছিল, তা আমার আজও মনে আছে। সেরকম জেরা সকল উকিলেও করতে পারে না। এক পুলিস সাহেবকে সওয়াল করতে করতে বললে, "একবার সাত বছর জেল খেটে এসেছি। এবার তো কালাপানি জানা কথা! তবে আমি দেখাতে চাই যে এই পুলিসওয়ালারা কি চীজ!"

শেষ পর্যন্ত কালাপানির সাজাই সে পেলে। কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র তো নয়, খুব হেসে বললে, "এ আমার সাক্ষী জেরা করার পুরস্কার না কি, হুজুর!"

এ সব তো হল পেশাদার চোর ডাকাত। চুরি-চামারি এদের স্বধর্ম। স্বধর্ম পালনে নিধনের সম্ভাবনা আছে জেনেও এরা ভয়াবহ পরধর্ম পরিগ্রহ করে না। সেজন্য এদিকে বেশি দোষ দেওয়া যায় কি? আর চুরি জিনিসটা কি সত্যই একটা মহাপাপ! যে দেশে বা যে যুগে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কোনো পদার্থ নেই, সেখানে চুরিও থাকতে পারে না। আগেকার দিনে এ দেশে বা বিলেতে চোরকে দেহান্ত সাজা দেওয়া হত। সে আইন গড়েছিলেন তাঁরা, যাঁদের চুরি করার কখনো দরকার হয় না। আজ আমাদের মতি-গতি অন্য রকমের হয়েছে। চোরকে শূলে চড়াতে আমরা আর রাজী নই। কে জানে, হয়তো এমন দিন আসছে যখন মানুষে মানুষে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া আর থাকবে না। আমাদের চোখের সামনে হাবসীদের সারা দেশটা চুরি হয়ে গেল, কেউ কিছু করতে পারলে কি! ঘটি বাটি চুরির কথা নিয়ে নাক সিটকে ফল কি!

ভারতবর্ষ নানারকম অর্ধ-সভ্য জাতে ভরা। ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে তাদের নিজেদের একটা ধারণা আছে। সাধারণত তারা ভালো মানুষ, হেসে খেলে নেচে গেয়ে শিকার করে কাটিয়ে দেয় এক রকম। কিন্তু দেশে অকাল পড়লে ক্ষিদের তাড়নে তারা পাহাড় থেকে নেমে এসে লুটপাট করে যায়। তেমন দরকার পড়লে রীতিমত ডাকাতের দলও পাকায়। এটা তারা অধর্ম মনে করে না। তবে এদের বুদ্ধিসুদ্ধি কম, সহজে ধরা পড়ে যায়। এদিকে জেলে পোরবার জন্য পুলিসকে gang case করতে হয় না। এরকম জাত আমি যাদিকে ভালো করে জানি তারা হচ্ছে সাতপুরা পাহাড়ের ভীল, পশ্চিম ঘাটের কাতকরী ও বিজাপুর অঞ্চলের বেডর। এই বেডররা আগেকার আমলে সেপাই-গিরি করত। বেডর নামটা শুনেই বুঝতে পারছেন যে এরা নির্ভীক সেপাই ছিল। এখন কালের পরিবর্তনে এরা অস্ত্রব্যাবসা ছেড়ে দিয়েছে; তবে ভয় পদার্থটার সঙ্গে এদের আজও পরিচয় হয় নেই। Meadows Taylor-এর 'তারা' বলে উপন্যাসটা পড়লে পাঠক এদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

বিজাপুর জেলায় আমার প্রথম সেরেস্তাদার ছিলেন জাতে বেডর। ইংরেজি না জানলেও ভদ্রলোক কাজকর্ম করতেন ভালোই। কিন্তু চেহারাখানা ছিল সত্যি ভয়াবহ। মিশ কালো রঙ, ভাটার মতন বড়ো বড়ো দুটি লাল চোখ,

বিশাল ছাতি, দীর্ঘ বাহু, সেরেস্তাদারের গদীতে বসে সব সময় মানাত না, বিশেষত একটু অন্ধকার হলে। ঐ আপিসে বুদন সাহেব নামে আমার এক কেরানী ছিল। বেশ চালাক চতুর, ফিটফাট কলেজে পড়া ছোকরা। কিন্তু একটা বড়ো দোষ ছিল তার। যখন তখন, 'We Muslims are a backward community, sir. The Hindus ইত্যাদি ইত্যাদি,' বলে তার স্বজাতির প্রতি আমার দরদ উদ্রেক করার চেষ্টা করত। আমার সেরেস্তাদার রাও সাহেব নিতান্ত backward বেডর জাতের লোক হলেও তাঁর অযথা বিনয় এতটুকু ছিল না। তিনি বুদনের নাকি-সুরে কান্না বরদাস্ত করতে পারতেন না। একদিন আমার সামনেই খুব বকুনি দিলেন ছোকরাকে। হঠাৎ আপিস-তাঁবুর ভেতরে ঢুকে রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ফের সাহেবকে দিক্ করছ! কেবল দিবারাত্র backward, backward! আরে আমার চেয়ে backward তো নস্! আমি কি ঘ্যান ঘ্যান করি! মানুষের নিজের ইজ্জৎ নিজের হাতে।" বুদন সাহেব সভ্য-ভব্য ভদ্রবংশীয় ছেলে, মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি সেরেস্তাদারকে বললাম, "আচ্ছা, রাও সাহেব, আপনি একটু বাহিরে অপেক্ষা করুন। আমি বুদনের ফাইলটা (দপ্তরটা) শেষ করে নিই।" আমি বিজাপুর ছাড়বার আগে এই মুসলমান ছোকরাটিকে একটা হাকিমী জোগাড় করে দিতে পেরেছিলাম। এ বিষয়ে আমার বেডর রাও সাহেব, বাধা দেওয়া দূরে থাক অনেক সাহায্য করেছিলেন। উচ্চবর্ণের হিন্দু হলে এতটা পারত কি না, সন্দেহ।

লমানী বলে এক ভবঘুরে জাতের সঙ্গে আমার বিজাপুরে পরিচয় হয়। শুধু পরিচয় কেন, এরা আমাকে একটু জব্দও করেছিল। গল্পটা মন্দ নয়। এই লমানীরা আসলে কোন্ প্রদেশের লোক তা আমি আজও জানি না। তবে কথাবার্তা কইত এক রকম জঙ্গলী হিন্দীতে। মেয়েরা পোশাক পরত, মধ্যপ্রদেশী বা রাজপুত ধরনের রঙ-বেরঙের ঘাঘরা, কাঁচুলি, ওড়না। বছর দুই তিন আগে এরা এসে আমার এলাকাতে মুদ্দেবিহাল বলে এক ছোটো শহরের বাহিরে ঘাস পাতার কুড়ে বেঁধে বাস করেছিল। এই শহর থেকে রেল ছিল ক্রোশ দশেক দূরে। স্টেশন পর্যন্ত বরাবর পাকা সড়ক। লমানীদের বসতি ছিল এই সড়কের কাছাকাছি গোটা দুই টিলার উপর। বেচারারা ভিক্ষা মেগে মজুরি করে খেত। এক-আধজন সামান্য রকম চাষবাসও করেছিল। এদের যে কোনো আয়ের আছে তা কেউ মনে করত না। আমি এই মহকুমার ভার নেবার পর কিন্তু

স্টেশনের সড়কে একটার পর একটা রাহাজানি হতে আরম্ভ হল। প্রথম গরিব গুরবো পথিকের উপর অত্যাচার, শেষ গাড়ি লুট পর্যন্ত হতে লাগল। একদিন ডাক্তার বাবুকে মেরে ধরে তাঁর সর্বস্ব লুটলে। আর একদিন শহরের একজন বড় উকিলের গাড়ি ধরে মেয়েছেলেদের অঙ্গ হতে গহনা-পাতি ছিনিয়ে নিলে। আমি কানাঘুষো শুনলাম যে লমানীরা এই কীর্তি করছে। নিজে লুকিয়ে রাত্রিবেলা সড়কে টঙ্গায় চেপে একদিন গেলাম। এক নির্জন জায়গায় কতকগুলো লোক দেখলামও। কিন্তু কাউকে ধরতে পারলাম না। তালুকার দারোগা বাবু ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রোজ দু তিন ঘণ্টা পূজা করতেন। তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে তিনি বললেন, 'প্রমাণ কিছু পাচ্ছি না, হুজুর। ধরব কাকে!' এরকম মনোবৃত্তি জজ ব্যারিস্টারের শোভা পায়, কিন্তু পুলিশ পাহারাওয়ালার চলবে কেন! লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ, কিন্তু সলজ্জাঃ গণিকাঃ নষ্টাঃ। যাই হোক, অত বড়ো একটা সড়কে ক্রমাগত রাহাজানিও তো হতে দিতে পারি না। পুলিস কর্তাদের ধরে দারোগাকে বদলী করালাম। মাধোরাও বলে যিনি নূতন দারোগা হয়ে এলেন, তাঁকে ঠিক ধর্মভীরু বলা চলে না। খুব কাজের লোক। তাঁকে সহায় করে এক শুভদিনে লমানী গ্রামের সমস্ত শক্ত-সমর্থ পুরুষদের ধরে আনালাম। সাক্ষীসাবুদ নিয়ে তাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাকার জামীন দিতে হুকুম করলাম। জামীন কোথা হতে দেবে! সব জেলে গেল। কিন্তু রাহাজানি যাদুমন্ত্রের মতো বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে লমানীরা জেলা-হাকিমের এজলাসে আপীল করলে। জেলা-হাকিম ছিলেন D. যাঁর কথা আগে আপনাদিকে বলেছি। তিনি কাগজ পত্র দেখে আমাকে এক চিঠি লিখলেন, "এ কি করেছ! Decency-র (ভব্যতার) একটা সীমা আছে তো! কোনো প্রমাণই নেই যে তোমার এই মোকদ্দমাতে!" আমিও জানতাম, সাক্ষী-সাবুদ কিরকমের উপস্থিত করেছিল মাধো দারোগা। বড়ো সাহেবকে লিখলাম, "আপনি ওদের ছেড়ে দিন। আমার কাজ হাসিল হয়েছে।"

আমার কিন্তু সত্যি এই বকুনি খেয়ে বিশেষ লজ্জা হয় নেই। এই chapter করে জামীনের হুকুম দেওয়ার ব্যাপার পরে সিন্ধের সীমান্তে যা দেখেছি, তার তুলনায় আমার লমানী-দমন অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আর শুধু কি তাই! পরে জজের আসনে বসে যে সব gang case করেছি সেই বা কি! এই জাতীয় মোকদ্দমাগুলো কি তা আমার পাঠকেরা সবাই বোধ হয় জানেন না। বুঝিয়ে

বলি। ধরুন কতকগুলো লোক গোপনে দলবদ্ধ হয়ে স্থির করলে যে তারা যেখানে সুবিধা পায় চুরি ডাকাতি করবে। সব তোড়জোড় ঠিক করে চুরি আরম্ভ করলে। একটার পর একটা চুরি হতে লাগল। অথচ এমন হুশিয়ার চোর, এমন আট-ঘাট বেঁধে তারা কাজ করছে যে পুলিস তাদের কোনো পাত্তাই পাচ্ছে না। এক বছর, দু বছর, তিন বছর পর্যন্ত এই ভাবে চলল। খবরের কাগজে লেখালেখি হতে লাগল। হয় তো কাউন্সিলে দুই একটা সওয়ালও হল। তখন সরকারের টনক নড়ল। জেলায় জেলায় কড়া হুকুম জারি হল, চোর ধরতেই হবে। অবিলম্বে সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করে এক গাদা লোককে gang বা গুপ্তদল বলে চালান করা হল। এ মোকদ্দমাগুলো সবই প্রায় এক রকমের হয়। গোটা দুই বিভীষণ বা Judas জাতীয় সাক্ষী সব ভেতরের কথা ফাঁস করে দিচ্ছে, আর গণ্ডা কয়েক ছোটো বড়ো সাক্ষী এসে হলপ পড়ে বলছে যে অমুক দিন অমুক স্থানে এই দলের লোক আমার ঘরে চুরি করেছে, বা আমাকে চড় মেরে আমার পয়সা কড়ি কেড়ে নিয়েছে। জজ সাহেব ও তাঁর জুরি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে দলের অন্ততঃ বারো আনা লোককে জেলে বা কালাপানিতে পাঠাচ্ছেন। সংসার নিরুপদ্রব হচ্ছে, যতদিন না আবার একটা দল গড়ে ওঠে। সাক্ষীসাবুদ মিথ্যা, তা আমি বলছি না। বলতেও পারি না, কারণ এইরকম প্রমাণের জোরে বহু লোককে কালাপানি পার করেছি। তবে এই gang case গুলো যে ঠিক ইংরেজী Evidence Act সম্মত তাই বা কি করে বলি! আর এক কথা। সমাজের পয়সাওয়ালা লোকদিকে যেন তেন প্রকারেণ বাঁচাতে হবে তো! নইলে কার জন্য সমাজ, কার জন্য রাষ্ট্র? পাঠক শুধু এইটুকু বিচার করুন যে আমার ছেলেবেলাকার লমানী-দমনের সঙ্গে এই gang case-এর কোনো জাতিগত পার্থক্য আছে কি? মোট কথা, এই সব ব্যাপার পুলিসের থানাতে কি ম্যাজিস্ট্রেটের খাসকামরাতে সমাধা হওয়াই ভালো। জজ জুরিকে এর ভেতর টানাটানি করা কেন! এই সম্পর্কে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে। মফস্বলে জুরি বা এসেসার যাঁরা হন, তাঁরা দেখেছি, চুরি ডাকাতির ব্যাপারে জজের চেয়েও কড়া হাকিম। একেবারে দয়ামায়া-হীন। অথচ তহবিল তছরূপ, কি দলিল জাল করা, কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এ সবের মোকদ্দমাতে তাঁদের আসামীর প্রতি অসীম দয়া। অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে চোরের gang-কে জুরির সামনে

খাড়া করলে তাদের বিশেষ উপকার করা হয় না।

একটা কথা, বোধ হয়, এত কাল হাকিমী করার পরে আমার মুখে শোভা পাবে না। কিন্তু আদালতের সূক্ষ্ম বিচারের উপর আমার বড়ো একটা আস্থা নেই। সালিশী নিষ্পত্তিতে ন্যায় বিচার হয়, সীমান্তে জিরগার বিচারেও যথেষ্ট হয়, কিন্তু জজের এজলাস সম্বন্ধে আমি জোর করে কিছু বলতে পারি না। আমি নিজে যদি কখনো ন্যায় করতে পেরে থাকি, তো সে আদালতের বাহিরে। বিজাপুরে থাকতে এইরকম একটা সংকর্ম করবার সুবিধা পেয়েছিলাম। গল্পটা শুনলে আপনাদের হয় তো আমার উপর ভক্তি চটে যাবে। তা হোক, তবু বলি। আমার এলাকাতে এক বড়ো জায়গির ছিল। জায়গিরের যথার্থ মালিক ছিলেন এক বৃদ্ধা দেশাইনী। তাঁর এক সৎছেলে ছিল, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সে ভদ্রলোক পৈত্রিক সম্পত্তির অতি সামান্য অংশই পেয়েছিলেন। মাতাপুত্রে এতটুকু বনি-বনাও ছিল না। আমি যখন এলাকার ভার নিলাম, তখন প্রায় পঁচিশ বছর নাগাদ মায়ে ছেলেতে নানা আদালতে, মায় বিলেত পর্যন্ত, মামলা-মোকদ্দমা চলেছে। কিছু দিন বাদে এক পুলিস রিপোর্ট এল আমার কাছে, অমুক দেশাইনী নালিশ করেছিলেন যে তাঁর পুত্র অমুক দেশাই তাঁর পঁচিশটা বাবলা গাছ কেটে চুরি করে নিয়ে গেছেন, কিন্তু তদন্তে জানা গেল যে বাবলা গাছের মালিকী সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে আজও কিছু নিষ্পত্তি হয় নেই, দেশাই সাহেব বলেন তিনি স্বয়ং গাছের মালিক, অতএব মামলা খারিজ করার জন্য হুজুরের হুকুম প্রার্থনা করি। আমি এদের পারিবারিক ঝগড়া-ঝাঁটির সব ইতিহাস জানতাম। মনে করলাম, একটা সুযোগ পেয়েছি, দেখি কিছু পাকা ব্যবস্থা করতে পারি কি না। হুকুম দিলাম যে চুরির মোকদ্দমা আমার এজলাসে চলবে। চালালাম মোকদ্দমা একটি মাস ধরে। দুই পক্ষে দুজন বড়ো উকিল, দুজন ছোটো উকিল। বড়োরা নিচ্ছিলেন রোজ একশো টাকা, ছোটোরা রোজ তিরিশ টাকা। উকিলেরা সকলে মিলে আরম্ভেই দরখাস্ত করেছিলেন যে মোকদ্দমা সদরে চালালে তাঁদের বড়ো সুবিধা হয়। সে দরখাস্ত আমি পাঁচ রকম ভেবে মঞ্জুর করলাম না। ক্যাম্পেই মোকদ্দমা শুরু করে দিলাম। যথারীতি পাঁচ ছয় দিন অন্তর ক্যাম্প বদল হতে লাগল। উকিল ও সাক্ষীর দল সঙ্গে সঙ্গে চললেন। একদিন ধুম করে সদলবলে সরেজমিন গিয়ে কাটা বাবলা গাছের খুঁটোগুলো দেখে আসা গেল। জায়গাটা কৃষ্ণানদীর

মাঝে এক দ্বীপে। ফুট তিন চার জল ভেঙে যেতে হল। কারোই তেমন উৎসাহ ছিল না, তবে আমি নাছোড়বান্দা। এইরকম করে দিন পঁচিশেক শুনানী হওয়ার পর আমি দেশাইনী সাহেবার কেল্লার কাছে তাঁবু ফেলে তাঁকে তলব করলাম। তাঁর উকিল দরখাস্ত করলেন— ফরিয়াদী পদস্থ ব্যক্তি, অসূর্যম্পশ্যা মহিলা, কমিশনে তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হোক। তাতে তো আমার কাজ হাসিল হয় না! ভদ্রমহিলাকে সশরীরে উপস্থিত হতে বলে দিলাম। পর দিন তিনি এলে পর তাঁকে আমার বৈঠকখানা তাঁবুতে পর্দার আড়ালে বসিযে কথাবার্তা কইলাম। জোর করে আদালতে হাজির করায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আমি খুব বিনয় করে বললাম, "আমার তো গত্যন্তর নেই, বাই সাহেব। আপনার ছেলে পদগৌরবে আপনারই সমকক্ষ। তাঁকে যদি চুরির মোকদ্দমাতে আসামী করা হল তো তাঁর মাকেই সাক্ষী বলে না ডাকা হবে কেন!" আরও দুচার মিনিট কথা কওয়ার পর অতি সন্তর্পণে বললাম, "তবে যদি আপনি মোকদ্দমা আর না চালাতে চান, তো সাক্ষ্য দেওয়ায় দরকার হবে না। কিন্তু এই একটা ব্যাপার নয়, আপনাদের দুজনের মধ্যে যত মোকদ্দমা চলছে সব মিটমাট করে ফেলতে হবে।" তিনি নানা রকম ওজর আপত্তি করতে লাগলেন— আমার ছেলে অত্যন্ত দুষ্ট লোক— আমার হক্ আমি ছাড়ব কেন— তা হলে আমার মান ইজ্জৎ থাকবে না, ইত্যাদি। আমি তাঁকে একটা দিন ভেবে চিন্তে দেখতে বললাম। পরদিন আবার তিনি পাল্কি চেপে চোপদার বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে এলেন। আবার গিয়ে বৈঠকখানা তাঁবুতে আমার স্ত্রীর কাছে বসলেন। আমি অনুমতি নিয়ে আসামী দেশাই সাহেবকে তাঁর সামনে হাজির করলাম। দেশাইকে অনেক শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিলাম। তিনি সোজা গিয়ে তাঁর মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "মা, আমাকে ক্ষমা কর।" মায়ের মন গলতেও দেরি হল না। এর পরে উকিল সাহেবদের সাহায্যে দুই পক্ষের মধ্যে একটা পাকা রকম মিটমাট দিন দুয়েকের মধ্যেই করে ফেলা গেল। উকিলরা এই বাড়তি দুদিনের জন্য কিছু পয়সা নিলেন না। সকলেই খুশি হল। বৃদ্ধা দেশাইনী কিন্তু একটু চিপটেন কাটতে ছাড়লেন না, "তোমার গোড়া থেকেই এই দুষ্টবুদ্ধি ছিল, না, সাহেব?" আমি তখন কেল্লা মেরে দিয়েছি, জোড়হাত করে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" সেখান থেকে ক্যাম্প ওঠবার আগে একদিন দেশাইদের কেল্লাতে খুব জলসা,

খাওন-দাওন হল।

এই দেশাইদের গল্প করতে করতে আর এক দেশাই-এর কাহিনী মনে হচ্ছে। দক্ষিণ দেশে এসে অবধি অনেক চেষ্টা করছিলাম, ভালো মরাঠী লাবণী (Ballad) শোনবার। কিন্তু বিজাপুরে মরাঠা খুব কম বলে লাবণী গানও সেরকম প্রচলিত নয়। একবার এক ক্যাম্পে সাতারা জেলার একজন গায়ক এসেছিলেন। তিনি দুটো একটা পুরানো পোবাড়া (গাথা) গেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "একটা এই দেশের পোবাড়া শুনবেন, রাও সাহেব ?" আমি খুব আগ্রহ দেখাতে সে নুরগুন্দ-এর দেশাইদের এক গাথা গাইলে। যখন ইংরেজ সরকারের নূতন অস্ত্র আইন জারী হল তখন এই দেশাইও হুকুম পেলেন— অমুক দিনে একজন সরকারী অফিসার আপনার কেল্লায় যাবেন, আপনার সমস্ত হাতিয়ার তাঁর কাছে হাজির করবেন। বৃদ্ধ দেশাই হুকুম পেয়ে অনেক কাঁদলেন। কিন্তু উপায় তো কিছু নেই ! হুকুম এসেছে, অস্ত্র ছেড়ে দিতেই হবে। ছেলেকে ডেকে সেইরকম হুকুম দিলেন। ছেলে বাপের মুখের পানে সোজা তাকিয়ে বললে, "বাবা ! যদি আমরা আমাদের হাতিয়ার না ছেড়ে দিই !" বাবা মাথা হেঁট করে উত্তর দিলেন, "না ছেড়ে দিই, তো জেলে যেতে হবে। বুড়ো বয়সে তা পারব না। ওসব পাগলামি বুদ্ধি ছাড়।" ছেলে গুম খেয়ে গেল। কোনো কথাই বললে না। কিন্তু তার পর কয়েক দিন ধরে নিজের বিশ্বস্ত বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কি পরামর্শ আঁটতে লাগল। নির্দিষ্ট দিনে ভোরের বেলায় হঠাৎ বাপকে ধরে এক ঘরে বন্ধ করে পাহারা বসিয়ে দিলে। সেপাই বরকন্দাজদের হুকুম দিলে, "ফটক বন্ধ করে দাও। কেউ এলে আমাকে খবর দিও।" যখন সরকারের প্রতিনিধি দ্বারে এসে উপস্থিত হল, সে কেল্লার দেওয়ালের মাথার উপর থেকে হেঁকে বললে, "সাহেব আপনি চলে যান। আমরা হাতিয়ার দেব না।" সাহেব উত্তর দিলেন, "তোমাকে আমি চিনি না। দেশাই সাহেবকে খবর দাও।" তরুণ দেশাই বললে, "আমিই এখন দেশাই। আমার বাবাকে আমি কয়েদ করে রেখেছি।" তখন কর্মচারী বললেন, "তোমাকে আমি দেশাই বলে মানি না। তুমি ডাকু। আমি হাতিয়ার নিতে এসেছি, জোর করে নিয়ে যাব।" "বেশ ! এসো।" বলে দেশাই নেমে গেলেন। ফটক-গোড়ায় দুই দলে একটা ছোটোখাটো যুদ্ধ হল। সরকারী লোক সংখ্যায় খুব কম ছিল, হেরে গেল। সেনানী মারা গেলেন। দুচার দিনে জঙ্গী পলটন এসে পৌঁছল। পাগলা কেল্লা

রাখতে পারলে না, কিন্তু হাতিয়ার হাতেই মল, যোদ্ধার শেষ অপমান তাকে সহ্য করতে হল না। পোবাড়ার গল্পটা ছিল এই। খুব দরদ দিয়ে লোকটা গেয়েছিল। একদিন এই সব যোদ্ধা জাতের বড়ো আঁতে ঘা দিয়েছিল অস্ত্র আইন। তারা সেকেলে লোক, license পরোয়ানার কথা বুঝত না। ভাবলে, আর কখন অস্ত্র ধরতে পাব না, মান ইজ্জৎ সব গেল! উত্তর ভারতে সেই সময় একটা গান লোকে গাইত তার মাত্র দুই ছত্র মনে আছে—

শাহান শাহকা হুকুম অব তলোয়ার ন বাঁধো,
সব চুড়ীয়াঁ পহেনো আওর আউরৎ বনো, রে, ভাই,
চুড়ীয়াঁ পহেনো আওর আউরৎ বনো।

Mediaeval mentality! আমরা তলোয়ার না বেঁধেও কত সুখে আছি।

৯

আগে তলোয়ার বাঁধা সম্বন্ধে যা বলেছি, সেটা বস্তুত বাজে কথা। মানুষের মনোবৃত্তি সেই আদিম কাল থেকে বিশেষ কিছু বদলায় নেই। আবেষ্টন বদলেছে, তাই মানুষ এখন মুখোস পরে বেড়াতে শিখেছে। ক্রিকেট, ফুটবল খেলাতে যে আনন্দ, যে মজা, বন্দুক তলোয়ার চালানোতে তার চেয়ে বরং বেশি আনন্দ পাওয়া যায়! এ ব্যাপারের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। অপব্যবহার তো সব জিনিসেরই আছে!

আহমদাবাদ ছাড়বার সময় আমি একটি সুন্দর হালকা দেখে রাইফেল বন্দুক কিনেছিলাম। ভালোই করেছিলাম, কেননা বিজাপুরে এসে দেখি, যেখানে সেখানে অজস্র হরিণ। মনের আনন্দে দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর ক্ষেতের শস্য ধ্বংস করছে। সকাল বেলায় যখন আমি আমার নিত্যকর্মে বেরোতাম, এই বন্দুকটি সর্বদা সঙ্গে থাকত। সময় পেলেই হরিণের পেছনে ধাওয়া করতাম, নসীবে থাকলে এক আধটা মেরে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরতাম। এতে চাষীরাও খুশি হত শত্রুনাশ হল বলে, আমার লোকজনও খুশি হত পেট ভরে মৃগমাংস খাবে বলে। কদাচ কখন হরিণ মেরে গ্রামের লোককেও দিয়ে আসতাম। গরিব দুঃখী আনন্দ করে খেত। দুবছর ক্রমাগত এই কীর্তি করে হাতটা বেশ পাকল। ছেলে-বেলায় রাইফেল ছুড়তে শিখি নেই বলে মনে একটা আপসোস ছিল। কিন্তু শুধু কি রাইফেল ছুড়তে শিখলাম। আরও কত রকম অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হল!

বিজাপুরের হরিণ অধিকাংশই কালিয়র বা কৃষ্ণসার। নরগুলোর রঙ কালো, কিন্তু মাদীর রঙ পাটকিলে। হরিণীর শিঙ নেই, কিন্তু হরিণের মাথায় লম্বা লম্বা ইস্ক্রুপ প্যাঁচের মতন এক জোড়া শিঙ। দূর থেকে দেখায় যেন রাজার মাথায় শির-পেঁচ। চলেও তেমনি, মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে, গজেন্দ্রগমনে। প্রত্যেক পালে এইরকম এক একটি মহারাজ থাকে। একটি মাত্র, বাকি সব মাদী। মাদীগুলো রাজার বাঁদী। তাঁকে আদর যত্নও করে, পাহারাও দেয়। রাজা যখন শস্যক্ষেতে চরে বেড়ান, কি সবুজ ঘাসের উপর গা ঢেলে দিয়ে বিশ্রাম করেন, তখন তিনি নির্বিকার, বে-পরোয়া, কোনো দৃকপাত নেই। কিন্তু তাঁর পার্শ্বচরীরা সদাই সজাগ। কোথায় একটু খুট করে আওয়াজ হল, কোথায় হাওয়ার সঙ্গে একটু বারুদের গন্ধ উড়ে এল, কি অমনি চট করে প্রভুকে সাবধান করে দিয়ে এক নিশ্বাসে ছুট! শিকারীর সৌভাগ্য যে সামাল করে দেওয়ার পরেও রাজা মহাশয় একবার ঘাড় বেঁকিয়ে নিজে দেখে নেন যে সত্যি ভয়ের কারণ আছে কি না। সেই সময়টুকুর মধ্যে বেশ তাক করে গুলি চালান যায়।

বাচ্চা হরিণ বাপের দলে থাকতে পায়, যতদিন না তার রঙ কালো হয়, শিঙ লম্বা হয়। কিন্তু বয়স প্রাপ্ত হলে তাকে দল ছেড়ে যেতেই হবে, কেন না হরিণ-রাজ্যে dyarchy-র ব্যবস্থা নেই। তবে নির্বাসন ব্যাপারটা সব সময়ে সহজে সমাধা হয় না। কখনো কখনো বাপ-বেটায় ভীষণ সংগ্রাম হয় সিংহাসনের জন্য। একবার এইরকম একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সকাল বেলায় এক পাহাড়ে রাস্তায় ঘোড়ায় চেপে চলেছি। কোলে নিত্য সহচর রাইফেলটি। সামনে দৌড়চ্ছে একজন ভুঁইয়া আমাকে পথ দেখিয়ে। এমন সময় দূরে উপর পানে দেখতে পেলাম এক মস্ত দল doe (মাদী হরিণ) চরছে। নরটা নজরে পড়ল না। আমার হাতে কাজ-কর্ম সেদিন কম ছিল। টপ করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে, বন্দুক হাতে ছুটলাম সেই মৃগযূথের সন্ধানে। ঘোড়াটাকে সেইখানেই রেখে গেলাম ভুঁইয়ার হেপাজতে। কিন্তু হরিণশিকারে তো অনেক ঘুরে ফিরে লুকিয়ে চুরিয়ে এগোতে হয়। খানিকটা পথ গিয়ে এক শুকনো ঝোরা পেলাম। সেইটা ধরে গুড়ি মেরে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে একখানা বড়ো পাথরের চাঙড়ার পেছনে লুকিয়ে চারি দিকে নজর করতে লাগলাম। দেখি, শখানেক কদম দূরে সেই doe-গুলো, প্রায় কুড়িটা হবে, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝখানে যেন সার্কাসের আসর। সেই আসরে দুই

কালিয়রের যুদ্ধ হচ্ছে। যখন প্রথম নজর পড়ল তখন মাথা নিচু করে শিঙে শিঙে আটকে দুজনে দুজনাকে প্রাণপণে ঠেলছে, পিছু হটাতে চেষ্টা করছে। একবার এটা দু পা হটছে, আবার ওটা দু পা হটছে। এই ভাবে চলেছে। একটার রঙ মিশ কালো, প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি লম্বা শিঙ। অন্যটা তার চেয়ে কম বয়সের, শিঙ ছোটো, রঙ ফিকে। দুজনার গাল বেয়ে রক্ত পড়ছে। হঠাৎ শিঙ ছাড়িয়ে নিয়ে দুজনেই পিছু হটে গেল। একটুক্ষণ ঘুরে ঘুরে পরস্পরকে পাশ থেকে বুকে পেটে ঢু মারতে চেষ্টা করলে কিন্তু কেউই সুবিধা করতে পারলে না। তখন আবার দুজনে শিঙে শিঙ লাগিয়ে কুস্তি করতে লেগে গেল। মাদীগুলো চারি দিকে নীরবে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখছে। আমি বন্দুকে টোটা ভরেছি, কিন্তু মারতে হাত উঠছে না। মুগ্ধ হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখতে লাগলাম। প্রায় পনের মিনিট ধস্তাধস্তির পর বুড়ো কালিয়রটা হার মানলে। শিঙ ছাড়িয়ে নিয়ে একটু তফাতে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়াল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে, তার পর ধীরে ধীরে আপন মনে একদিকে বেরিয়ে চলে গেল। মাদীগুলো তার দিকে ফিরেও চাইলে না। নূতন রাজার কাছে ঘেসে গিয়ে সোহাগ করে তার গা চাটতে আরম্ভ করলে। আমার মনে বড়ো আনন্দ হল। পশুর রাজ্যে এরকম একটা নাটক, tragedy বা comedy, দেখার সৌভাগ্য তো বড়ো একটা হয় না! টোটা খুলে নিয়ে খালি বন্দুক কাঁধে ঘোড়ার কাছে ফিরে গেলাম।

একদিন কিন্তু আমি নিজেই এক ভীষণ tragedy-র হাত হতে বেঁচে গেছলাম। গল্পটা শুনুন। বৈশাখ মাস, বেলা প্রায় বারোটা, প্রখর রোদ। চারিদিকের পাথরমাটি ভীষণ তেতে উঠেছে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। মাটির উপরকার রোদটা যেন নাচছে। আমি সারা সকালবেলা খেটেখুটে শ্রান্ত হয়ে টঙ্গা হাঁকিয়ে ক্যাম্পে ফিরছি। হঠাৎ বাঁ পাশে প্রায় একশো দেড়শো কদম দূরে দেখি এক জওয়ারী ক্ষেতের কিনারায় দাঁড়িয়ে এক কৃষ্ণসার মনের সুখে জওয়ারী ধ্বংস করছে। কাছাকাছি হরিণী একটাও দেখলাম না। এমন সুবিধা কি ছাড়া যায়! তাড়াতাড়ি সহিসের হাতে রাশ ফেলে দিয়ে, নেমে পড়লাম বন্দুক নিয়ে। চুপি চুপি সহিসটাকে বললাম "তুই গাড়ি হাঁকিয়ে খানিকদূর এগিয়ে যা। তা হলে হরিণের নজর তোর দিকে থাকবে।" আমি রাস্তায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাটির উপর দুই কনুই রেখে খুব যত্ন করে নিশানা করলাম হরিণের ছাতি বরাবর যেখানটায় পিঠের কালো রঙ শেষ হয়ে পেটের সাদা রঙ আরম্ভ হয়েছে। সবে

একশো কদম দূর, মাটির উপর কনুই, আমার হাত পাথরের মতো অটল স্থির, এ হরিণের আর রক্ষা নেই! এই না ভেবে যেই বন্দুকের ঘোড়া টিপতে যাচ্ছি কি আমার কৃষ্ণসার হঠাৎ পেছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠল। নগ্ন কালো দেহ, পরনে সাদা ধুতি, হাতে কাস্তে। আমার বুক দুড় দুড় করে উঠল। কি ভয়ানক! বন্দুক ফেলে দিয়ে দু হাতে চোখ ঢেকে মিনিট-ভর শুয়ে রইলাম। একটু সুস্থ মনে হতেই দাঁড়িয়ে উঠে লোকটাকে কাছে ডাকলাম। চেঁচিয়ে তাকে ধমকালাম, "হতভাগা বদমায়েশ, এই রোদে কাস্তে হাতে ওখানে কি করছিলি?"

লোকটা হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বোধ হয় ভাবলে, "হাকিমটা পাগল হয়েছে না কি! রাস্তার উপরে বন্দুক নিয়ে শুয়ে করছিল কি?"

আমি তখন রীতিমত বোকা বনে গেছি। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ঝনাৎ করে লোকটার সামনে ফেলে দিয়ে টঙ্গার দিকে পালালাম। গাড়ির কাছে যেতেই সহিসটা আবার মেজাজ বিগড়ে দিলে। উল্লুকের মতন হেসে বললে, "সাহেব! ও হরিণটা তো হরিণ ছিল না, মানুষ!"

"চুপ রহো উল্লুক!" বলে আমি টঙ্গায় চড়লাম। রাশ হাতে নিয়ে ঘোড়া দুটোকে এমন চাবুক কষলাম যে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। এই ঘটনার পরে প্রায় একটি মাস বন্দুক ছুঁই নেই।

আমি তো নসীবের জোরে এক ভীষণ অপকীর্তির হাত থেকে রক্ষা পেলাম! কিন্তু এই বিজাপুরেরই আমার পূর্ববর্তী এক হাকিম এইরকম একটা ব্যাপারে বড়ো নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। ভদ্রলোকের বন্দুকের নিশানা যে অব্যর্থ ছিল, এ কথা তাঁর অতি বড়ো দুশমনও কোনো দিন বলতে পারত না। হয়তো তাঁর কখনো শিকারে না বেরোনই উচিত ছিল। কিন্তু বড়ো সাহেব, রাজার জাত, বন্দুক না ধরলেও নয়। ভবিতব্য। একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে একটা বিষম বিভ্রাট ঘটিয়ে এলেন। এরকম ক্ষেত্রে কিছু মোটা রকম পয়সা খরচ করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু কর্তাটি আবার পয়সা খরচ করা পছন্দ করতেন না। কাজেই চোখ রাঙিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করবার উদ্যোগ করলেন। এতে তো স্থায়ী ফল হয় না! হঠাৎ একদিন পুণার 'কেশরী' কাগজে সাহেবের দুষ্কর্মের কথা সব জাহির হয়ে গেল। তার ফলে তাঁকে বড়ো সাহেবদের কাছে অনেক রকম কৈফিয়ৎ দিতে হল, অল্পবিস্তর ধমকানিও খেতে হল। শিকারের অনেকগুলো নিয়ম কানুন আছে—

যাকে বলে unwritten laws। সেগুলো লোকে পালন করে কি না, দেখবার ভার থাকে জেলা হাকিমের উপর। সাধারণত জেলা হাকিমেরা এ বিষয়ে খুব কড়া নজরও রাখেন। কিন্তু যেখানে হাকিম স্বয়ং দোষী, ও সেই দোষ ঢাকবার জন্য নানা কারোয়াহি করেন, সেখানে আমলা-মহলের কারো তাঁর উপর দরদ থাকে না। এঁর তাই বড়ো বদনাম হয়েছিল। আমি বিজাপুর পৌঁছেই এ গল্প ক্লাবে শুনেছিলাম আহমদী ও অন্য সাহেবের কাছে। তাঁরা আমাকে সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হয়তো গল্পটা আমাকে বলেছিলেন।

এই সময়ে বিজাপুরে K. বলে এক তরুণ উকিল ছিলেন। লোকের বিশ্বাস ছিল যে তিনিই 'কেশরী'র খাস সংবাদ-দাতা। উপরি উক্ত হাকিম মহাশয় এই K.-র উপর নানারকম জুলুম করার চেষ্টা করেন, রাগের মাথায়। কিন্তু কমিশনার বা সরকারের সহানুভূতির অভাবে কিছু লোকসান করতে পারেন নেই। আমার সঙ্গে K.-র খুব ভালো করেই আলাপ হয়েছিল। নিজে চেষ্টা করে আলাপ করেছিলাম। ভদ্রলোককে যথার্থ দেশপ্রেমিক বলে আমার মনে হয়েছিল। বিজাপুর আহমদাবাদের মতো জায়গা ছিল না, সেখানকার অনেক বড়ো বড়ো লোকই কংগ্রেসপন্থী ছিলেন। তবে তাঁদের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে আমার কিছু মনের মিল ছিল না। তাঁরা ছিলেন 'আবেদন আর নিবেদনের থালা, বহে বহে নতশির'। K. ছিলেন অন্য প্রকারের লোক। হাকিম যখন তাঁকে রাজদ্রোহ অপরাধে জড়াতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি হাকিমকে স্পষ্টই বলেছিলেন, "আপনি তো রাজা নন যে আপনার কাজের প্রতিবাদ করা নিষিদ্ধ বা আইন-বিরুদ্ধ মনে করব! আর, মৌখিক রাজদ্রোহে আমার কোনো আস্থা নেই, এটা স্থির জানবেন।" K.-র সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেশ সম্বন্ধে কথাবার্তা হত। তাঁর রাষ্ট্রনীতি দেখলাম বেশ পরিষ্কার খোলাখুলি রকমের, তাতে কোনো ঘোর পেঁচ ছিল না। ভদ্রলোক জাতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁর স্বপনের রাষ্ট্রে বিন্দুমাত্র জাত বা সম্প্রদায় -ভেদ ছিল না। এরকমের মনোভাব দাক্ষিণাত্যে আজও বিরল। K. বারবার বলতেন যে যথার্থ দেশ-সেবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় তিনি আছেন। পরে ১৯০৬-৭ সালের আন্দোলনে, শুনলাম, ইনি আপন জেলায় স্বদেশী প্রচারের সমস্ত ভার মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ নেতারা এঁর একনিষ্ঠ কাজ দেখে যথার্থ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে ভদ্রলোককে জেলে-টেলে যেতে হয়েছিল কি না, মনে নেই।

হ— বলে আর একজন দেশপ্রেমিকের সঙ্গে বিজাপুরে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর কর্মের ধারা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের। বস্তুত তাঁকে কর্মী বলাই ভুল। তিনি ছিলেন পেশাদার বাগ্মী, বাক্যে ছিল তাঁর অসীম বিশ্বাস। গ্রামে গ্রামে ভদ্রলোক বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন, নানা রকম আবোল-তাবোল বকতেন, যত বা গালাগালি দিতেন সরকারকে, ততই, দিতেন কংগ্রেস-নেতাদিকে। পুলিস রিপোর্ট থেকে প্রথম তাঁর অস্তিত্বের কথা জানতে পারলাম। একটু আশা হল। তরুণ কর্মী, লেখাপড়া জানা মানুষ, কষ্ট সহ্য করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হয়তো সত্যি কাজের লোক! কিন্তু অল্পদিন খবরাখবর নিয়েই বুঝতে পারলাম যে বানর বিশেষ। শেষ একটা সামান্য বিষয়ে আমার সঙ্গে সোজাসুজি বিরোধ বাধল। সে বছর অনাবৃষ্টির দরুন বৈশাখ মাস পড়তে না পড়তেই নানা জায়গার ইঁদারা শুকিয়ে যাবার খবর আসতে লাগল। আমার এলাকার এক শহরে অত্যন্ত জলকষ্ট হল। কলেকটার সাহেবের কাছে কিছু টাকা চাইলাম ইঁদারাগুলোর তলা বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেবার জন্য। সাহেব লিখলেন— আপাতত হাতে টাকা নেই, হপ্তা দুই বাদে হয়তো দিতে পারব। আমি চাঁদা তুলে টাকা সংগ্রহ করলাম। অবশ্য নিজেকেও কিছু দিতে হল। সুড়ঙ্গের কাজ আরম্ভ হল। ইতিমধ্যে বন্ধুবর হ— সেই শহরে এসে পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াতে লাগলেন, জুলুম করে টাকা আদায় হচ্ছে, তোমরা চাঁদা দিয়ো না, ইত্যাদি। রাগ হল। লোকটিকে ক্যাম্পে ধরে আনালাম। তিনি মাতৃভূমি সম্বন্ধে অনেক লম্বা চওড়া কথা কইলেন— আমাকে দেশদ্রোহী সরকারী লোক বলতেও ছাড়লেন না। আমি তাঁকে জানালাম যে আমার কাছে তাঁর নামে যে সমস্ত রিপোর্ট দাখিল হয়েছে তার উপর তাঁকে সহজেই চালান করা চলে— তবে তিনি যদি আমার এলাকা থেকে এক্ষণই সরে পড়েন তো আমি কিছু বলব না। ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল একটু ঘেবড়েছেন। আমি খুব নরম হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি যদি সত্যি দেশ-সেবক তবে এ সব সাবজনিক কাজে বাখড়া দিতে আসেন কি করে?" আমাকে নরম দেখে তিনি আবার বক্তৃতা জুড়ে দিলেন— সরকার আমাদের কাছ থেকে তো খাজনা নিচ্ছেন, আবার আমরা চাঁদা দেব কেন ইত্যাদি। আমি বললাম, "দেখুন মশায়, আমি পুণায় খবর নিয়েছি। লোকমান্য তিলক আপনাকে চেনেনও না। আমার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে। আপনি যদি কথা না শোনেন, আপনাকে জেলেও

পুরব, কংগ্রেস থেকেও দূর করাব। আমাকে অসহায় ছোকরা ইংরেজ সিবিলিয়ান পান নেই !" শেষ পর্যন্ত লোকটা একেবারে ভেঙে পড়ল, মাপ-টাপ চেয়ে সেই দিনই সরে পড়ল, একেবারে জেলা ছেড়ে পালাল। আশা করি এই জাতীয় দেশসেবক আর এদেশে নেই।

আমার মহকুমাতে দত্তাত্রেয় বলে একজন তরুণ মুনসেফ ছিলেন, তাঁর মতন লোক আমি আর কখনো দেখি নেই। সারা হপ্তা আদালতের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে শনিবার দিন ভদ্রলোক এক তাঁবু নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, দুদিন নিকটের কোনো গ্রামে চাষীদের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার দিন সদরে ফিরতেন। সদরে ইস্কুলের ছেলেদিকে নিয়ে প্রতি সপ্তাহে একবার করে বসতেন, গীতা পাঠ করতেন, পৌরাণিক ঐতিহাসিক গল্প বলতেন, নানা রকম সদুপদেশ দিতেন। ইঁদারা মেরামতের জন্য টাকা সংগ্রহে ও অন্য অনেক সার্বজনিক কাজে ইনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। দেশভক্ত হ.কে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। হ.ও সর্বত্র এঁর নিন্দা করে বেড়াত। কিন্তু দুজনের তুলনাই হয় না।

বিজাপুরের আর একটা মজার গল্প আপনাদিকে বলা হয় নেই। ব্যাপারটা ঘটেছিল গত মহাযুদ্ধের প্রায় বারো-চৌদ্দ বছর আগে। S. বলে একজন জার্মান একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হল বিজাপুরে। কর্তাদের জানালে যে সে ফোটো-ব্যবসায়ী, পুরানো আদিলশাহী ইমারতগুলোর ছবি তুলতে এসেছে। হুকুম নিয়ে ডাক বাঙলাতে ডেরা করলে। বিজাপুর শহরে ছবি তুললে না, তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগ সময় বাহিরে বাহিরে থাকত। নিজাম রাজ্যেও খুব যাতায়াত ছিল। হঠাৎ একদিন লোকটা অন্তর্ধান হয়ে গেল। একদিন চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরল না। ডাক বাঙলার ভাড়া বাকি রয়েছে। মাসখানেক অপেক্ষা করে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার ঘরের তালা ভাঙলেন। ঘরে একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক ছিল সেটা ভেঙে চুরে খুললেন। খালি সিন্দুক, কিছুই নেই। অনেক দিন পর্যন্ত পুলিস এই S.-এর সন্ধান পায় নেই আমি জানি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে লোকটা জার্মান গুপ্তচর। কিন্তু মহাযুদ্ধের এত বছর আগেও কি জার্মানী এদেশে চর পাঠাত ! কে জানে !

১০

তিন মাস দেশে কাটিয়ে মাঝ-শ্রাবণে কর্মস্থানে ফিরলাম। এবারে কোকন প্রদেশ, কুলাবা জেলা। একেবারে নূতন আবহাওয়া। গুজরাত ছিল

শস্যশ্যামল সমতট, সাহেবদের ভাষায়— The garden of India, কর্ণাটক ছিল কঠিন নীরস মালভূমি। আর আমার এই নূতন জেলা অর্ধেক সহ্যাদ্রির পর্বতমালা আর অর্ধেক আরব সমুদ্রের বেলাভূমি। পাহাড়গুলি সুন্দর সবুজ, কোথাও কোথাও গহন বনে ঢাকা। বেলাভূমি যেন এক দীর্ঘ বিস্তৃত নারিকেল বাগান। সমুদ্র থেকে ছোটো বড়ো কত খাড়ি ডাঙার ভিতর ঢুকে দেশ আরো দুর্গম করে তুলেছে। খাড়ি পার না হয়ে, মাঠ না ভেঙে, কোনো দিকে দশকোশ পথও যাওয়া যায় না। কৃষাণ-কুল দরিদ্র, পীড়িত, সারা বছর চাষবাস করে আধপেটা বই খেতে পায় না। এদেশে পয়সা কড়ি যা একটু আছে তা জেলেদের আর আপরীদের। জেলার দক্ষিণ ভাগে অনেক ব্রাহ্মণের বাস। কিন্তু তারাও গরিব, ধার করে মামলা মোকদ্দমা করাই তাদের প্রধান আনন্দ। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে পাড়াগেঁয়ে লোক যারা আয়কর (income tax) দিত, তারা অনেকেই জেলে। এই জেলেরা বোম্বাই শহরে ও শহরতলীতে মাছ বেচে বেশ দু পয়সা রোজগার করে। এরা সব জাতে কোলী। এদের সাজ, পরণে কৌপীন বা গামছা, গায়ে কম্বলের চোবন্দি, মাথায় লাল টুকটুকে বনাতের দীর্ঘ টুপী। মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে সমানে মেহনত করে। মেয়ে-পুরুষ সকলেরই গড়ন চমৎকার, চলন ভারি সুন্দর। আপনারা অনেকেই বোম্বাই শহরে সমুদ্র কিনারে এদের দেখে থাকবেন। একবার দেখলে ভোলা শক্ত। এই কোলীরা খুব আমুদে ও কষ্টসহিষ্ণু লোক, কিন্তু কিছু আয়েব এদের আছে যে জন্য এরা কখনো খোলা দরিয়ায় মাল্লাগিরী করতে যায় না। সুরতের মাঝিরা কি রত্নাগিরির দালদীরা জাতে জেলে হলেও দলে দলে জাহাজে চাকরি করতে যায়। কিন্তু কোলীরা কখনো জাত-ব্যবসা ছাড়ে না। পর্তুগীজ আমলে এদের অনেকে খৃষ্টান হয়েছিল। আজকের দিনে তাদের বংশধরেরা কেউ কেউ ভারি মজা করে। মন্দিরেও যায়, গির্জাতেও যায়, বামুনকেও মানে, পাদ্রীকেও মানে। কোলীদের একজন রাজা বা সর্দার এখনো আছেন। ভদ্রলোকের রাজ্য নেই, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে তাঁর অগাধ ক্ষমতা। কুলাবা জেলার সমস্ত কোলীরাই তাঁকে রাজা বলে খাতির করে ও তাঁর ফতোয়া মাথা পেতে নেয়। আমি এঁর সাহায্যে অনেক ছোটো-খাটো দেওয়ানী ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি করেছিলাম। এই জেলে-জাতের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হওয়ার কারণ বলব। এদের প্রধান উৎসব হচ্ছে নারিকেল পূর্ণিমা। বর্ষা-শেষে

সেই দিনে এরা মহা ধুম করে সমুদ্রদেবকে নারিকেল দিয়ে পূজা করে। দেবতাকে পূজায় তুষ্ট করে পরদিন হতে বড়ো বড়ো ডিঙা সব বারদরিয়ায় নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। কেননা বর্ষার কয়েক সপ্তাহ তো এই বড়ো নৌকাগুলো বেরোয় না। সব ডাঙার উপর তোলা থাকে, ছপ্পর ঢাকা। আমরা আমলাবর্গ সবাই এই উৎসবের দিন কোলীদের মিছিলের সঙ্গে গিয়ে সমুদ্রে নারিকেল ফেলতাম। এটা প্রায় official function বলে গণ্য হত।

আপরীদের জাত-ব্যাবসা নুন তৈরি করা। আপর কথাটার মানে saltpan। যারা অবস্থাপন্ন লোক, তাদের নিজেদের নুনের কারখানা আছে। গরিব আপরীরা মহাজনদের কারখানাতে চাকরি করে। তবে আজকাল এদের অনেকে চাষবাসও ধরেছে, কেননা দেশি নুনের ব্যাবসা লিভারপুলের তাড়ায় অনেক কমে গেছে। এ আমি আগের কথা বলছি। এখন গান্ধীজির কল্যাণে আবার কতটা তফাৎ হয়েছে, তা আমি জানি না। এদের সম্বন্ধে একটা কথা এখনো মনে আছে যে এদের নামকরণ জন্ম-বার থেকে হয়ে থাকে— যথা সোমিয়া, মঙ্গলিয়া, শুকিয়া ইত্যাদি। সাধারণত এরা বেশ জোরালো ও সাহসী মানুষ, নিজেদের মধ্যে মারামারি, খুনোখুনি, দাঙ্গাহাঙ্গামা খুব করে। তবে চুরি ডাকাতির দিকে বড়ো একটা যায় না।

কুলাবা জেলার পাহাড়ী বাসিন্দা বলতে দুই জাত, কাতকরী ও ঠাকুর। এদের রঙ, চেহারা, চালচলন, রীতি-নীতি অনেকাংশে মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভীলের মতো। থাকে পাহাড়ের উপর, বন-জঙ্গলে কাঠ কাটে, মজুরি করে, আবার মধু ইত্যাদি নানারকম বনের দ্রব্য সংগ্রহ করে গ্রামে গ্রামে বেচে বেড়ায়। কাতকরীরা ভালো শিকারী— চমৎকার তীরন্দাজ। বনে তিতির, খরগোশ, কখনো বা বরাহ মেরে, গ্রামের বড়ো লোকদের বাড়িতে জোগায়। খেতে না পেলে মাঝে মাঝে ডাকাতের দলও পাকায়, কিন্তু ছিঁচকে চুরি বড়ো একটা করে না। ঠাকুরেরা অপেক্ষাকৃত নিরীহ জীব। তাদের শিকার-টিকারের শখ নেই। কুলি-মজুরি করে খায়। কখনো-বা জঙ্গলের মাঝে একটু-আধটু জমি নিয়ে চাষবাস করে। কাতকরীদের মতন ডাকাতি করার সাহস এদের নেই, তবে দরকার পড়লে চুরি করে বইকি! কাতকরীরা হনুমানের মাংস খেতে খুব ভালোবাসে। পার্বণ উৎসবাদিতে হনুমানের মাংসই এদের প্রধান ভোজ্য। পাহাড়ের নীচের গ্রামগুলিতে হনুমানের উপদ্রব বেশি হলে গ্রামের লোকে এই কাতকরীদের

ডেকে পাঠায়। কারণ অন্য হিন্দুরা তো শ্রীরামের ভক্ত হনুমানকে মারতে পারে না।

এই কুলাবা জেলাতে অনেক ইহুদীর বাস। তারা কিন্তু আমাদের মুর্গীহাটার অধিবাসী আধা-আরব বগ্দাদী ইহুদীদের মতো গৌরবর্ণ বিদেশী নয়। তারা নিজেদিকে বলে বেন-ই-ইসরাইল। আর এক নাম Black Jews। ভারতবর্ষে এক কোকন ছাড়া আর কোথাও এদের বসতি নেই। কত শতাব্দী আগে যে এরা ভারতবর্ষে এসেছিল, তা ঠিক বলা যায় না। তবে এখন একেবারে নেটিব বনে গেছে। নেটিবের মতনই কালো বরণ, ধুতি পরে বেড়ায়, গ্রাম্য মরাঠিতে কথাবার্তা কয়। এরা পুরানো ইহুদী নামগুলো একবারে ছেড়ে দিতে পারে নেই, তবে এখন নানারকমের দেশি নামও নিয়েছে। যেমন বাপুজী, বাবাজী, নানাসাহেব ইত্যাদি। এদের পদবী অন্য মরাঠাদের মতো গ্রামের নামের সঙ্গে 'কর' যোগ করে হয়ে থাকে। দুই একটা নামের নমুনা দিচ্ছি— শেলম বাপুজী, স্থলেমান নানাসাহেব পেনকর, রুবেন এজরা মহাড়কর ইত্যাদি। বেনি ইসরাইলরা অধিকাংশ পল্লী গ্রামবাসী। গ্রাম্য সমাজে এরা তেলী বলে খ্যাত— জাত-ব্যাবসা ঘানি চালানো। আগেকার কালে অনেকে পল্টনে কাজ করত। এখন ইংরেজি লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি, ওকালতি ডাক্তারিও করে। কিন্তু অন্য যাই করুক, এরা মহাজনী, স্থদখোরী করে না অপর দেশের ইহুদীদের মতো। হয়তো এরা যখন ভারতবর্ষে এসেছিল তখন ইহুদীরা পরাধীন জাত হয় নেই; আপন দেশে সকল রকম কাজই করত। আর একটা আশ্চর্য কথা যে এরা এতদিন এদেশে পৌত্তলিকের মাঝে বাস করেও বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ (Judaism) ত্যাগ করে নাই। মাঝে মাঝে বড়ো গ্রামে এদের ধর্মমন্দির (Synagogue) দেখা যায়। আমার বড়ো ভালো লেগেছিল এই জাতটাকে। ঘরদোর তকতক করছে, মানুষগুলো সব সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর মেয়েপুরুষ সকলেই বেশ ভদ্র অথচ রাশভারী। জাতে তেলী হলে কি হয়, এদের একটা বিশেষত্ব আছে।

আহমদাবাদ বা বিজাপুরের মতো উত্তর কোকনেও গ্রামের পাটিল আছে। কিন্তু যেমন গ্রাম, তেমনি পাটিল। বেচারারা এত গরিব যে সময় সময় ক্যাম্পে দেখেছি দুধ বা জ্বালানী কাঠ নিজেরাই মাথায় করে নিয়ে আসছে, আর সামান্য দু-পয়সা বকশিশের জন্য হাত পাতছে। পাটিলের চেয়ে বরং অন্ত্যজ-জাতীয়

চৌকিদারগুলোকে মানুষের মতন মনে হত। চারটি বছর মানী, জবরদস্ত, পাটীদার ও লিঙ্গায়ৎ গ্রামনীদের সঙ্গে কাটিয়ে এখানে এসে প্রথম প্রথম বড়ো হতাশ বোধ হত। এইরকম পাটিল নিয়ে কাজ করব কি করে! ক্রমশ সয়ে গেল। দেখলাম যে এ প্রদেশে মাইনে করা তলাটী বা village accountant-এর প্রভাব বেশি। পাটিল তারই হুকুম বরদার। যেখানে গ্রামের মতো গ্রামই নেই, সেখানে মাতব্বর আসবে কোথা থেকে!

সারা জেলার মধ্যে সবচেয়ে দুর্গম হচ্ছে করজত তালুকা। এই তালুকার খানিকটা একেবারে পশ্চিম ঘাটের মাথায়। এখানে ডোঙর কোলী বলে এক পাহাড়ী জাত বাস করে। তারা ভীল-কাতকরীদের মতো aboriginal বা বর্বর জাত নয়। কিন্তু ভয়ানক দুর্দান্ত। আমার সময়েতেও ঠিক পোষ মানে নেই। কিছুকাল আগে দাজী বিঠ্ঠ শিন্দে নামে এক মরাঠা এই ডোঙ্গর কোলীদের নিয়ে করজত অঞ্চলে এক মস্ত ডাকাতের দল গড়ে তুলেছিল। সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল এই দল ভাঙতে। যত দূর মনে আছে, দাজী বেঁচে থাকতে দল ভাঙে নেই। দাজীর দল গ্রামে বস্তীতে মামুলি রকমের লুঠতরাজ তো করতই, উপরন্তু ঘাটমাথায় যাবার সড়কের উপর রীতিমত ট্যাক্স আদায় করত পথিকদের কাছ থেকে। ডাকাতের প্রশংসা করতে নেই, কিন্তু লোকে বলত যে দাজী শিন্দে গরিব দুঃখীর উপর জুলুম করত না। বরং বড়ো লোকের পয়সা লুটে নিয়ে গরিবদের বিতরণ করত। সে যাই হোক, কোনো রাজাই তো আর ডাকাতকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাই দাজীর দলকে ধরবার জন্য সরকার নানারকমের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ওদের এমন পাকা গোয়েন্দার ব্যবস্থা ছিল যে পুলিস কাছাকাছি এলেই মুহূর্তের মধ্যে ডাকাতের দল অদৃশ্য হয়ে যেত। একবার পালালে সেই গহন বনের মাঝে গিরি-দরী-কন্দরে কোথায় লুকিয়ে পড়ত, ধরে কার সাধ্য।

এ গল্পটা বললাম এই জন্য যে পাঠক বুঝবেন কুলাবাটা কিরকম অদ্ভুত জায়গা ছিল। এক দিকে ঘন অরণ্যাবৃত করজতের মাঠ, চোর ডাকাতের ঘর; অন্য দিকে বোম্বাই বন্দরের পরপারে বোম্বাই-এর suburb বিশেষ, উরন শহর, ইংরেজ পারসী প্রভৃতি হ্যাট-কোট পরা সাহেব-স্থবোর বাস।

কুলাবা জেলার সদরের নাম আলিবাগ। ছোট্টো শহর। সমুদ্রের কিনারে আমাদের কয়েকজন আমলার বাঙলা। তার দক্ষিণে নূতন মানমন্দির, তখনো

তৈরি হচ্ছে। তার খানিকটা আগে হাসপাতাল ও ডাক্তার সাহেবের কুঠি। কাছেই দেশি ক্লাব— ক্রীড়া-ভবন। সাহেবদের ক্লাব ছিল না। বোধ হয় আজও নেই। আমরা পুলিস সেপাইদের সঙ্গে রোজ হকি খেলতাম, বেশির ভাগ সময় জলের ধারে বালির উপর। তারপর, কারো না কারো বাঙলাতে জমায়েৎ হয়ে তাস-পাশা খেলে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিতাম। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর-প্রকৃতি বয়স্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আমাদের কোনো খেলাধুলোতে যোগ দিতেন না। তবে দেশি ক্লাবেও যেতেন না পাছে ইজ্জতের কোনো রকম হানি হয়। বাকি কজন অফিসার সবাই ইংরেজ ছিলেন। বিজাপুরের চেয়েও ছোটো সমাজ, তায় ক্লাব নেই, আমাদের পরস্পরের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ রকম মেশামিশিই ছিল।

আমার কলেকটার ছিলেন ব্রাউন বলে এক আধ-বয়সী ভদ্রলোক। ভারি চমৎকার মানুষ। হতে পারে কাজকর্মে খুব বেশি হুঁশিয়ার ছিলেন না, কেননা শেষ বয়সেও তেমন বড়ো চাকরি কিছু পান নেই। তবে মানুষটি যেরকম সৎ, সরল ও স্পষ্টবাদী ছিলেন, তাতে হুঁশিয়ার হলেও বেশি দূর উঠতেন কিনা সন্দেহ। কারোয়াহি নইলে সংসারে কি আর কিছু পাওয়া যায়। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই বললেন, "ওহে! এখানে কাজকর্ম বেশি নেই। আমি চারটের সময় কাছারি শেষ করি। তুমি আমার সহকারী, তিনটে অবধি খাটলেই যথেষ্ট। তারপর চা খেয়ে খুব খানিকটা হকি খেলবে, রাত্তিরে নিজের পড়াশুনা করবে, তা হলে সময়টা দিব্যি কেটে যাবে। নাই বা রইল নাচ, বড়খানা, ক্লাব।"

আমাদের কলেকটরিতে একখানা বড়ো lifeboat ও একখানা সাধারণ jollyboat সাজ সরঞ্জাম সমেত ছিল। সমুদ্রে কোনো নৌকার বা জাহাজের বিপদ আপদ signal হলেই বড়ো নৌকাটা তক্ষণি বেরিয়ে যেত। ব্রাউন নিজে পারলেই যেতেন। আমাদের কাউকে কাউকে কখনো কখনো সঙ্গে নিতেন। সামনের সমুদ্রে খুব কম জল, আর জলে ডোবা অজস্র পাথর। কাজেই বিপদ আপদ বর্ষাকালে মাঝে মাঝে হতই। এই নৌকা দুটো চালাবার জন্য একজন বুড়ো বিচক্ষণ তাণ্ডেল ও আটজন মাল্লা ছিল। সবাই জাতে কোলী। আমরা সমুদ্রের তুফানকে ডরাতাম না বলে এরা আমাদিকে বড়ো ভালোবাসত। ব্রাউন এদের চোখে দেবতাবিশেষ ছিলেন। আমি তার অ্যাসিট্যান্ট বলে একটা ছোটো-খাটো উপদেবতা বনে গেছলাম। একদিন আমি পুরোপুরি কোলীর সাজ

পরে বইঠা হাতে, জাল কাঁধে, একখানা ছবি তোলালাম। সে ছবি পেয়ে আমাদের মাল্লারা যে কি খুশিই হল, কি বলব! কোলী রাজা পর্যন্ত এসে একখানা চেয়ে নিয়ে গেলেন। বললেন, "বড়ো করিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখব।" আমাদের তাণ্ডেল ছিল বহুকালের পুরোনো লোক। সেকালের জাহাজডুবি নৌকাডুবির কত গল্প করত। তার বাঁধা বুলি ছিল, 'জাহাজের সাহেব কাপ্তানগুলো বড্ড মদ খায়! নইলে বোম্বাই-এর বাতিঘর আর আমাদের খান্দেরীর বাতিঘর— এ দুটোর মাঝে গোলযোগ কি করে হতে পারে সাহেব?' ব্রাউনের নাম করে কেবলই বলত, 'সাহেব তো সাহেব, ব্রাউন সাহেব! রাত বারোটাই বাজুক, একটাই বাজুক, সিংনেইল হলেই আমাদের সাথে বেরিয়ে যাবে।' বাস্তবিকই ব্রাউন বাহাদুর লোক ছিলেন। যখন জার্মান যুদ্ধ বাঁধল, তখন তিনি পেনশন নিয়েছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পল্টনে নাম লেখালেন। একবার বেলজিয়াম থেকে জখম হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু সেরেই আবার ছুটলেন লড়াইয়ের ময়দানে। এবারে আর সহজে নিষ্কৃতি পেলেন না। একখানি পা কেটে দিয়ে এলেন যুদ্ধের রাক্ষসীকে।

ব্রাউনের মতো দিলদরিয়া মানুষ যেখানে কর্তা সেখানে সামাজিক ও official (কর্ম সংক্রান্ত) জীবন জলের মতো বহে যাবে, এই স্বাভাবিক। হয়েওছিল তাই। একটি দিনের জন্যও কোনো বিষয়ে খিটির-মিটির হয় নেই। শুধু আমার নিজের কথা বলছি না। সকলেরই মুখে একটা সহজ আনন্দের ভাব সব সময় দেখা যেত। অবশ্য এটা অনেকাংশে আবার climatic— জলবায়ুর প্রভাব। ঘণ্টাখানেক ধরে সমুদ্রে স্নান করে, বালির উপর হকি খেলে মাঝে মাঝে নৌকায় বেড়িয়ে কি আর মানুষ বদমেজাজী থাকতে পারে। নোনা হাওয়ার ozone মনের ময়লাও তো পুড়িয়ে দেয়।

আমাদের মফস্বলে বেরিয়ে যাবার আগে ব্রাউন বিলেত চলে গেলেন। এক নূতন কলেকটার এলেন। তাঁরও নাম B., বুড়ো লোক, কমিশনার হওয়ার কথা। তখন তাঁকে পাঠিয়ে দিল কিনা এই ক্ষুদ্র জেলার হাকিম করে! ভদ্রলোক প্রথম এসে কয়েকদিন সব সময় মেজাজ খারাপ করে থাকতেন। আমাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতেনই না, দেখা হলেই আপিসের কথা কইতেন, আর সবাইকে বলতেন আমি ছুটির দরখাস্ত করেছি, এই মাস পরে দেশে চলে যাব, কিন্তু বেশি দিন এ ভাব রইল না। মাসখানেক নোনা জলে সাঁতরে, আর সমুদ্রের

ঘুম-পাড়ানি গান শুনে ভদ্রলোকের ব্যাধি সব সেরে গেল। আমি বাঁচলাম। মনে বড়ো ভাবনা হয়েছিল, এ রকম বড়ো সাহেব নিয়ে চালাব কি করে।

১১

বর্তমান কালে কুলাবা জেলা ও আলিবাগ শহর নিতান্ত নগণ্য ক্ষুদ্র স্থান হলেও চিরদিন তা ছিল না। আমার মতন মানুষ, যে অতীতের মাঝে বাস করে, অতীতের স্মৃতি নিয়ে দিন কাটায়, তার কাছে আনকোরা নূতন কুবেরপুরীর মূল্য কি! তাই আমার বিজাপুরও যেমন ভালো লেগেছিল, কোকনও তেমনি লাগল। যেন স্বপ্নরাজ্য! নূতন সাত-তলা ইমারত নেই, কিন্তু প্রকাণ্ড কালো কালো পুরানো কেল্লাগুলো আছে। ব্যাবসা-বাণিজ্য নেই, পয়সা-কড়ি নেই, কিন্তু অতীতের অক্ষয় স্মৃতি-সম্পদ আছে। মানুষের তৈরি লেডী-বাগিচা, চিড়িয়াখানা, বটানিকাল গার্ডেন নেই, কিন্তু প্রকৃতি তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সমুদ্র, পাহাড়, বন-জঙ্গল দিয়ে দেশটাকে সাজিয়েছেন। এমন সাজিয়েছেন যে কোথাও তার জোড়া পাওয়া ভার! আজই না হয় এখানে মানুষ নেই, কিন্তু একদিন এই বিরাট সুন্দর আবেষ্টনের উপযুক্ত মানুষও কত ছিল!

বোম্বাই পালোয়া বন্দরে দাঁড়িয়ে দক্ষিণের পানে চাইলে ওপারে যে পাহাড় দেখা যায় সেইখানে আমার এলাকার আরম্ভ। পাহাড়ের প্রাচীন নাম দ্রোণগিরি। ওই পাহাড়ের গোড়ায় উরণ শহর, যার কথা পরে অনেক বলতে হবে। এই পাহাড়ের নাম দ্রোণগিরি কেন হল, সে সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম। গল্পটা প্রায় ভুলে গেছি। যতটুকু মনে আছে, তা এই। সেকালে অর্জুনগুরু দ্রোণাচার্যের সঙ্গে দেবদ্বিজের শত্রু এক বিশালকায় রাক্ষসের যুদ্ধ বেধেছিল, রাক্ষস আকাশ থেকে যুদ্ধ করছিল, দ্রোণাচার্যের বাণে বিদ্ধ হয়ে এইখানে সমুদ্রতীরে পড়ে। তারই দেহ হতে এই পাহাড়ের উৎপত্তি। হয়তো আধুনিক পাঠক নজীর প্রমাণের অভাবে এই গল্প বিশ্বাস করবেন না।

তা, না করুন! কুলাবার প্রাচীনত্বের একেবারে অকাট্য প্রমাণ আছে। বোম্বাই-এর জাহাজ-ঘাটার ঠিক সামনাসামনি ঘারাপুরী বলে এক দ্বীপ আছে। সারা দ্বীপটা জুড়ে এক পাহাড়। সেই পাহাড়ের মাথার উপর বিখ্যাত হস্তীগুম্ফা বা এলিফাণ্টা কেভ্‌স্। বিশাল এই গুহা, আর অপরূপ সুন্দর তার ভেতরের মূর্তিগুলি! আপনারা অনেকেই এই এলিফাণ্টা দেখেছেন। যাঁরা

দেখেন নেই, তাঁরা এর সম্বন্ধে কেতাব পড়েছেন। সুতরাং এখানে আবার তার বর্ণনা করা বাহুল্য হবে। শুধু এইটুকু বলি যে এই অনুপম গুহামন্দির তৈরি হয়েছিল প্রায় হাজার বছর আগে, যখন সারা বোম্বাই দ্বীপটাতে ঘর কতক জেলেদের বসতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই যে ঘারাপুরী দ্বীপ, এও ছিল আমার এলাকার সীমার মধ্যে। আমি যখনই একা বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গুহা দেখতে যেতাম, হাকিম মূর্তিতেই যেতাম। এখন কথা হচ্ছে এই যে হাজার বছর আগে যাঁরা আস্ত পাহাড় কুঁদে এই আশ্চর্য গুহা ও মূর্তি গড়েছিলেন, তাঁরা তো সামান্য মানুষ ছিলেন না। কুলাবা জেলার প্রাচীন সভ্যতার আর কি প্রমাণ চাই!

এ তো গেল হিন্দু যুগের কথা। মোগলদের আমলেও এ প্রদেশের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নেই। ছত্রপতি শিবাজীর বিখ্যাত রায়গড় কেল্লা এই কুলাবা জেলারই দক্ষিণ প্রান্তে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শিবাজী মহারাজ তো পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গাতেই কেল্লা বেঁধেছিলেন, কিন্তু এই রায়গড়ই ছিল তাঁর রাজধানী। এইখানেই সেই মহাপুরুষের অভিষেক হয়েছিল, আর এইখানেই তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন। কত লোক সেই সমাধি দেখতে আজও যায়। স্বয়ং লাট উইলিংডন সেখানে গিয়ে সমাধি ঢাকবার এক বহুমূল্য চাদর দিয়ে এসেছিলেন। যাঁকে ইংরেজি ইতিহাসে বারবার ডাকু বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর সমাধির প্রতি এইরূপ সম্মান দেখানোর জন্য সাহেবসুবো কেউ কেউ লাটবাহাদুরের ওপর বড়ো বিরক্ত হয়েছিলেন। নিজের কানে ক্লাবে এই সম্বন্ধে অনেক টীকা টিপ্পনী আমাকে শুনতে হয়েছিল। নীরবে শুনেছিলাম, কি আমিও কিছু টিপ্পনী কেটেছিলাম, তা এখন ভুলে গেছি।

এই জেলার বাণকোট গ্রাম পেশোয়া মহারাজদের জন্মভূমি। যে বাজীরাও পেশোয়ার নামে একদিন অর্ধেক ভারতবর্ষ কাঁপত, তিনি ছিলেন এই বাণকোটেরই ছেলে। যতদিন পেশোয়ারা তাঁদের গরিব সাদাসিধে কোকনী চাল বজায় রাখতে পেরেছিলেন, ততদিন তাঁদের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। বাজীরাও-এর এক গল্প পাঠকের মনে আছে কি? একবার নিজাম-উল-মুলকের এক দূত এলেন পুণা শহরে পেশোয়ার দরবারে। সঙ্গে কত হাতি ঘোড়া, লোক-লস্কর, বাজনা বাদ্য! নিজামের রাজ্য তখন সবে নূতন স্থাপিত হয়েছে কি না! দূত এসে শুনলেন যে পেশোয়া মহারাজ রাজধানীতে নেই; সেইদিনই ফৌজ নিয়ে অমুক সড়কে বেরিয়ে গেছেন। দূত মনিবের কাছ থেকে এক অত্যন্ত জরুরী পত্র

নিয়ে এসেছিলেন— নিজাম তখন পেশোয়ার মিত্রতাপ্রার্থী। কাজেই বৃথা সময় নষ্ট না করে দূত তৎক্ষণাৎ একলা রওয়ানা হয়ে গেলেন পেশোয়া যে পথে গেছেন, সেই পথ দিয়ে। খানিক দূর গেলে পর দেখলেন যে একদল মরাঠা সওয়ার আগে আগে যাচ্ছে, তাদের পিঠে ঢাল-সড়কি বাঁধা। তারা হাসি তামাশা করতে করতে পোড়া জওয়ারীদানা খেতে খেতে চলেছে। দূত এগিয়ে তাদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পেশোয়া মহারাজের সওয়ারী কোনদিকে গেছে, বলতে পারেন কি?"

একজন সওয়ার বললেন, "কেন, পেশোয়ার খবরে আপনার কি প্রয়োজন?"

মুসলমান উত্তর দিলেন, "তাঁর কাছে আমার মনিব নিজাম-উল-মুলকের চিঠি এনেছি।"

সওয়ার হেসে বললেন, "আমিই বাজীরাও। কই, আপনার পত্র দেখি।" দূত ঘোড়া থেকে এক লাফে নেমে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করে পেশোয়াকে পত্র দিলেন। পেশোয়া প্রসন্নমুখে পত্রখানি পড়লেন। তখন দূত আবার সেলাম করে মহারাজের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, "হুজুর, আমার মনিব ঠিকই বলেছেন—'ইস মুল্‌কমে এক বাজী, আওর সব পাজী।'" বাজীরাও হেসে উত্তর দিলেন, "আপনি আপনার মনিবকে গিয়ে বলবেন, বাজীরাও-এর উত্তর এই— ইস্ মুল্‌কমে এক নিজাম, আওর সব হাজাম।" সেইখানেই ঘোড়ার পিঠে বসে অতি সংক্ষেপে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে এই বিচক্ষণ বীর একটা মতলব স্থির করে ফেললেন। মন্ত্রণাগারের অপেক্ষা রাখলেন না। এঁরই বংশধর রঘুনাথ রাও পেশোয়া যে একদিন পানিপথে মরাঠা গৌরব ধূলিসাৎ করলেন, সে শুধু তিনি কোকনী চাল ছেড়ে বাদশাহী চাল ধরেছিলেন বলে।

কুলাবা জেলার সঙ্গে মরাঠী-শাহীর সম্বন্ধ কিন্তু এইটুকুই নয়। আলিবাগ ছিল মরাঠা নৌবহরের অধিনায়ক বিখ্যাত কানোজী আঙ্গরের রাজধানী। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে পশ্চিম ভারতের রাজারাজড়ারা সবাই স্থির বুঝেছিলেন যে শুধু ডাঙায় যুদ্ধ করে ভারতে প্রধান্য লাভ আর সম্ভব নয়। সেই জন্যই স্বয়ং মহারাজ শিবাজী দক্ষিণ কোকনে সমুদ্রকূলে দুই প্রকাণ্ড কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। হরনাই বন্দরের সুবর্ণদুর্গ, আর মালবন বন্দরের সিন্ধুদুর্গ। এই দুই কেল্লার মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু পাহাড়ের উপর নৌ-সেনাপতি ধোলপ বেঁধেছিলেন বিজয় দুর্গ, আর রতনাজী নামে এক সরদার বেঁধেছিলেন রত্নগিরির বিশাল কেল্লা। উত্তর কোকনে আলিবাগে সেনাপতি আঙ্গরে তুলেছিলেন দুই

কেল্লা— আলিবাগ দুর্গ ও হীরাকোট। আলিবাগ দুর্গ ছিল ঠিক আমার বাঙ্গালার সামনে দুশো কদম দূরে জলের মাঝে, আর হীরাকোট ছিল ডাঙার উপর ঠিক আমাদের পেছনে। আমার সময়ে হীরাকোট হয়ে গেছল সরকারী আপিস ও জেল, কিন্তু জলের মাঝের কেল্লাটা একরকম খালিই পড়েছিল। আমাদের লাইফ বোটের মাল্লারা সেখানে থাকত, আর একটা দীর্ঘ মাস্তলের উপর উড়ত ব্রিটিশ পতাকা। ভেতরে কানোজী আঙ্গরের মহল ছিল, কিন্তু তখন ভাঙাচোরা বেমেরামত অবস্থায়। সমুদ্রে খুব ভাঁটা পড়লে কেল্লা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যেত। তাই আমরা প্রায়ই বেড়াতে যেতাম ওই কেল্লায়। বেড়াতে বেড়াতে আনন্দ হত, না দুঃখ হত! নিজেই ঠিক বলতে পারি না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসত, কিন্তু মনটা হালকা বোধ হত। শিবাজীর স্বর্ণ-দুর্গ আজ খালি পড়ে রয়েছে, কিন্তু সিন্ধু-দুর্গের ভেতর এক মন্দির আছে, যেখানে দেবীমূর্তির সামনে ছত্রপতির পুরানো পোশাক ও তলোয়ার রাখা থাকে। মন্দিরে নিয়মিত পূজা হয়, কোলহাপুরের মহারাজ বাহাদুর তার খরচ দেন। এই কেল্লার প্রাচীরের উপর এক জায়গায় একটা হাতের ছাপ আছে। লোকে বলে সেটা শিবাজী মহারাজের নিজের হাতের ছাপ। যখন কেল্লা বাঁধা হচ্ছিল, তখন একদিন তিনি সেইখানে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। চুন বালি কাঁচা ছিল, তাই ছাপ রয়ে গেছে। পাঠক, সে ছাপ আমি মুহূর্তের জন্য দেখেছি, দাঁড়াতে পারি নেই। আপনারা সুবিধা পেলে একবার দেখে আসবেন, চক্ষু সার্থক হবে।

রায়গড় দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটে নেই। যে জন্য দিল্লী, আগ্রা, চিতোরগড় দেখতে যাই নেই, বোধ হয় সেই জন্যই। দুর্বল মানুষের মন তো! তার একটা সহ্যের সীমা আছে। বিজয়-দুর্গের ধোলপেরা একবার কোনো এক বিলেতী জাহাজ মেরে সেই জাহাজের ঘণ্টা এনে তাঁদের শিবমন্দিরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখনো বোধ হয় ঝুলছে। অন্ততঃ আমার সময়ে ছিল। ঘণ্টার উপর জাহাজের নামটা পর্যন্ত দেখা যেত। অন্যের জাহাজ মারা সে যুগে তো বীরধর্ম বলেই গণ্য হত! আটলাণ্টিকের জলদস্যু র‍্যালে ও ড্রেক, সেকালের মালাবারের সাহেব বোম্বেটের দল, এদের তো আজ কেউ নিন্দা করে না, ধোলপকে দোষ দিয়ে ফল কি!

পাঠক, একবার সেকালের ভারতের পশ্চিম উপকূলের ছবিটা মানসচক্ষে দেখতে চেষ্টা করুন। ইংরেজ কোম্পানীর সুরত ও বোম্বাই, ফিরিঙ্গীদের গুজরাতে দমন ও দক্ষিণে গোয়া, হাবসীদের গুজরাতে সচিন ও কোকনে জঞ্জীরা,

মরাঠাদের আলিবাগ হতে মালবন পর্যন্ত এক সারি কেল্লা, মালাবার উপকূলে মোপলা আরবদের কালিকট। কতকাল ধরে এই সমস্ত রাজারা সমুদ্রে আধিপত্যের জন্য মারামারি কাটাকাটি করেছিলেন, অনবরত পরস্পরের জাহাজ ডুবিয়েছিলেন, তার কি আজ কোনো হিসাব করা যায়! শেষ, ডাঙাতেও যা হল, জলেও তাই হল। যে যোগ্যতম, সেই জিতল। বাকি, কেউ গেল, কেউ ছেলে খেলা করবার জন্যে বেঁচে রইল।

আলিবাগের আঙ্গরে বংশের আছে শুধু একটি মেয়ে, আর কেউ নেই। বিষয় সম্পত্তিও না থাকার মধ্যে। মেয়েটির নাম জিজাবাঈ। তাঁর বিবাহ হয়েছে মধ্য ভারতের দেবাস রাজ্যের পওয়ার ঘরাণাতে। তাঁদের যদি ছেলে হয়ে থাকে, তো সেই কানোজীর বিগত-গৌরব বংশধর। আমি জিজাবাঈ সাহেবাকে কখনো দেখি নেই, কিন্তু তাঁর স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সৌভাগ্য হয়েছিল। অতি চমৎকার লোক। ধোলপদের আর কেল্লা নেই, রাজ্য নেই, সামান্য জায়গীর পড়ে আছে মাত্র। রাজ্য কেল্লা থাকলেই বা কি! অনেকের তো আছে।

আমার পুরানো কথা বলতে বলতে অন্যের পুরানো কথা এসে পড়ল। থাকতে পারলাম না, তাই একটু ইতিহাস চর্চা করতে হল। পাঠক অপরাধ নেবেন না। আমি এইবার অন্য কথা পাড়ব।

কুলাবা জেলাতে নূতন যে-সব জাতের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল, তাদের অনেকের কথা ইতিপূর্বে বলেছি। কিন্তু একটি জাতের উল্লেখ করা হয় নেই। সেটি হচ্ছে কায়স্থ জাত। পুরো নাম চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ প্রভু। মহারাষ্ট্রে কায়স্থ সংখ্যা খুব কম। তাঁদের জন্মভূমি হচ্ছে কুলাবা জেলাতে আর তার আশেপাশে। তাঁরা আমাদের মতো শূদ্রাচারী কায়স্থ নন। আচার ব্যবহার উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়ের মতো। তবে, ক্ষত্রিয় যোদ্ধাজাত, বাহুবলের উপাসক, মগজের সঙ্গে সম্পর্ক কম। কায়স্থ প্রভুরা আমাদেরই মতো মসীজীবী ও বুদ্ধি-ব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। বুদ্ধি-বলে কেউ খাটো নয়, তাই এই দুই জাতের ঝগড়াঝাঁটি সর্বদা সর্বত্র সর্ব কার্যে চলেছে। অন্য লোককে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। ব্রাহ্মণেরা এঁদিকে দ্বিজ বলে স্বীকার করেন না। প্রভু কথাটাকে পরভু উচ্চারণ করে তার একটা কদর্থ করেন। তা ব্রাহ্মণেরা তো শিবাজীর বংশধরদিকেও কৃষক জাতীয় শূদ্র বলেন! এ-সব ঝগড়া কিন্তু আগেকার দিনে ছিল না। বাজী প্রভু যখন শিবাজীর একজন বিশ্বস্ত

সেনাপতি ছিলেন, তখন কায়স্থ প্রভু জাতটাকে কেউ ক্ষত্রিয় বই আর কিছু মনে করত না। শিবাজী মহারাজ দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। তাঁর একটা সার্বজনীন ভাব ছিল। তাই তাঁর দপ্তরে, পলটনে, তিনি সব জাতকে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পরে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের রেশারেশি ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল। চতুর্থ ও পঞ্চম পেশোয়ার আমলে ফতোয়া জারি হল যে কায়স্থ প্রভুরা শূদ্র, ক্ষত্রিয় নয়। এর ফলে কায়স্থেরা ধীরে ধীরে রাজদরবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিলেন। পঞ্চম পেশোয়া নারায়ণ রাওকে তাঁর কাকা রঘুনাথ রাও ও কাকী আনন্দীবাঈ খুন করান। যে খুন করেছিল, তার নাম সুমের সিং গারদী। সে পেশোয়ার শরীর-রক্ষীদের নায়ক ছিল। ব্রাহ্মণেরা এই গুজব রটিয়ে দিলেন যে এই সুমের সিং একজন ছদ্মবেশী কায়স্থ প্রভু। এ কথা কেউ কোনো দিন প্রমাণ করতে পারে নেই। তবু অনেক ব্রাহ্মণ আজও বিশ্বাস করেন যে নারায়ণ রাও-এর হত্যা প্রভুরাই করেছিল বা করিয়েছিল। অনেকে বলেন যে কায়স্থ প্রভুরা আসলে মহারাষ্ট্রীয় নয়, তারা উত্তর ভারত হতে এসে মহারাষ্ট্রে বাস করেছে। কেউ কেউ জোর করে বলেন যে এরা সেকালের হৈ হৈ রাজপুতদের বংশধর। এ-সব কথা জোর করে বলবার মতো প্রমাণ নেই। তবে একটা জিনিস উল্লেখযোগ্য। এদের কুল-দেবতা দেবী বিন্ধ্যাচলবাসিনী। এই দেবীর মন্দির মির্জাপুরের কাছাকাছি বিন্ধ্যপর্বতে অবস্থিত, দক্ষিণ দেশে নয়। প্রভুদের চেহারা মোটামুটি অন্য মরাঠাদের মতোই। তবে চরিত্রের একটু বিশেষত্ব আছে। এরা কোকনের অন্য জাতের মতো মিতব্যয়ী নয়, বিলাসী, খরচে মানুষ। আর বুদ্ধিমান হলেও সরল-প্রকৃতি। ব্রাহ্মণদের, বিশেষ করে কোকনস্থ ব্রাহ্মণদের, সাংসারিক বুদ্ধি প্রবল। তাই তাঁরা কায়স্থদিকে কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বলেন যে ওদের ভিতরে কোনো পদার্থ নেই, কেবল বাবুগিরি করতেই জানে। কথাটা সত্য নয়। প্রভুদের মধ্যেও আমি ঢের কেজো লোক দেখেছি।

১২

চাকরির প্রথম চার বছর আমার কেটেছিল মফস্বলে, রাজধানীর চঞ্চল জীবন হতে বহু দূরে। আহমদাবাদকে তখনকার দিনেও অবশ্য ঠিক দেহাত বলা চলত না। পঞ্চাশ ষাটটা কাপড়ের কল যেখানে সারাক্ষণ আকাশে ধোঁয়া

ছাড়ছে, সে জায়গাটাকে কতকটা আধুনিক বলে কবুল করতেই হয়। তবে এই কলগুলো বাদ দিলে বাকি শহরটাকে মোটামুটি কালিদাসের উজ্জয়িনীর সঙ্গে তুলনাও করা চলত। রাস্তা ঘাট, ঘর-বাড়ি, মানুষ-জন, কারো গায়ে তখনো একালের ছোঁয়াচ লাগে নেই। মজুরেরা সব চারিপাশের গ্রামের বাসিন্দা। সারাদিন মিলে খেটে দিনান্তে আপন আপন গ্রামে ফিরে যায়। অধিকাংশই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শান্ত-শিষ্ট সাধারণ চাষীর ছেলেদের মতো। মিলের মালিকও তখনকার দিনে যাঁরা ছিলেন, চিনুভাই, লালভাই, মনসুখভাই, নগরশেঠ, মনুভাই এঁদের চেহারা, কথাবার্তা চালচলন সব ছিল একেবারে সেই সেকেলে শ্রেষ্ঠীদের মতন। পারসী শেঠদের পর্যন্ত এতটুকু ভুঁইফোড় ধরণ ধারণ ছিল না। আমার প্রতিবেশী নওরোজী শেঠজীকে এখনো মনে পড়ে। তাঁর এমন একটা সহজ সুন্দর বনেদী ভাব ছিল, যে প্রথম দর্শনেই আমরা মোহিত হয়ে গেছলাম। বোম্বাইয়ের পারসীরা গুজরাতবাসী স্বজাতিদিকে অবজ্ঞাভরে বলতেন, "Bunnias" (বেনে)। অর্থাৎ হিন্দুভাবাপন্ন। তাঁরা নিজেরা ছিলেন প্রায় সাহেব কিনা!

আহমদাবাদ শহরই যখন ছিল এই রকম, তখন মফস্বলের অবস্থা সহজেই আপনারা আন্দাজ করতে পারেন। আমার এলাকাতে ছিল দুটি শহর—ধোলকা ও সানন্দ। দুই স্থানেই মিউনিসিপলিটি ছিল। কিন্তু যেমন নগর, তার তেমনি নগর-পঞ্চায়ৎ। সত্যি কাজকর্ম সবটা আমার দপ্তর থেকেই হত। তার পরে বিজাপুর—সে তো অতীতের কঙ্কালমাত্র, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া ছিল না। সদরের মিউনিসিপলিটিই ছিল আধা-সরকারী, আমার দেহাতী ব্যাপারগুলোর তো কথাই নেই। মেম্বর মহাশয়দিকে ডেকেডুকে পান-আতর, এক পেয়ালা করে চা দিলেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতেন। এই রকমের অভিজ্ঞতা নিয়ে তো আলিবাগে এসে নামলাম। অতি অল্পকালের মধ্যেই কিন্তু বুঝতে পারলাম যে এখানকার আবহাওয়া সম্পূর্ণ আলাদা। আমার এলাকা আবার ছিল উত্তর প্রান্ত, একেবারে বোম্বাই বন্দরের আশেপাশে। মানুষের মেজাজও তাই ছিল বেশ গরম, শহুরে জনোচিত। সবাই ছিলেন আপন হক্, আপন মান ইজ্জৎ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজাগ। সেকেলে শিষ্টতার বালাই বড়ো একটা ছিল না।

আহমদাবাদের এক সুদূর দেহাতে একবার মাত্র এক শহরবাসীর বেয়াদবি আমাকে বরদাস্ত করতে হয়েছিল। বিজাপুরে তো কখনো এরকম হয়ই নেই! গল্পটা বলি। নিত্য প্রথা মতো সকালে এক গ্রামের ফটকে গিয়ে উপস্থিত

হয়েছি। দেখি কেউ কোথাও নেই, চারি দিক নিঝুম। গ্রামের ভিতর ঢুকে পড়লাম। এক বাড়ির দাওয়ার উপর দেখি একটি সভ্যভব্য ছোকরা বসে রয়েছে। গায়ে ফরসা জামা, মাথায় টিকি নেই, বেশ সুন্দর তেড়িকাটা। ঘোড়ার উপর হতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "গ্রামের লোকজন সব গেল কোথায় হে!" সে কথার জবাবই দিলে না, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর চলে গেল। আমি ভাবলাম, "হল কি?" একটু ফাঁপরে পড়লাম। যা হোক মিনিট দুই চার ঘোরাঘুরি করতে করতেই পাটিল ও চার পাঁচজন লোক এসে পড়ল। গ্রামসুদ্ধ সবাই কোনো এক মন্দিরে গেছল উৎসব উপলক্ষে। চাউরিতে বসে আপন কাজ কর্ম করতে আরম্ভ করলাম। তখন সব রাইয়ৎ জমা হয়েছে। ভিড়ের পেছনে, দেখলাম, সেই তেড়িকাটা ছোকরাটি দাঁড়িয়ে দিব্যি বিড়ি খাচ্ছে। পাটিলও বোধ হয় দেখতে পেলে, কারণ উঠে গিয়ে তাকে কি বললে। লোকটা একটু চেঁচিয়েই জবাব দিলে, "যাও যাও, বোম্বাই শহরে থাকি, অনেক সাহেব দেখেছি।" বেচারা সাহেবই দেখেছে; কিন্তু বোধহয় ভুলে গেছল গুজরাতের পাটিল কি জিনিস। বেশিক্ষণ তাকে দাঁড়িয়ে বিড়ি খেতে হল না। পাটিল তার কানটি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে কোথায় বন্ধ করে রেখে এল। এসে আমাকে সলজ্জভাবে বললে, "ছোঁড়াগুলো শহরে গেলে মাথার ঠিক থাকে না সাহেব। বড়োই লজ্জার কথা।"

এই ঘটনার পর থেকে আমি একটু সাবধানেই থাকতাম। কাউকে বেয়াদবি করার সুবিধা বড়ো একটা দিতাম না। তবে ছিলাম ছেলেমানুষ, মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি হত বইকি! আবার একবার ধৈর্য হারালে ব্যাপার শুধু কথায় শেষ হত না। তবে সে-সব ঘটনাগুলো মনে হলে নিজেই এখন লজ্জা পাই, আপনাদিকে নাই বা বললাম। একটা কথা ভাববার মতো আছে, এই জাতীয় অশিষ্ট উদ্ধত লোকগুলো কি সাধারণ চাষীদের চেয়ে মানী বা বেশি স্বাধীনচেতা? আমার তো মনে হয় না। পাটীদার বা লিঙ্গায়ৎ বা মরাঠা পাটিলেরা যেমন ভদ্র, তেমনই মানী পুরুষ। আমাদের কর্তারা আমাদিকে বারবার সামাল করে দিতেন যে আমরা যেন কোনো রকমে এদের ইজ্জতের হানি না করি। আর একটা কথা মনে হয়। এই সব মানুষগুলো, বিশেষ করে যারা ভদ্রজাতীয়, তারা স্বদেশী হাকিমের সামনে গরম ও সাহেবের সামনে নরম, হয় কেন! বোধ হয় শেয়াল মেরে হাত পাকাচ্ছে, এখনো বাঘের সামনা

সামনি হবার সাহস নেই। এ-সব অবশ্য তিরিশ চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

তবে একটা ঘটনার বিষয় আপনাদের বলি। বেশি দিনের কথা নয়। আমি তখন জেলার জজ। মহাত্মাজীর অসহযোগের হাওয়া খুব জোরে বইছে। চারি দিকে সর্বত্র সাদা খদ্দরের টুপির ছড়াছড়ি যেন পচা ডোবায় শালুক ফুল ফুটে রয়েছে। আমার জেলায় এক তরুণ মুনসেফ ছিলেন। তিনি এই খদ্দর আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। শুধু যে মনে মনে বিরোধী তা নয়। যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে নিজের মত জাহির করতেন। হয়তো বিনা কারণে পাঁচজনের মনে কষ্ট দিতেন। এর ফলে উকিলবাবুরা তাঁর উপর ভয়ানক চটে গেলেন, তাঁকে জব্দ করবেন বলে কোমর বাঁধলেন। আমি এত কথা কিছু জানতাম না। হঠাৎ রাও সাহেবের এক রিপোর্ট পেলাম যে অমুক, অমুক, দুজন উকিল তাঁর এজলাসে সাদা গান্ধী-টুপি পরে আসতে আরম্ভ করেছেন, তাঁর হুকুম মানছেন না। এই দুজনার মধ্যে একজন R., সেখানকার প্রবীণ উকিল। আমি লিখে পাঠালাম, আপনারা এই নিয়ে একটা গোলযোগ পাকাবেন না, মিস্টার R.-কে বলবেন, আমি হপ্তাখানেক বাদে আসছি। এখন ব্যাপারটা এই যে আমাদের মফস্বলে উকিলদের কোনো একটা বাঁধাধরা পোশাক তো ছিল না! তবে সাধারণ গোল টুপি পরে ও দেশের কেউ কোনো formal ব্যাপারে যেত না— আদালতাদি সরকারী ব্যাপারেও নয়; বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারেও নয়। যাওয়া রেওয়াজ ছিল না। আর আমার নিজের কোর্টে একটি ছোকরা উকিল গান্ধী-টুপি ও খদ্দরের ধুতি-পিরান পরে আসতে আরম্ভ করেছিলেন বটে। পরে শুনেছিলাম যে তাঁর সঙ্গে সরকারী ডিপার্টমেণ্ট বিশেষের লেন-দেন ছিল। সে যাই হোক, আমার নিজের কোনো খদ্দর-বিভীষিকা ছিল না; কিন্তু মুনসেফ বাবুটিকে কোনো রকমে উদ্ধার করতে হবে তো! গেলাম সেই শহরে। R. মহাশয়কে ডেকে অনেক বোঝালাম। বললাম আপনার ইচ্ছা হয়ে থাকে তো দশ গজ খদ্দরের পাগড়ি বাধুন না, আদালতে টুপিটা পরা রেওয়াজ নাই, নাই বা পরলেন! উত্তরে তিনি বড়ো বড়ো কথা শুরু করলেন— অমুক এই সাজে কাউন্সিলে যান, অমুক লাট কুঠিতে যান, ইত্যাদি। আমি জানালাম যে আমার নিজের কোনো আপত্তি নেই, তবে মুনসেফ সাহেব তো মনে করতে পারেন যে আপনারা তাঁর এজলাসের অবমাননা করছেন! যাক্ বচসা অনেক হল কিন্তু সেদিন কিছু নিষ্পত্তি হল না।

ঐ কয়দিন আমাদের কলেকটারের ক্যাম্পও পড়েছিল এই শহরে। কলেকটার ছিলেন B., একজন প্রবীণ ইংরেজ সিবিলিয়ান। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কাছে গল্পটা করাতে তিনি হেসে বললেন, "তুমি এ কদিন সবুর কর। কাল ঐ R. উকিল আমার এজলাসে এক মোকদ্দমা করতে আসছে। দেখা যাক-না, কি পরে আসে।" পরদিন বিকেলে B.র কাছে শুনলাম যে উকিল মহাশয় দিব্যি পাগড়ি বেঁধে তাঁর কাছারিতে এসেছিলেন। আর যাবে কোথা! সন্ধ্যাবেলাই R.কে আমার ক্যাম্পে ডেকে গোপনে অনেকগুলো অপ্রিয় সত্য শোনালাম। মোটামুটি বোঝালাম যে মাথার ভেতরে কি আছে সেইটাই আসল কথা, মাথার উপরে কিরকম ছাউনি ঢাকা থাকে সেটার বেশি মূল্য নেই। ভদ্রলোক একটু লজ্জিত হলেন, কিন্তু আমাকে কথা দিলেন যে এই টুপি পরা সম্বন্ধে আর জিদ করবেন না। ভালোই হল, কিন্তু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই-সব ঘটনার moral যে বড়ো ভয়ানক।

ভূমিকা তো অনেক হল, এইবার আমার কুলাবা জেলার কথা ধরি। আমার এলাকায় যতদূর মনে আছে, তিনটি মিউনিসিপালিটি ছিল— উরণ, পেন ও পনবেল। উরণ সম্বন্ধে আমার কোনো চিন্তা ছিল না, কারণ সেখানকার একজন বিংশ শতকের ভাষায় ডিক্টেটর ছিলেন। এই ডিক্টেটরের কথা আগামী বারে বলব। তিনি একজন স্বনামধন্য মানুষের মতন মানুষ ছিলেন। উরণের সবাই, ইংরেজ-পারসী-হিন্দু-মুসলমান তাঁর কথায় উঠত বসত। আমার মুশকিল হল, পেন, পনবেল নিয়ে। দু জায়গারই লোক সবজান্তা শহুরে প্রকৃতির অর্থাৎ খুব independent, স্বাধীনচেতা। অথচ গলদও অনেক— এত গলদ, যে দুই-এক বছরে কিছু উন্নতি দেখাতে না পারলে, কমিশনার সাহেব মিউনিসিপালিটি তুলে দেবেন বলে শাসিয়ে রেখেছেন। পেন শহরে ওয়ার্ড ভাগ ছিল না। সারা শহরের ভোটারদের মতানুসারে জনা আষ্টেক মেম্বর নির্বাচিত হত। ভোটার বেশির ভাগ ছিলেন ব্রাহ্মণ। কাজেই আটজনের মধ্যে অন্তত ছয়জন মেম্বর হতেন ব্রাহ্মণ। আর বাকি দুজন তাঁদেরই মুখাপেক্ষী অন্য জাতির লোক। এতে অত্যাচার অবিচারও হত নানা রকমের। কারণ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণেরা ইতরজাতির ইষ্টানিষ্টের বড়ো বেশি খবর রাখেন না। আর একটা কথা মিউনিসিপালিটির মূলে তো স্থানিক স্বরাজের তত্ত্ব নিহিত! সত্যিকারে স্বরাজ দুর্লভ হলেও স্বরাজ নিয়ে খেলাটা খুবই সুলভ। তা সে

খেলার অধিকার সকলেরই সমান। শুধু ব্রাহ্মণেই বা খেলবে কেন, শুধু বড়ো লোকই বা খেলবে কেন? কাজেই আমি মহা উৎসাহে লেগে গেলাম পেন মিউনিসিপালিটির শুধরানোর কাজে। প্রথমটা একটু ঘাবড়ে ছিলাম, কারণ ব্রাহ্মণেরা প্রতিপত্তিশালী লোক, তাঁরা ঐ ব্যাপারে বেজায় নারাজ হবেন! কিন্তু ও বয়সে তো একটা কর্তব্য করার মোহ থাকে! ভেবে চিন্তে পেন শহরটাকে গোটা চারেক ওয়ার্ডে ভাগ করালাম। তার দুটো ওয়ার্ডে ব্রাহ্মণ ভোটার বেশি। অতএব চারজন ব্রাহ্মণ মেম্বর ঢুকবেই। বাকি দুটোতে একটাতে ব্রাহ্মণেরা বকা করে একজন মেম্বর পেলেও পেতে পারেন। কিন্তু চতুর্থ টা, বাজার মহল্লা, একবারে অন্য জাতের হাতে। আমার তো মনে হল এটা বেশ সুব্যবস্থা! আমার উপরওয়ালা কর্তাদেরও এই ভাবে ওয়ার্ড বিভাগ বেশ পছন্দ হয়েছিল। অথচ ব্রাহ্মণেরা ভীষণ আন্দোলন জুড়ে দিলেন। খবরের কাগজে লেখালেখি করতে লাগলেন। আমি চেষ্টা-চরিত্র করে লোকমান্য তিলকের কেশরীর মুখ কোনো রকমে বন্ধ করে রেখেছিলাম। কিন্তু অন্য অনেক কাগজে খুব গালাগালি করলে অবশ্য আমাকে নাম ধরে না, গভর্নমেণ্টকে। যাই হোক, ইলেকশন হয়ে গেল। মেম্বর হলেন চারজন ব্রাহ্মণ ও চারজন ব্রাহ্মণেতর জাতি। তার পর পেনে ও আলিবাগে দুচারটে সভা-সমিতি করে ব্রাহ্মণ মেম্বররা একজোট হয়ে ইস্তফা দিলেন। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়েও তাঁদের মত ফেরাতে পারলাম না, অগত্যা তাঁদের স্থানে চারজন নূতন মেম্বর সরকার তরফ থেকে নিযুক্ত করলাম। চারজনই ব্রাহ্মণ, তবে একজন রাওসাহেব আর তিনজন পেনশনার! অবশ্য এ সমস্তই ইংরাজিতে যাকে বলে চায়ের বাটিতে তুফান। কারণ শহরের সত্যি কাজকর্ম আমার আপিস থেকেই বরাবর হচ্ছিল, এখনো হতে লাগল।

এইবার পনবেল-এর কথা। সেখানকার গল্পটা ছিল একটু অন্য রকমের। ব্রাহ্মণের বা কোনো জাতিবিশেষের আধিপত্য সেখানে ছিল না। তার একটা Triumvirate সকলকে শাসিয়ে দাবিয়ে রেখেছিল। তার একজন ছিল পনবেলের পুলিস দারোগা, অন্যজন মিউনিসিপালিটির সহকারী অধ্যক্ষ। আর তৃতীয়জন একজন মাড়োয়াড়ি মহাজন। কলেকটার সাহেব আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে এই ত্রিমূর্তির প্রভাব নষ্ট করতেই হবে। প্রথম দারোগাকে বদলি করলাম। তার পর মাড়োয়াড়িটিকে ডেকে বললাম, আমি খবর পেয়েছি

যে আপনি ইনকমট্যাক্স কমাবার জন্য ঝুটো হিসেবের বই দাখিল করেছেন, বোধ হয় ফৌজদারি মোকদ্দমা চালাবার দরকার হবে। তার বন্ধু দারোগাবাবু বদলি হয়ে যাওয়াতে সে একটু অসহায় বোধ করছিল। অতি সহজেই হাতে পায়ে ধরতে লাগল। বেশি মুশকিল হল তৃতীয় ব্যক্তি, ভাইস-প্রেসিডেণ্টকে নিয়ে। তিনি ছিলেন উকিল, রোজগারও বেশ করতেন, আমাকে ছেলেমানুষ জেনে আমলই দিলেন না। স্বয়ং কলেকটার তাঁকে ডেকে বোঝালেন পড়ালেন, কিন্তু তাঁর সেই একই জবাব "আপনারাই বিশ্বাস করে আমায় ভাইস-প্রেসিডেণ্ট করেছেন; এখন বলেন তো ভাইস-প্রেসিডেণ্ট আর আমি থাকব না।" সামনেই মেম্বর নির্বাচনের পালা, নূতন দারোগার মারফৎ আমি খবর পেয়েছিলাম যে এই ভদ্রলোক মিউনিসিপালিটিতে সব নিজের দলের লোক ঢোকানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তখন আমি বড়ো কর্তাদের মতামত নিয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলাম। পনবেল্ শহরে দশদিন বসে এক নূতন Rate Payers Association-এর পত্তন করলাম ও শহরের তিন-চার জায়গায় বক্তৃতা করে বোঝালাম যে প্রতিনিধি নির্বাচনের যথার্থ অর্থ কি। এই শহরে নানা রকমের মুসলমান সওদাগর ও দোকানদার ছিল। তাদের মধ্য থেকে চারজন নির্বাচন-প্রার্থী দাঁড় করানো গেল। এ পর্যন্ত সাধারণত মাত্র একজন মুসলমান নির্বাচিত মেম্বর থাকত। এই ব্যাপার নিয়ে V. P. মহাশয় একটু সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতেও চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে কিছু হল না। ইলেকশনে তিনজন মুসলমান মেম্বর নির্বাচিত হলেন। V. P-র দলের মাত্র দুজন ঢুকলেন। তিনি স্বয়ং ও আর একজন— তাঁর এক মোসাহেব। V. P-র নিজের ওয়ার্ডে তার যে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছিল, তাকে ইলেকশনের ঠিক আগের দিন আমি সরিয়ে নেওয়াতে ভদ্রলোক আমার উপর খুব খুশি হয়েছিলেন। নূতন মিউনিসিপালিটি বসলে পর তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হতে বেশি সময় লাগল না। কিছুদিন পরেই আমি বদলি হয়ে গেলাম থানা জেলায়, পনবেল হতে বেশি দূরে নয়। সেখান থেকে শুনতাম যে Triumvirate-এর দৌরাত্ম্য শেষ হয়ে পনবলের লোক বেশ শান্তিতে আছে। এই সম্পর্কে একটা মজার গল্প আছে, এইখানেই বলি। আমার একটু সমাজ-সংস্কারের বাতিক বরাবরই ছিল। তাই করলাম কি, অস্পৃশ্য জাতির একজন পেনশন-প্রাপ্ত সুবেদারকে পনবেল মিউনিসিপালিটির মেম্বর করলাম সরকার তরফ থেকে। তখনকার দিনে ও অঞ্চলে এরকম ব্যাপার

অভূতপূর্ব। সুবেদার সাহেব খুব উৎসাহ সহ রাজী হলেন, তলোয়ারের মুখ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সামরিক প্রথায় কৃতজ্ঞতা জানালেন। আমার সেরেস্তাদার কিন্তু আমাকে আগের থেকে সাবধান করে দিয়েছিল যে কাজটা ভালো হবে না, ব্রাহ্মণেরা ভয়ংকর চটে যাবেন। ভেতরে ভেতরে কি হল জানি না, কিন্তু দিন দুই-তিন বাদে সুবেদার গঙ্গাজী নায়ক স্বয়ং এসে অনুনয় বিনয় করে বললেন— 'আমায় ক্ষমা করবেন হুজুর, আমি মেম্বর হয়ে সভায় বসলে নানা গোলযোগ উঠবে।' আমি অনেক বক্তৃতা করলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের মন টলাতে পারলাম না। সে যাত্রা সমাজ-সংস্কার মুলতুবি রইল। আজ সেই গঙ্গা নায়কের স্বজাতি ডাক্তার-সাহেব কি গণ্ডগোলটাই না বাধিয়েছেন।

কুলাবা জেলায় আর একটা সম্পূর্ণ নূতন রকম কাজের সংস্পর্শে এসেছিলাম। আগেই বলেছি যে এই জেলার সর্বত্র বনজঙ্গল। এই-সব খাস-জঙ্গল ছিল জঙ্গল-বিভাগের সাহেবের তাঁবে। মুখ্যত আমাদের কিছু সম্পর্ক ছিল না এগুলোর সঙ্গে। কিন্তু আমার গ্রামবাসীদের সরকারী খাস-জঙ্গলেও নানা রকমের হক্ ছিল। তার মধ্যে একটা প্রধান হক্, যাকে বলে 'টাহাল' কাটা। এই হকের জোরে সরকারী গ্রামের চাষীরা মাঘ ফাল্গুনে বনের সীমার মধ্যে ঢুকে নানা গাছ থেকে ছোটো ছোটো ডালপালা কেটে এনে সেগুলোকে আপন আপন ধানক্ষেতে বিছিয়ে দিত। তার পর ক্ষেতের ওপরেই সেই ডালপালাগুলো যখন রোদে পুড়ে বেশ শুকিয়ে আসত, তখন তারা তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। এই আগুনে ক্ষেতের মধ্যের ঘাস, আগাছা, ধানের খুঁটো, সব জ্বলে পুড়ে যেত। আর একটা পরিষ্কার ছাইয়ের চাকা পড়ত মাটির উপরে। এক পশলা বৃষ্টি হলেই চাষীরা লাঙ্গল দিয়ে সেই ছাই মাটির মধ্যে চষে মিশিয়ে দিত। এই হল তাদের ক্ষেতে সার দেওয়া। এই প্রক্রিয়াকে ওদেশে রাব-জ্বালানো বা ক্ষেত-ভাজা বলে। কাজেই জঙ্গলে ঢুকতে না পেলে তাদের ক্ষেতে সার দেওয়া বন্ধ হয়, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। এই টাহাল কাটার অধিকারের কোনো ব্যতিক্রম ঘটলে চাষীরা ক্ষেপে আগুন হয়ে যেত। আগের বৎসর এই নিয়ে নিকটের এক জেলায় দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে দু-একজন জঙ্গলের সেপাই মারা পড়েছিল। জঙ্গল-বিভাগের নালিশ এই ছিল যে, ক্ষেত-ভাজার জন্য বড়ো বড়ো মোটা মোটা ডাল কাটারও কোনো প্রয়োজন নেই, দরকারমতো সরু সরু ডাল ওরা কেটে ছেঁটে নিলেই

হত, কিন্তু তা তো ওরা করে না। অনর্থক বড়ো বড়ো ডাল কাটে, কখনো কখনো এক-একটা সারা গাছ কেটে ফেলে জঙ্গলের স্থায়ী লোকসান করছে। জঙ্গল-বিভাগের একজন সাহেব Mr. T. আমার এলাকায় এসে আমাকে এই সমস্ত কথা বুঝিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম কথাটা সত্য। অধিকাংশ ইনামদারী গ্রামের জঙ্গল এই করে ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানকার লোকেদের এখন বাধ্য হয়ে পয়সা খরচ করে অন্য সারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আমি T.কে বললাম যে এই সমস্ত গ্রামের চাষীরা ছোটো ছেলেদের মতন, এরা তো বোঝে না কিসে নিজের অমঙ্গল হয়। এদের শুধু সাজা দিয়েই বা কি হবে! চলো, কয়েকটা গ্রামে তুমি আর আমি গিয়ে সভা করে এদিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেই। তার পর তুমি নিজের কাজে চলে যেও, আমি ঘুরতে ঘুরতে সব গ্রামেই এই বিষয়ে দু-চার কথা বলব। তিন-চারটে বড়ো বড়ো গ্রামে আমরা সভা করলাম। তার পর পাহাড় চড়ে জঙ্গলে গিয়ে গ্রামের লোকেদের হাতে-কলমে আমরা বুঝিয়ে দিলাম, কিভাবে টাহাল কাটা উচিত। এখানে সেখানে দু-পাঁচটা লোককে ধরে কিছু কিছু জরিমানাও করলাম। এই রকম মিঠে-কড়া ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তখনকার মতো গোলযোগটা কেটে গেল। একটা কথা বলা দরকার। সব গাছ থেকে কিছু রাইয়ৎরা টাহাল কাটতে পেত না। টাহাল কাটার জন্য কতকগুলো গাছ নির্দিষ্ট ছিল। শাল সেগুনের মতো দামী গাছ গ্রামের লোকের ছোঁবার হুকুম ছিল না। তবে তারা ছুঁতে চাইতও না। জঙ্গল-আইনটা যে খারাপ, তা কেউ বলে না, আসল কথা সব জায়গায় যা, জঙ্গলেও তাই। সেপাইগুলো জুলুম করলেই লোকে ক্ষেপে উঠত, নইলে কোনো গোলই হত না।

১৩

সেকালের মুনিঋষিরা 'অর্থমনর্থম ভাবয় নিত্যম্' ইত্যাদি লিখে গেলেও একালে আমরা অর্থকে মোটামুটি পরমার্থ স্থির করেছি, এটা নিঃসন্দেহ। তবে পাড়াপড়শী কারো অপ্রত্যাশিত অর্থাগম হলে মনে যে একটু কষ্ট পাই, তাকে ভুঁইফোঁড়, আঙুল ফুলে কলাগাছ ইত্যাদি নানা আখ্যা দিয়ে খাটো করতে চেষ্টা করি, সেটাও স্বাভাবিক। অক্ষম সক্ষমকে একটু হিংসার চোখে দেখবেই তো! বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

তথাকথিত ভুঁইফোঁড় আমিও দু-চারজন দেখেছি, দেখে এটা বেশ উপলব্ধি হয়েছে যে তাঁরা সাধারণ মানবের চেয়ে বুদ্ধি, চরিত্রবল ও সাহসে শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ বলেন যে এই-সব হঠাৎ বড়োমানুষের পয়সার গরম অসহ্য। কিন্তু যে এক পুরুষে আপন উদ্যমে, আপন বুদ্ধিবলে, অগাধ ঐশ্বর্য লাভ করেছে তার একটু আধটু দেমাক হবে না! দুনিয়াতে কত রকমের দেমাক তো আমরা নিত্য বরদাস্ত করছি। নির্গুণ নিষ্কর্মা জমিদারের জাঁক, বিদ্যাহীন পৈতাসর্বস্ব ব্রাহ্মণের জাঁক, কালো-সাদা সাহেব-সুবোর জাঁক, ভেকধারী খদ্দরওয়ালার জাঁক— না হয়, ধনীর জাঁকও একটু সয়ে গেলাম। কথায় বলে বিদ্যা দদাতি বিনয়ম, কিন্তু নাক-উঁচু বিদ্বানের দৌরাত্ম্যও তো জগতে কম নয়! আসল কথা বিনয় কারো একচেটে নয়। বনেদী নবাব ও হঠাৎ-নবাবের মেজাজে বিশেষ কিছু তফাৎ আছে কি? আজ দুই-একজন ছোটো বড়ো কৃতকর্মা পুরুষের গল্প করব। পাঠক দেখবেন যে আমি যা বলছি, তা নিতান্ত বাজে কথা নয়।

বছর ষাটেক আগে আমার বাবার এক তরুণ খানসামা ছিল। তার নাম সীতারাম। বেশ চালাক চতুর ছেলে, চেহারা সুন্দর, একটু আধটু লিখতে পড়তেও জানত, স্বভাবও ছিল বড়ো নম্র, তাই সবাই তাকে ভালোবাসত। খুব বেশি দিন কিন্তু আমাদের বাড়ি থাকতে পারে নেই। কিছুকাল কাজ করেই হঠাৎ বাবার অনুমতি নিয়ে দেশে চলে গেল। বলে গেল, আমাকে ছুটি দেন: এইবার একটু নিজের অবস্থার উন্নতি করবার চেষ্টা দেখব। এ-সব কথা আমার নিজের কিছুই মনে নেই, তবে ছেলেবেলায় এই সীতারামের নানা রকম গল্পই শুনতাম। মা বলতেন, 'সে কি আর চাকরের মতন ছিল রে। একেবারে যেন ভদ্রঘরের ছেলে।' মাঝে মাঝে দেখতাম কোথা থেকে খুব ভালো চা আসে। শুনতাম সীতাদাদা পাঠিয়েছে। একটু বড়ো হবার পর একবার বাবার সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছি। শিলিগুড়ি স্টেশনে গাড়ি থামতেই দেখি এক দীর্ঘকায় সুপুরুষ ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে। সেকেলে বেনিয়ানদের মতো পোশাক। সঙ্গে একজন সাহেব, জন-দুই মারোয়াড়িবাবু ও চাপরাশ আঁটা চাকরবাকর। আমরা নামতেই ভদ্রলোক দৌড়ে এসে, 'ধম্মাবতার!' বলে হাঁটু গেড়ে বসে বাবার পা জড়িয়ে ধরলেন ও কত কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'হুজুর কেমন আছেন, মাঠাকরুন কেমন আছেন, দিদিরা কেমন আছেন?' বাবা

তাকে, ছিঃ ওঠো ওঠো, সীতারাম! বলে তুলে কোলাকুলি করলেন। আমাকে বললেন, বাবা, ইনি তোমার সীতাদাদা। সীতারাম আমাকে জোরে ঝাপটে ধরে বলতে লাগলেন, "আমাকে তোমার মনে নেই, দাদা। তুমি যে বড্ড ছোটো ছিলে তখন!" সঙ্গের সাহেবটিকে বললেন, "এরা আমার মনিব, সেলাম করো!" সাহেব একটুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল। বোধ হয় ভাবলে, সীতারামবাবুর আবার মুনিব। তার পরে সসম্ভ্রমে সেলাম করে বাবাকে পথ দেখিয়ে ছোটো রেলের দিকে নিয়ে গেল। সীতাদাদা আমাকে ছাড়লেন না, যতক্ষণ না ট্রেন ছুটল। দেড়মাস পরে ফেরবার পথে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হল, খুব ভালো চা কয়েক কৌটা, আরও কি কি সব দিয়ে গেলেন। এর পর আমি বহু বৎসর দার্জিলিঙের পথে যাই নেই। সীতা-দাদাকেও আর কখনো দেখি নেই। কতদিন বেঁচে ছিলেন জানি না। তাঁর ছেলেপিলে কেউ আজও আছে কি না, তাও জানা নেই। তবে থাকে তো আশা করি তারা বাপের মতন বিনয়ী ও উদার হয়েছে। পয়সার কথা কিছু বলছি না, পয়সা তো অনেকেরই থাকে।

কুলাবা জেলাতে সেকালে দুজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। একজন হাজী কাসেম আগবোটওয়ালা। আগেকার দিনে Shepherd liners বলে যে জাহাজগুলো বোম্বাই থেকে পশ্চিম ভারতের সব বন্দরে যাওয়া আসা করত, সেই সমস্ত জাহাজের মালিক ছিলেন এই কাসেম সাহেব। তাঁর জন্ম হয়েছিল আমার এলাকার মধ্যের শেবে-নাবে দ্বীপে। অতি অল্প বয়সে তিনি সাধারণ মাল্লাগিরি করতে আরম্ভ করেন, আর সেই সামান্য অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে আপন চেষ্টায়, আপন বুদ্ধির জোরে অত বড়ো একটা নৌবহরের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে কতকটা uncut হীরকখণ্ডের মতো হলেও একজন যথার্থ হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। সকলেই তাঁর সুখ্যাতি করত, বিশেষ করে তাঁর গ্রামের গরিবগুরবো লোক। মানুষটি জবরদস্ত ছিলেন। জবরদস্ত না হলে অতগুলো জাহাজই বা চালাবেন কি করে। কিন্তু কখনো কারো কাছে তাঁর বিরুদ্ধে জুলুম কি দাগাবাজীর কোনো অভিযোগ শুনি নেই।

কুলাবা জেলার দ্বিতীয় কৃতকর্মা পুরুষ ছিলেন উরণের শেঠ হোরমসজী।

হাজী কাসেমের মতো তিনিও জীবন আরম্ভ করেছিলেন একেবারে নীচের ধাপে। আর, যখন আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল ১৯০৪ সালে, তখন তাঁর মাসিক আয় ছিল অন্তত হাজার দশেক টাকা। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারত, এই তিন এলাকা জুড়ে সর্বত্র তাঁর আবগারী ও নিমকের ঠিকেদারী ব্যাবসা ছিল। জেলায় জেলায় তাঁর আপন কর্মচারী ও সিপাহীর দল মোতায়েন থাকত, আর স্বয়ং তিনি সর্বত্র ঘুরে ঘুরে তাদের কাজের তদারক করে বেড়াতেন। ভদ্রলোক ইংরাজি জানতেন না, তবে তাঁর আপন ভাষা গুজরাটি খুব ভালো রকমই লিখতে পড়তে পারতেন। তাঁকে অশিক্ষিত মোটেই বলা চলে না, কারণ রোজ দু-তিনখানা খবরের কাগজ আগাগোড়া পড়তেন, এবং পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তার সব খবরই রাখতেন। মরাঠী ও উর্দু দুই ভাষাতেই খুব ভালো কথাবার্তা কইতে পারতেন। বেশভূষা, ধরন-ধারণ, পুরানো পারসী শেঠেদের মতো আড়ম্বরহীন ছিল। সেকেলে পারসী আদব-কায়দা আমার বড়ো ভালো লাগত। তার একটা কেমন বিশেষত্ব ছিল। কেবল মিষ্ট কথার বহর ও সেলামের ঘটা নয়, বেশ বোঝা যেত যে তাদের আদর-অভ্যর্থনা সত্যি আন্তরিক।

যেদিন আলিবাগ পৌঁছলাম, হোরমসজী সেখানে ছিলেন না। তাঁর দুই ভাই, দুটি বেশ smart পারসী যুবক, বহুমূল্য হার-তুররা নিয়ে বন্দরে তাঁদের দাদার নামে আমাদিগকে স্বাগত করলেন। বললেন, শেঠজীর হুকুমে আমরা হুজুরের খিদমতে হাজির; যা যখন প্রয়োজন হবে জানাবেন। আমি তাঁদিকে মামুলি ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। পরে কাজ-কর্মের ভিড়ে আর তাঁদের কথা মনে রইল না। মাসখানেক বাদে একদিন সকালবেলায় আপিস কামরায় বসে আছি। চাপরাসী এসে এত্তেলা দিলে যে উরণের হোরমসজী শেঠ এসেছেন। আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম। তবু বললাম, "নিয়ে আয়।" একজন বয়স্থ পারসী শেঠ এসে উপস্থিত হলেন। কাপড়-চোপড় সাদাসিধে, মুখে অমায়িক হাসি। কিন্তু প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারলাম যে মানুষের মতো মানুষ। দোরগোড়া থেকেই নিচু হয়ে সেলাম করে হিন্দুস্থানীতে বললেন, "হুজুরের সময় নষ্ট করব না। আজ আমাদের নওরোজ, একবার মুবারক বলতে এসেছি।" চাপরাসী টেবিলের উপর একখানা রুমাল ঢাকা বারকোশ এনে রাখলে। আমি উঠে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "আসুন শেঠ, বসুন।"

ভদ্রলোক সন্তর্পণে আমার হাত ছুঁয়ে আবার সেলাম করে বললেন, "সামান্য কিছু মিষ্টি এনেছি।" রুমাল খুলে দেখি সাহেববাড়ির এক বিচিত্র কেক। ডাসের উপর পড়ে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি। তার পাশে দাঁড়িয়ে কুড়াল হাতে এক কাঠুরে। দম দিলে কুড়ালটা ওঠে আর নামে সেই গুঁড়ির উপর। সবটা বিলেতি মিঠাই দিয়ে তৈরি। কুঠারখানা চাঁদির। দাম টাকা তিরিশের কম হতে পারে না। আমি যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললাম, "শেঠজী, এত দামী কেক কেন এনেছেন। এ আমি নিতে পারি না।" বৃদ্ধের মুখে সেই মৃদু হাসি, "সাহেব, এ অতি সামান্য জিনিস। আপনি ফিরিয়ে দিলে আমার মান থাকবে না।" আমি উত্তর দিলাম, "আপনার ঘরের তৈরি কিছু মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দেবেন। এটা নিয়ে যান, শেঠ।" কিন্তু হোরমসজী নাছোড়বান্দা, বলতে লাগলেন, "সাহেব, ভগবানের কৃপায় সাহেব-স্ববোর মেহেরবানিতে, আমার আজ কিছুরই অভাব নেই। তবে আমি গরিবগুরবো সবাইকে দিয়ে খাই। ক্রমশ সব জানতে পারবেন। এ সামান্য কেক কি আপনাদের পদমর্যাদার যোগ্য!" ইত্যাদি। বৃদ্ধের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক হল। শেষ তিনি কথা দিলেন যে আর আমাকে কখনো কিছু ভেট পাঠাবেন না। আমি হার মানলাম। শেঠ ভিতরে গিয়ে কেকটা আমার স্ত্রীর কাছে দিয়ে এলেন। এসে দু'দণ্ড বসে গল্প করে গেলেন। আমাকে হেসে বললেন, "হুজুর, আমার কার্য উদ্ধারের জন্য দরকার হলে কি আমি কাউকে এক টুকরো কেক ভেট দিই। অনেক টাকা আমার বছরে বেরিয়ে যায় ঐ বাবতে। তবে তোমাদের চিনে গেলাম, সাহেব! মানুষ চেনাই তো আমার কাজ। আর কখনো ভেট দিতে আসব না। তবু বুড়ো আছে মনে রেখো, কিছু দরকার হলেই ইয়াদ কোরো।" আমি মোটের উপর একটু বোকা ব'নে গেছলাম। আমতা আমতা করে বললাম, "শেঠ, আমরা ছেলেমানুষ, অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি।" বৃদ্ধ যাবার সময় একটু হেসে বলে গেলেন, "কলেকটার সাহেবকে জিজ্ঞাসা কোরো, কি হয়েছিল।"

সন্ধ্যাবেলা ব্রাউনকে ঘটনাটা বললাম। ব্রাউন খুব হেসে বললে, "তোমাকে কেক নিইয়ে ছাড়লে তো! ভারি ধূর্ত ঐ বুড়ো। কিন্তু কি জান, লোকটা ভালো। আমারও যে ওর সঙ্গে এক মজার ব্যাপার ঘটেছিল।" কি হয়েছিল বারবার জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাউন এই গল্পটা করলে—আমি মাস-তিনেক হল

এখানে এসেছি তো! সকালে পৌঁছেই চার্জ নিলাম, X. বিকালের বোটে বেরিয়ে গেল। পরদিন সকালবেলায় বারান্দাতে বসে আছি, বয় এসে বললে যে উরণের হোরমসজী শেঠ কিছু ফলফুলরী পাঠিয়েছেন। আমি কার্ডখানায় দেখলাম, খান বাহাদুর, অনারারী মেজিস্ট্রেট, ইত্যাদি। বললাম, "আচ্ছা, রেখে দে।" খানিক বাদে বয় একটা প্রকাণ্ড টুকরি এনে আমার পাশে নামিয়ে বললে, "সাহেব, এর ভেতরে ফল, তরিতরকারি, মাছ, মাংস, মায় পাউরুটি পর্যন্ত রয়েছে।" আমি রেগে চেঁচিয়ে উঠলাম, "কি এতবড়ো স্পর্ধা, সব ফেলে দে।" বয় হাতজোড় করে বললে, "শেঠের কারকুন এখনো যায় নেই হুজুর। তাকে দিয়ে দিই।" হোরমসজীর সেই ছুঁচোমুখো মুসলমান গোমস্তাকে দেখেছ তো! বেটা আসবামাত্র হুঙ্কার ছাড়লাম, "এখনই নিয়ে যা এ সব, বদমায়েস কোথাকার!" লোকটা ভয়ে কথা কইতে পারলে না, টুকরি তুলে নিয়ে পালাল। বিকেলবেলা তোমার শেঠজী এসে হাজির। একেবারে নম্রতার মূর্তি, জোড় হাত করে মাপ চাইলেন। আমি বললাম, "খবরদার খান বাহাদুর, এ রকম বেয়াদবী ফের কখনো না হয়। আমি তোমার ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি।" বুড়ো মাথা হেঁট করে উত্তর দিলে, "আর কখনো হবে না সাহেব। আমারই গলতি হয়েছে। মেহেরবান সাহেবের কাছে একদিন অন্তর এই রকম টুকরি আসত কিনা, হুজুর। তাই বুঝতে পারি নেই। তাঁর জন্য ঘোড়ার ডাক বসিয়ে রোজ সমুদ্রের তাজা মাছ ক্যাম্পে পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল।" আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে "Well, good bye, Khan Bahadur" বলে ঘরের ভেতর পালালাম। সেই থেকে আমাকে কখনো কিছু পাঠায় নেই। আজ সকালবেলা এসে নওরোজ মুবারক বলে গেল। বেশ সমঝদার বুড়ো। তুমি কিন্তু সাবধান! দরকার ছিল না কিন্তু সাবধান হবার। বৃদ্ধ আমাকে কখনো ফাঁসাতে চেষ্টা করেন নেই। দেখা করতে এসে কোনোদিন কারো নামে কিছু বলেন নেই। কিন্তু ব্রাউনের কি হল, শুনুন।

কিছুদিন পরে ব্রাউনের বদলির হুকুম এল। শেঠজী তাঁকে লাঞ্চ খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। বিদায়ী ভোজ। ঠিক হল যে সাহেব হোরমসজীর বাড়ি থেকে সোজা বন্দরে গিয়ে জাহাজ ধরবেন। নূতন কলেক্টার তখনো আসেন নেই, তাই লাঞ্চের আমরা তিনজন— ব্রাউন, পুলিস-সাহেব ও আমি। তিনজনে হোরমসজী শেঠের বাঙলাতে গিয়ে পৌঁছলাম দেখি এলাহি ব্যাপার!

সামনের বাগানটাতে গাছ-গাছড়া যা-কিছু ছিল সব তুলে ফেলে দিয়ে সমুদ্রের ধারের উৎকৃষ্ট বালি ও কাঁকর দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে। তার উপর বোম্বাই থেকে আনানো সব পাথরের চাঙ্গড়া, ফুলগাছ, পাতাবাহার ও পাম-এর টব সাজিয়ে পাহাড়, নূতন ফুলের কেয়ারি, রাস্তা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। মাঝখানে ছোটোখাটো এক শামিয়ানা, তার ভেতরে জরির কাজ করা কালো রেশমের আস্তর। চারি দিকে লাল রেশমী পরদা, বাগানের পথগুলোর উপর লাল শালু ঢাকা। শামিয়ানাতে খাবার টেবিল সাজানো। আমরা তিনজনে খেতে বসলাম, শেঠজী কিছুতেই বসতে রাজী হলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাহেবদের গেলাসে শাম্পেন ঢালতে লাগলেন। খাবার রেঁধেছিল বোম্বাই এর Cornaglia কোম্পানী। তাদেরই একজন সাহেব ও দুজন খানসামা খাবার পরিবেশন করলে। অত জাঁকালো ও সুন্দর লাঞ্চ আমি আর কখনো খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। বোম্বাই থেকে String Band এসেছিল, তারা সারাক্ষণ বাজনা বাজাচ্ছিল। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বোম্বাই-এর একজন বড়ো পারসী Florist স্বয়ং মালা ও তোড়া নিয়ে এলেন। তোড়াগুলোতে দামী গোলাপ ও বহুমূল্য অর্কিডের ছড়াছড়ি। আমরা প্রথমটা এই-সব আলিক-লয়লা ব্যাপার দেখে থমকে গেছলাম। কিন্তু ক্রমশ সবই সয়ে গেল। দুশো আড়াইশো টাকার ফুল দেখেও আর আশ্চর্য লাগল না। যখন বন্দরের পানে তিনজন হেঁটে বেরোলাম তখন কারো মুখে কথা সরছিল না। হোরমসজীর অতিথিসৎকারের ফলে শরীর ও মন বিকল হয়ে গেছল। ব্রাউন শুধু এইটুকু বললে, "এর চেয়ে যে রোজ ওর মাছ মাংস পাউরুটি খাওয়া ছিল ভালো।" সেদিন হোরমসজী যে কত টাকা খরচ করেছিলেন তার আন্দাজ করাও কঠিন। আর সমস্তটাই একজন সামান্য একটি কলেকটারের জন্য, যার কাছ থেকে হোরমসজীর মতো বড়ো শেঠের আর কি লাভের আশা থাকতে পারে। আমাকে তিনি পরে বলেছিলেন, লাভের আশায় তো করি নেই, সাহেব। ব্রাউন একজন মানুষের মতন মানুষ। তাকে আমার শ্রদ্ধা জানালাম মাত্র।

১৪

যথাসময় মফস্বলে ঘুরতে বেরোলাম। আগেই বলেছি, আমরা সাধারণত চার-পাঁচদিন এক-এক ক্যাম্পে থাকতাম, তবে প্রত্যেক তহসীলের সদরে অন্তত

এক হপ্তা কাটাতে হত। কেননা মামলতদারের কাছারি, খাজনাখানা, পুলিস থানা ইত্যাদি দেখতে বেশ সময় লাগত। উরণে আবার পাহাড়ের উপর আমাদের এক ভারি সুন্দর বাঙলা ছিল। সেই বাঙলা থেকে সারা বোম্বাই বন্দরের দৃশ্যটা পটের মতন দেখা যেত। তাই ঠিক করেছিলাম যে সেখানে হপ্তা দুই আরামে ক্যাম্প করব, আর নৌকায় করে কাছাকাছি চারি দিকের গ্রামগুলো দেখব।

হোরমসজীর সঙ্গে কিছুদিন দেখাশুনো হয় নেই। কিন্তু উরণের আগের ডেরাতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন, আর ধরে বসলেন, "এতদিন তোমার হুকুমমতো, সাহেব, একটা কমলালেবু পর্যন্ত তোমাদিকে পাঠাই নেই। কিন্তু আমি বলতে এসেছি যে উরণের বাঙলাতে যতদিন থাকবে, তোমরা আমার অতিথি। আমি সব ব্যবস্থা করব।" আমি কত রকম ওজর আপত্তি তুললাম, কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই শুনলেন না, বললেন, "সকল হাকিমই উরণে আমার আতিথ্য স্বীকার করেন, কেউ আপত্তি করেন না। তোমরা মত না করলে আমার বড়ো কষ্ট হবে, হয়তো লোকের কাছে খাটো হতে হবে।" আমি সরকারী নিয়ম-কানুনের উল্লেখ করাতে তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার ইচ্ছা হয়, সাহেব, ভাত রুটি নুন নিজে কিনে খেও, কিন্তু আর যা যা দরকার, সব আমার বাড়ি থেকে আসবে। আমিও কিছু কিনে পাঠাব না, সাহেব, ভয় নেই। আমাকে ঘরেই সব জিনিসের বন্দোবস্ত রাখতে হয়।" আমি অগত্যা রাজী হলাম, কিন্তু ঠিক করলাম যে এ অবস্থায় এক হপ্তার বেশি উরণে ক্যাম্প করা হবে না। আমার স্থানীয় মেজিস্ট্রেট আশ্বাস দিলেন যে শেঠজী সত্যই এই ব্যবস্থা সকল হাকিমের জন্য করে থাকেন, তিনি অতি সজ্জন ব্যক্তি, সকলের সম্মানের পাত্র, অন্তরে কোনো ঘোর-প্যাঁচ নেই ইত্যাদি। আমার মনের খটকা যে ঠিক গেল, তা নয়। তবে ভাবলাম, এতবড়ো লোক, সাতদিনে কটা টাকাই বা খরচ করবে, আর আমার মতো চুনোপুঁটির কাছে ওর কিসের প্রত্যাশা!

উরণে পৌঁছে কিন্তু যা দেখলাম, তা একেবারে এলাহি ব্যাপার। জীবনে দু-চারবার স্বাধীন রাজা-রাজড়ার অতিথিও হয়েছি, কিন্তু এই দরের আশ্চর্য অতিথিসংকার কোথাও দেখি নেই। শেঠের নিজের পুকুরের মাছ, তাঁর গৃহ-পালিত ভেড়ার মাংস, তাঁর বিস্তৃত ক্ষেতের তরি-তরকারি, তাঁর বাগানের ফল, রোজ দুবেলা আসতে লাগল। তাঁর চাকর-বাকর ঝোপে, বিলে, জলায়, ঘুরে

ঘুরে বুনো হাঁস, তিতির, স্নাইপ মেরে এনে দিতে লাগল। শেঠ নিজে দুটি বেলা চুপি চুপি এসে চাকরদের কাছে খোঁজ নিয়ে যেতেন, সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না। এই রকম রাজার হালে সাত-আট দিন কাটানো গেল। বোম্বাই থেকে এক-আধজন সাহেব-সুবো বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করলাম, তাঁরাও আমার শেঠজীর আতিথেয়তা ও তাঁর বিনীত আদব-কায়দা দেখে মোহিত হয়ে গেলেন।

উরণে পৌছানর পরদিন শেঠ তাঁর বসত-বাড়ি দেখতে নিয়ে গেলেন। প্রকাণ্ড বাগানের মাঝে সুন্দর আধুনিক একখানি বাঙলা। তার আসবাবপত্র শৌখিন ও বহুমূল্য। বাগানে রকম-রকমের ফুলের কেয়ারি, দেশ-বিদেশের ফলের গাছ, মায় চীন মুলুক থেকে আমদানী লিচু ও লকেটের কলম। চারি-দিকে লাল কাঁকরের পথ। ঠিক মাঝখানে বাঙলার সামনেই একটি পুরানো ভাঙা গোছের ঘর, তার ছাদ খোলার, দেওয়াল চুনকাম করা মাটির। সেই ঘরে শেঠজী আমাদিকে আগে নিয়ে গেলেন। ভেতরে দুটি কুঠরী। পিছনের কুঠরীতে দেখলাম এক জীর্ণ উনুন, আর মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে এক প্রকাণ্ড শিল-নোড়া। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম, "এ আবার কি!" হোরমসজী একটু হেসে বললেন, "সাহেব, এইখান থেকেই আরম্ভ। ছেলেবেলায় ওই শিল-নোড়াতে আমি মসলা পিষতাম, এই বাবুর্চিখানাতে তিন টাকা মাইনের চাকর ছিলাম। আজ খোদার কৃপায়, আর সরকারের মেহেরবানিতে, আমার কোনো অভাব নেই। তবে কি ছিলাম তা ভুলতে পারি না। খোদা যা দিয়েছেন তা পাঁচজনকে দিয়ে তবে আপনি খাই।" শুনলাম যে বোম্বাই-এর লাটসাহেব লর্ড রে-কেও শেঠজী একদিন বাবুর্চিখানা ও শিল-নোড়া সগর্বে দেখিয়েছিলেন।

উরণে হোরমসজীর দয়াদাক্ষিণ্যের নিদর্শন অনেক কিছু দেখেছিলাম। কিন্তু সব চেয়ে চমৎকার লেগেছিল তাঁর পারসী Sanatorium, আরোগ্য-ভবন। মস্ত বড়ো বাড়ি, যত দূর মনে আছে, তেতলা। ভেতরে অনেকগুলি পারসী পরিবারের থাকবার ব্যবস্থা। প্রত্যেক Flat বা কুঠরী সুদৃশ্য আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো, পর্দা, বিছানা, টেবিল-ঢাকা পর্যন্ত। রাঁধবার ও খাবার ইংরেজি ধরনের প্রচুর বাসন-পত্র! বাঁধা মাইনের লোকজন হামেহাল হাজির। অথচ এই সব ব্যবস্থা কার জন্য, না, আপন সমাজের দরিদ্র দুঃস্থ পরিবারের জন্য!

একটু আলাপ-পরিচয় হবার পরে আমার স্ত্রী হোরমসজীকে ধরে বসলেন,

"শেঠজী, একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে হবে।" ভদ্রলোক প্রথমে কিছুতেই ধরা ছোঁয়া দেন না। আমার স্ত্রীও ছাড়বার পাত্র নন! বললেন, "আপনি আমাদের এত যত্ন করছেন। আর আমি একদিন আপনাকে রেঁধে খাওয়াব মনে করেছি, আপনি খাবেন না! এ আপনার ভারি অন্যায়।" শেষ, ভদ্রলোক হাসতে হাসতে ধীরে ধীরে বললেন, "আমি সাহেব-সুবোর সঙ্গে তো কখনো খাই না। কিন্তু আপন লড়কীর কাছে কেন খাব না! আচ্ছা মায়ি, আসব।" খুব আমোদ করে একদিন সন্ধ্যাবেলায় খেয়ে গেলেন। সেদিন হোরমসজীর এক ভিন্ন রূপ দেখলাম। এতটুকু লজ্জা সংকোচ নেই, যেন আপন বাড়ির অল্প-বয়স্ক ছেলেপিলের সঙ্গে বসে আমোদ করে খাচ্ছেন! রান্নাবাড়া নিয়ে কত টীকা-টিপ্পনী কাটলেন, বললেন, তুমি বড়োলোকের মেয়ে, এত রাঁধতে শিখলে কোথায়? আমাদের হালফেশানের পারসী মডামরা তো এ-সব কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে!" শ্যাম্পেন যা আনিয়েছিলাম, একটু খেলেন। ঠাট্টা করে বললেন, "একটা বুড়োকে খাওয়াবার জন্য কত পয়সা নষ্ট করলে, মায়ি!"

কিন্তু মজার কথা এই যে পরদিন থেকে হোরমসজীর সে রূপ আবার অন্তর্ধান হল। সেই পূর্ববৎ বিনয় ও সমীহ। আশ্চর্য ক্ষমতা, নয়? কিছুদিন পরে আমার বদলির হুকুম এল। বদলি হল নিকটবর্তী ঠানা জেলাতে। হোরমসজী ধরলেন, উরণে তাঁর বাড়িতে এক পেয়ালা বিদায়ী চা খেয়ে যেতে হবে। আবার গেলাম দুদিনের জন্য উরণে। এক পেয়ালা চা কিন্তু দাঁড়াল এক বিশাল পার্টিতে। প্রায় শ-দুই লোক। শুধু উরণের নয়, বোম্বাই শহরের নানা সম্প্রদায়ের বড়ো বড়ো লোক কত এসে উপস্থিত হলেন। সাহেব মেমের তো অভাব ছিলই না! কোথা থেকে দিল্লীর সাবেক বাদশাহী বংশের এক মোগল শাহজাদাকেও সংগ্রহ করে এনেছিলেন। রসদ সরবরাহ করলেন বোম্বাই-এর কর্নেলিয়ারা। বিরাট ব্যাপার সেই টি-পার্টি। কত আর বর্ননা করব! আমি ঠাট্টা করে চুপি চুপি শেঠকে বললাম, "শেঠজী, পার্টিটা কাকে দেওয়া হল; প্রান্ত হাকিমকে, না তোমার লড়কীর স্বামীকে?" বৃদ্ধ একটু একটু হাসলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

আলিবাগ থেকে ঠানা পর্যন্ত আমাদের মালপত্র খাড়ির পথে নৌকায় যাবে, এই ঠিক হয়েছিল। নৌকার ব্যবস্থা করবার ভার ছিল আমার আপিসের উপর। একদিন আমার সেরেস্তাদার এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে হোরমসজী শেঠের

নৌকাতে মাল পাঠানোতে কোনো আপত্তি আছে কি? আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, "না, সে কাজ নেই, আপনি নৌকা ভাড়া করুন।" সেরেস্তাদার উত্তর দিলেন, "তিনিও ভাড়া নিতে প্রস্তুত আছেন। আমাদের আপিসে এসে বসে রয়েছেন, একবার ডাকব?" শেঠ এসে হাসতে হাসতে বললেন, "আমি নৌকা ভাড়া দিয়ে দুটো পয়সা রোজগার করব, তাতে তোমার আপত্তি কি, সাহেব?" আমি আর কি বলব, চুপ করে রইলাম! তখন বৃদ্ধ একটু হেসে আবার বললেন, "লড়কীর অত সাধের বাসনপত্র ভাড়া নৌকায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে যে! আমার মাঝি মাল্লাদের প্রাণের ভয় আছে, তারা সব সামলে নিয়ে যাবে। ভাড়া আমি যথারীতি রসিদ দিয়ে নিয়ে নেব। তোমার কোনো ভাবনা নেই।" বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ আপন জিদ-মত কাজ করলেন। মালপত্র ঠানায় নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিলেন। তাঁর লড়কীর সামান্য একটা গেলাস কি পেয়ালা অবধি ভাঙে নেই।

ঠানাতে আমি বছর চারেক ছিলাম। হোরমসজী শেঠ বার দুই তিন দেখা করে গেছলেন। তবে ঐ সময়টা থেকে আমি নানা ধান্দা নিয়ে এত মশগুল ছিলাম, যে তাঁর সঙ্গে কোনো রকম ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারি নেই। তার পরের কয়েক বছর আমাদিকে বোম্বাই ও উরণ থেকে বহুদূরে কাটাতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে হোরমসজীকে মনে পড়ত বটে, কিন্তু কখনো পত্রাদি লিখি নেই। ভাবতাম, বৃদ্ধ বোধ হয় আমাদিকে ভুলে গেছেন।

১৯১৭ সালের শেষের দিকে আমার খান্দেশ হতে রত্নাগিরি বদলির হুকুম এল। এত বৎসর পরে ফের আরব সমুদ্রের সঙ্গে কারবার! ইতিমধ্যে পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি অনেক ঘুরেছি। নানারকমের হায়রানিও কম হয় নেই। আবার সমুদ্রের কিনারে এক ছোট্ট শহরে বাস করব, মনে করে বেশ আরাম বোধ হচ্ছিল। কিন্তু সেখানে ঘরকন্না মাথায় করে পৌঁছানই যে এক দায়! সারারাত্রি রেলপথ, আবার দুশো মাইল খোলা দরিয়াতে পাড়ি। স্থির হল যে আসবাব-পত্র বোম্বাই পর্যন্ত মালগাড়িতে, তার পর সেখান হতে নৌকাতে যাবে। কিন্তু দূর থেকে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো সহজ নয়! কি করি, আমার এক বন্ধু বোম্বাই Customs-এ বড়ো চাকরে ছিলেন, তাঁর ঘাড়ে সমস্ত ভার চাপিয়ে দিলাম। তখন কি জানি যে আমার বৃদ্ধ বন্ধু হোরমসজী উরণে বসে আমার দুঃখের কথা ভাবছেন!

খান্দেশ থেকে রওয়ানা হওয়ার আগে একদিন এক বয়স্থ পারসী ভদ্রলোক

দেখা করতে এসে উপস্থিত হলেন। কার্ডে তাঁর পরিচয় লেখা ছিল— খান বাহাদুর হোরমসজীর বোম্বাই আপিসের কর্মচারী। তিনি বললেন, "শেঠজী কাগজে আপনার বদলির খবর দেখে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। হুজুরের মালপত্র রত্নাগিরি নিয়ে যাবার জন্য আমাদের দুখানা বড়ো নৌকা বন্দরে প্রস্তুত রেখে এসেছি। হুকুম পেলেই মাল রেল থেকে বার করে নিয়ে নৌকাতে বোঝাই করব।" আমি ভদ্রলোককে জানালাম যে মাল সম্বন্ধে সমস্ত ভার নিয়েছেন আমার বন্ধু, গান্ধীসাহেব। তিনি বললেন, "আমি গান্ধীসাহেবের কাছে যাব। শেঠজী নিবেদন করেছেন যে তিনি নৌকোর পুরো ভাড়া নিতে প্রস্তুত। আর এক কথা, হুজুর, রত্নাগিরি জেলাতে আমাদের কোনো কাজ-কারবার নেই।" আমি লোকটিকে মিষ্ট কথায় বিদায় করলাম, ও তাঁর মারফতে হোরমসজী শেঠকে অনেক অনেক সেলাম পাঠালাম। পরে গান্ধীর পত্রে খবর পেলাম যে শেঠের নৌকা নিতে হয় নেই, আগেই অন্য নৌকার ব্যবস্থা করা হয়ে গেছল। একটু আশ্বস্ত বোধ করলাম। বড়ো লজ্জা করছিল হোরমসজীর নৌকা নিতে! এত বছর তাঁকে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখি নেই, অথচ বৃদ্ধ আমার খবর সব রেখেছেন।

সে যাই হোক, কয়েক দিন বাদে যখন ভিক্‌টোরিয়া টার্মিনাসে নামলাম, দেখি সেই পারসীটি প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সঙ্গে একটি ছোকরা ও অনেক লোকজন। ছোকরাটি একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, "আমি খান বাহাদুরের নাতি। তিনি আপনাদিকে অভ্যর্থনা করতে আসতে পারলেন না বলে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। আজকাল তিনি বড়ো দুর্বল হয়ে পড়েছেন, চোখেও দেখতে পান না, আর উরণ ছেড়ে বেরোবার শক্তি নেই।" শেঠজীর চিঠিখানাও সেই মর্মে লেখা। ছেলেটি আরো বললে যে তার দাদার হুকুমে সে দুখানা মোটর নিয়ে এসেছে, আমরা যে কদিন বোম্বাইয়ে থাকব যেন আমরা ব্যবহার করি। আর, যদি আমাদের একবার উরণে পদার্পণ করার সুবিধা হয় তো সে সব ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবে। আমরা একখানা গাড়ি রাখলাম, আর শেঠজীকে লিখে জানালাম যে ভবিষ্যতে যখনই বোম্বাইয়ে দুই-এক দিন থাকতে আসব একবার উরণে গিয়ে তাঁকে সেলাম করে আসব।

কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল যে শেঠের সঙ্গে আর দেখা হল না। বোম্বাইয়ে দুই-একদিন থাকতে আসার সুবিধা আর কখনো করে উঠতে পারি নেই। তবে

এইটুকু সন্তোষ মনে রয়েছে যে একজন যথার্থ মানুষের মতন মানুষ দেখেছি, যিনি parvenu (হঠাৎ নবাব) হলেও উদার, মুক্তহস্ত ও হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন।

পাঠককে, বোধ হয়, বলা হয় নেই যে ঠানাতে আমি জজিয়তি করতে এলাম। অবশ্য শিক্ষানবীশ রূপে। আইন-কানুন তো বিশেষ কিছু পড়া হয় নেই ইতিপূর্বে! শেখার অনেক কিছু বাকি ছিল। কিন্তু যে শিখবে তার আগ্রহ থাকা চাই, আর তার চেয়েও বেশি থাকা চাই ambition, আপন শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের প্রবল ইচ্ছা। আমাব দুটোরই একান্ত অভাব। একে তো প্রথম থেকেই চাকরির মোহ ছিল না। তার উপর আবার জজিয়তি! ইংরেজি আদালতে মামলাবাজী যে গরিবের পক্ষে নিতান্তই ঘোড়া রোগ এটা বেশ বুঝেছিলাম! এতদিন মনের আনন্দে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, গ্রামে গ্রামে গরিব-দুঃখীর অভাব অভিযোগের কথা নিজের কানে শুনছিলাম, যথাশক্তি তাদের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টাও করছিলাম। সময়ে সময়ে মনেই থাকত না যে মাথার উপর বড়ো বড়ো হাকিম আছে, প্রবল-প্রতাপ বৃটিশ সরকার আছে। পদগৌরবে যে মশগুল হয়ে ছিলাম তা ঠিক নয়, তবে নিজেকে কতকটা এই রকম ভুলিয়ে রেখেছিলাম যে পরের চাকর হলেও আমি দেশসেবাই করছি। যাক, মোহবন্ধন কর্তারাই খসিয়ে দিলেন। লাটসাহেবের খাস মুনশীর চিঠিতে বদলির হুকুম পেয়ে মেজাজটা এমনই বিগড়ে গেল যে চিঠিখানার একটা মামুলি উত্তর দেওয়া পর্যন্ত হল না। কেবলই মনে হতে লাগল যে আমি গ্রামের গরিবগুরবোকে বড়ো বেশি আপনার লোক ভাবি বলে আমাকে নির্বাসিত করা হচ্ছে। আর পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরতে পাব না, চাষাভুষোদের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক থাকবে না, উদয়াস্ত কলম পিষতে হবে! মনের এই অবস্থা নিয়ে কি আর কখনো Civil Procedure Code অধ্যয়ন হয়! আইন শেখা হলই না। একটা নিতান্ত হাতুড়ে শ্রেণীর জজ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু তাতে আমার সত্যি কোনো দুঃখ নেই। আপন বুদ্ধিমত মোটামুটি কাজীর বিচার বরাবরই করে এসেছি। কর্তাদের চোখে ভেলকি লাগানো আমার অদৃষ্টে নেই, হবে কোথা থেকে। তবে এ-সব আরো পরের কথা। প্রথমটা আনাড়ির মতো কত ভুল করেছি! প্রবীণ উকিল মোক্তার, সবাই আমাকে সে সময় নানা রকমে সাহায্য করেছিলেন। কেউ কোনো দিন ফাঁসাতে চেষ্টা করেন নেই।

আমার বৃদ্ধ জজ রাও সাহেব টিপনীস-এর তো কথাই নাই! তিনি আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুরুজন ছিলেন, তাঁর স্নেহ, আদর যত্ন, আমাদিকে ভুলিয়ে দিয়েছিল যে আমরা বাঙালী, পরদেশী। ক্রমশ তাঁর কথা ও ঠানার অন্যান্য বন্ধুদের কথা কিছু কিছু বলব।

ঠানা শহরটিকে বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠ বললেও ভুল হয় না। রেলে সবে ঘণ্টা খানেকের রাস্তা। আলীবাগও দূরে ছিল না বটে, তবে জলপথ। কথায় বলে তো, একা নদী বিশ কোশ! ঠানাতে বাস করতে এসে অতি সহজে বোম্বাই শহরের সঙ্গে একটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হল। প্রায়ই শনিবার রবিবার সেখানে কাটাতাম। কখনো বা হোটেলে, কখনো বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে। হিন্দু, মুসলমান, পারসী, সকল রকম সমাজের লোকের সঙ্গেই মেলামেশা ছিল। অনেক দেশবিশ্রুত বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। যথাস্থানে তাঁদের কথাও একটু আধটু বলবার ইচ্ছা রইল।

কিন্তু বিভ্রাটও একটা ঘটল বিশেষ রকমের। আমাদের মফস্বলের আমলা মহলেব এই সাধারণ নিয়ম ছিল যে কেউ কার্যসূত্রে রাজধানীতে এলে আপন উপরওয়ালা বড়ো কর্তাকে সেলাম করে যেতে হত। তবে শুধু সেলাম বাজাবার জন্য কার্যস্থান ছেড়ে বোম্বাইয়ে কেউ আসত না। কিন্তু ঠানার আমলাদের বেলা ব্যবস্থা ছিল অন্য রূপ। তাঁদিকে নিয়মিত বছরে একবার করে কালো পোশাক পরে কর্তাদের আপিসে কার্ড ছেড়ে আসতে হত। জজ বেচারাদের আবার বেশি মুশকিল ছিল, কেননা তাঁদের দুই মনিব, সেক্রেটারিয়েট ও হাইকোর্ট। এ প্রথা সম্বন্ধে আমি যে ঠিক অজ্ঞ ছিলাম তা নয়, তবে আমার কেমন কার্ড ছাড়তে যাওয়া ঘটে ওঠে নেই। কতকটা কুঁড়েমি, আবার কতকটা একগুঁয়েমিও ছিল। বছরখানেক কেটে যাওয়ার পর একদিন হাইকোর্টের বড়ো কর্তা আমার রাও সাহেবকে বললেন, "ওহে তোমার বাঙালী ছোকরাটি তো আমার কাছে একবার এল না! পাঠিয়ে দিও তাকে।" এই বড়ো সাহেব একজন বিখ্যাত, বিচক্ষণ ও বিদ্বান লোক ছিলেন। কলকাতাতে পরে জজ হয়ে এসেছিলেন। অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করত। তবে বোম্বাইয়ে তাঁর খোশামদপ্রিয় বলে একটা বেশ দুর্নাম রটে গেছল। এটা আমার জানা ছিল। কাজেই রাও সাহেবের মুখে কর্তার হুকুমের কথা শুনে আমারও কেমন মাথায় জিদ চেপে গেল,

কক্ষণো দেখা করতে যাব না! সত্যি বলতে কি, আমি এই সেলাম করতে-বোম্বাই শহরে যাওয়াটা শেষ পর্যন্ত রপ্ত করতে পারি নেই। কিন্তু অন্য কেউ তো এই L. J-র মতো ও-সব ছোটো কথা মনে করে রাখতেন না! অথচ ইনি একটু সুবিধা পেয়েই আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করলেন। গল্পটা আজ আপনাদিগকে শোনাব। তার আগে একটা ছোটো গল্প বলবার প্রয়োজন। তার থেকে পাঠক বুঝবেন যে সকল বড়ো কর্তার প্রকৃতি এক রকমের হয় না। সবাই L J. নন।

একদিন আমি বোম্বাই যাচ্ছি। স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়াতেই দেখি এক কামরায় আমার এক বন্ধু ব্যারিস্টার রুস্তমজী যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি সেই কামরাতে উঠে পড়লাম। আর দুজন প্যাসেঞ্জার ওপাশের বেঞ্চে বসেছিলেন। একজন এক পারসী এটর্নী, তাঁর সঙ্গে রুস্তমজী আলাপ-পরিচয় করে দিলেন। অন্যজন এক বিশালকায় লালমুখো সাহেব, কাদা-মাখা খাকি পোশাক পরা, পাশে একটা দোনালা বন্দুক, পায়ের কাছে কতকগুলো মরা হাঁস ও কাদাখোঁচা পাখি। বোধ হল, শিকারশ্রান্ত। কেননা দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছিলেন। আমরা বাকি তিনজন খুব গল্প জুড়ে দিলাম। রুস্তমজী লোকটি সাধারণত খুব বাক্যবাগীশ, আমার চেয়ে বেশি বই কম নয়। কিন্তু সেদিন মনে হল যেন একটু সংযত ভাবে কথাবার্তা কইছেন। আমি কিন্তু দুজন ব্যারিস্টার এটর্নীকে সামনে পেয়ে খুব মুখ ছুটিয়ে দিয়েছিলাম। হাইকোর্টের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যা-তা বলছিলাম। জজ-বাহাদুরদের নাম ধরে টীকা-টিপ্পনীও খুব কাটছিলাম! টীকার নমুনা একটু দিই, তা হলেই পাঠক বুঝবেন। "কি হে রুস্তমজী, চীফ সাহেব কেমন চালাচ্ছেন? তাঁর কাছে খুব দুবেলা গিয়ে সেলাম বাজাচ্ছ তো!" "তোমাদের চ-সাহেব না কি এখনো জজের আসনে বসে sermon ঝাড়েন, আর প্রার্থনা সমাজের বেদীতে বসে judge-ment দেন!" "আর তোমাদের রাসেল, এখনো কোর্টে বসে আগের মতো ঘুমান তো! তা, কি করবেন বেচারা, যা তাঁর দেহের ভার!" রুস্তমজী দু-চার বার আমার পায়ে যেন লাথি মারলে মনে হল, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না। বোম্বাইয়ের Byculla স্টেশনে গাড়ি থামতে সেই প্রকাণ্ড সাহেবটি দাঁড়িয়ে উঠলেন। হাসিমুখে "Well, bye bye, Rustomji" বলে বন্দুক হাতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। সাহেব নেমে যাওয়া মাত্র রুস্তমজী

আমার পিঠে এক প্রচণ্ড চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! ও কি সব বকছিলে জজ-সাহেবের সামনে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কে, কোন্ সাহেব?"

উত্তর এল, "ওই যে বেরিয়ে গেলেন— জজ রাসেল-সাহেব। চেন না?"

আমি বললাম বটে, "আমি কোথা থেকে চিনব। তোমাদের মতন তো আমি ওদের বাড়ি যাওয়া আসা করি না!" কিন্তু মনে মনে যথেষ্ট লজ্জা ও ভয় হল। তবে আবার ভাবলাম শিকারী মানুষ, sportsman, ও ছোটোপনা কিছু করবে না। সত্যই কিছু করেন নেই। মাসখানেক বাদে একদিন হাইকোর্টের বারান্দায় বন্ধু রুস্তমজীকে হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার বন্ধু, ঠানার সেই ছোকরা জজটি, কেমন আছে হে?"

এর মাস ছয়েক পরে একদিন দুর্দৈবক্রমে এক কর্নেল সাহেবের সঙ্গে আমার একটু খিটির মিটির বাধল। ব্যাপার অতি তুচ্ছ। L. J. বড়ো কর্তা না থাকলে কোনো গোলই হত না। তিনিই তিলকে তাল করে তুললেন। আর জেরটা যে অল্পে মিটল, তা প্রধানত রাসেল সাহেবের জন্য। অথচ দুজনারই আমার উপর নারাজ হবার সমান কারণ ছিল, বরং সেই রেলের ব্যাপারের পরে রাসেল সাহেবের বেশি ছিল। আচ্ছা, ঘটনাটা বলি। আমি তখন অল্পদিনের জন্য জেলা জজ হয়েছিলাম। আমার এজলাসে গোটা পনেরো সরকারি মোকদ্দমা চলছিল। সব মোকদ্দমাগুলোতেই ভারত সরকার প্রতিবাদী, আর বাদী বোম্বাই শহরের নানা বড়ো বড়ো লোক। বাদীপক্ষের কৌসুলী ছিলেন মোদী, আর সরকার পক্ষে অ্যাডভোকেট-জেনেরাল জার্ডিন। কৌসুলীদেরই সুবিধার জন্য তাঁদের অনুরোধে স্থির হয়েছিল যে রোজ পৌনে বারোটার সময় আদালতের কাজ আরম্ভ হবে। C. নামক এক কর্নেল একটা মোকদ্দমাতে সাক্ষী ছিলেন। শুনানির প্রথম দিন উপস্থিত থাকবার জন্য জার্ডিন তাঁর নামে সমন বার করিয়েছিলেন। সমনে হাজরির সময় রেওয়াজ-মতো সাড়ে দশটা দেওয়া হয়েছিল। আরো দুচারজন কর্নেলকেও ঐ দিনে ঐ সময়ে ডাকা হয়েছিল। তাঁরা সমন পেয়ে আপন কৌসুলীর সঙ্গে এই ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন যে দরকার পড়লেই তাঁদিকে টেলিগ্রাম পাঠানো হবে। বুদ্ধিমান C. সে রকম কিছু না করে নির্দিষ্ট দিনে সাড়ে দশটার সময় আদালতে এসে হাজির হলেন। বোম্বাই থেকে তাড়াহুড়ো করে রেলে এসেছিলেন। কে জানে,

হয়তো তাঁর নিত্য কার্যের কিছু ব্যাঘাতও ঘটে থাকবে। কিন্তু তাঁর তো বোঝা উচিত ছিল যে ভারত সরকারের মোকদ্দমাতে এজাহার দিতে আসাও তাঁর একটা অবশ্যকর্তব্য কাজ! তাঁকে সাক্ষী বলে টেনে আনার জন্য দায়ী Secretary of State, ভারতসচিব, আমি নয়। সে যাই হোক, তিনি যখন সাড়ে দশটায় কাছারিতে পৌঁছলেন, আর দেখলেন কেউ কোথাও নেই, না জজ, না ব্যারিস্টার, তখন চটে আগুন হয়ে গেলেন। একেবারে আমার বাড়ি চড়াও হয়ে এসে আমাকে শাসালেন, "আপনি কি জানেন না যে আমি একজন responsible officer, পদস্থ কর্মচারী! আমি আমার ন্যায্য কাজ-কর্মের যথেষ্ট ক্ষতি করে ঠিক সাড়ে দশটার সময় আপনার কোর্টে এলাম, আর আপনি পায়জামা পরে বসে রয়েছেন। আমি বোম্বাই ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু এ বিষয়ে গভর্নমেণ্টের কাছে নিশ্চয় রিপোর্ট করব।" আমি খুব ভদ্রভাবে কথা-বার্তা কইতে আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু এরকম উচ্ছ্বাস বরদাস্ত করি কি করে! বললাম, "আপনি যার কাছে খুশি রিপোর্ট করবেন। কিন্তু এখন আদালতে অপেক্ষা করুন গিয়ে। এইটুকু সাবধান করে দিচ্ছি যে আমি আদালতে এসে আপনাকে দেখতে না পেলে বিষম বিপদে পড়বেন। যান এখন, আমার সময় নষ্ট করবেন না।" সাহেব আরো রেগে উঠলেন, "আমি সারাদিন তো আপনার জন্য বসে থাকতে পারি না। আপনি কটার সময় কাছারিতে আসবেন, বলে দিন।" আমি খুব শান্ত ভাবে উত্তর দিলাম, "দেখুন, আপনি আমার আদালতে সাক্ষী মাত্র। সাক্ষীর কাছে জজে কৈফিয়ৎ দেয় না। যান, কোর্টে গিয়ে অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ না আপনার ডাক পড়ে।"

পৌনে বারোটায় এজলাসে গিয়ে বসলাম। দেখি জার্ডিনের পেছনে কর্নেলটি বসে রয়েছেন। আমি বললাম, "মিস্টার অ্যাডভোকেট-জেনেরাল, আপনার একজন সাক্ষী এখনই বোম্বাই ফিরে যেতে চান। তাঁর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করবেন!" জার্ডিন তখনকার মতো হেসে উত্তর দিলেন, "আমি ওঁকে আজ ছেড়ে দিচ্ছি। দরকার হলেই হাজির করব।" কিন্তু টিফিনের সময় দেখা করে বলে গেলেন, "লোকটা অত্যন্ত বদমেজাজী। শুনলাম আপনার বাঙলা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। আমি অতীব দুঃখিত, আমাকে মাপ করবেন! মোকদ্দমা দুই একদিন চললেই বুঝবেন যে এই ব্যক্তির খামখেয়ালী কাজের জন্য সরকার কতটা বিপদে পড়েছেন।" সত্যই তাই। পরে দেখলাম যে লোকটা হাকিমী

পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যা খুশি করেছে। কাঠগড়ায় খাড়া করে ওকে মোদী সাহেব এমন নির্দয় ভাবে জেরা করতে লাগলেন যে আমাকে বারবার ওর মান ইজ্জৎ রক্ষা করতে হল। যাবার সময় আমাকে বিনয় করে সেইজন্য ধন্যবাদ দিয়েও গেল। আমি মনে করলাম যে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার খেয়াল তা হলে ছেড়ে দিয়েছে! মস্ত ভুল, মোটেই ছেড়ে দেয় নেই। প্রথম গেল বেচারা সেক্রেটারিয়েটে। সেখানে একেবারে আমল পেলে না, সেক্রেটারির তাড়া খেয়ে পালাতে হল। তার পর গিয়ে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হল। সেখানে তো L. J. কর্তা! তিনি আগ্রহ করে তার নালিশ লিখে নিলেন, ও পত্রদ্বারা আমার কৈফিয়ৎ তলব করলেন। আমি কৈফিয়ৎ দিলাম। উপরে যা লিখেছি সেই কথাই সোজাসুজি জানালাম। তার উপর কর্তা আর কি বলবেন! শুনলাম, চেম্বারে রাসেল বলে উঠেছিলেন, "আমি তো তোমাকে বলেছিলাম J, যে দোষ নিশ্চয়ই কর্নেলের। জজ খামখা অন্য লোককে অপমান করতে যাবে কেন!" L. J. কিন্তু তখন আমাকে ছাড়লেন না, আবার আদেশ করলেন, "পৌনে বারোটায় কেন কোর্ট বসেছিল, ঠিক সাড়ে এগারোটায় কোর্ট আরম্ভ করাই তো বাঁধা নিয়ম!" আমি খুব বিনয় করে, অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করে নিবেদন করলাম যে উক্ত নিয়মের মর্ম এই যে "সাধারণত" সাড়ে এগারোটায় কোর্ট বসবে, অর্থাৎ কোনো বিশেষ কারণে একটু আধটু সময়ের ফেরফার করার অধিকার জজের আছে। এবার শুনলাম, রাসেল সাহেব জোর করে এ বিষয়ে আর লেখালেখি করতে দিলেন না। পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে আমি চীফের চেম্বারের ঘটনাবলী কি করে জানলাম। কিন্তু চেম্বারে তো শুধু চীফ ও রাসেল ছিলেন না, আরো অনেক লোক ছিলেন। তাঁদেরই কাছে শুনেছিলাম। এত কালের পুরানো ব্যাপার বলে আজ প্রকাশ করলাম।

আচ্ছা, এই যে ঘটনার কথা বললাম এতে কি কোনো racial complex আছে মনে করেন? মোটেই নেই! C. যদি আমার স্বদেশী হতেন তা হলেও ঠিক এইরকমই হত, আর জজ C.র স্বদেশী হলে ব্যাপারটা আরো গুরুতর দাঁড়াত। L. J. আমার স্বদেশী নন বটে, কিন্তু রাসেলও তো ইংরেজ! কাজেই কারোই ব্যবহার জাতিদম্ভ বা জাতিমাৎসর্যজনিত বলা যায় না, প্রকৃতিগত।

১৬

আমার এই নূতন জেলা কুলাবার মতনই উত্তর কোকনের অন্তর্গত। পূর্ব দিকে সহ্যাদ্রির থলঘাট হতে আরম্ভ করে পশ্চিমে আরব সাগর অবধি বিস্তৃত। সমুদ্রকূলে বান্দরা, আন্ধেরী, সান্তাক্রুজ, জুহু ইত্যাদি কত সুন্দর সুন্দর জনপদ গড়ে উঠছিল। জুহুকে তখনো পাড়া-গাঁ বলা চলত। তবে, বেলাভূমি খুব বিস্তীর্ণ ও সুন্দর বলে বোম্বাই থেকে সাংবেসুবো মানুষ সেখানে খুব সমুদ্রস্নান করতে আসতেন। এই স্থানটির নাম পাঠক নিশ্চয়ই শুনেছেন। মহাত্মাজী ফাটক থেকে বেরিয়ে স্বাস্থ্যের জন্য কিছুকাল এখানে বাস করেছিলেন। ক্ষুদ্র জুহু সেই কয়েক সপ্তাহ ভারতের একটি পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল! হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত সকল প্রদেশের জননেতারা মহাত্মা দর্শনের জন্য রোজ দলে দলে আসা যাওয়া করছিলেন। মহাত্মার আবাসের সাজসরঞ্জাম ছিল নিতান্ত সাদাসিধে রকমের। আগন্তুকমণ্ডলীর সবাই বসতেন ঘরের মেজের উপর মহাত্মাজীকে ঘিরে। একদিন এইরকম সবাই বসে রয়েছেন। পণ্ডিতজী রয়েছেন, দেশবন্ধু রয়েছেন, রাজাগোপালাচারী রয়েছেন, আরো ছোটো বড়ো অনেক নেতাও রয়েছেন। সবাই খদ্দর পরিহিত। এমন সময় ইংরেজি পোশাক পরে গট গট করে এসে দাঁড়ালেন দরজাতে জিনা সাহেব। কংগ্রেসের সঙ্গে এই মুসলমান নেতার বিচ্ছেদ হয়ে গেছল অনেক দিন আগেই। তাই তাঁর বিজয়ী বীরের মতো মেদিনী কাঁপিয়ে হঠাৎ এসে পড়াতে সকলেই আশ্চর্য হলেন। হয়তো কারো কারো একটু সংকোচ বোধ হয়েও থাকবে। গান্ধিজী ঈষৎ হেসে বললেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের কাজ শেষ হল বলে।" তার পর সবাইকে অন্য কামরায় সরে যেতে বলে দুচার মিনিট বাদে জিনা সাহেবকে ডাকলেন। সাহেব বোধ হয় একটু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কেননা, রূঢ়ভাবে উত্তর দিলেন, "মিস্টার গান্ধী, আপনি বোধ হয় আশা করেন না যে এই পোশাক পরে আমি মেজের উপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসব!" মিস্টার গান্ধীর মুখে সেই অমায়িক হাসি। চেঁচিয়ে বললেন, "মহাদেব ভাই, জিনা সাহেবকে স্নানের ঘর থেকে একটা জল-চৌকি বার করে দাও তো!" এর পরে আর জিনা-গান্ধী বৈঠক তেমন জমল না।

গল্পটি আমি সম্প্রতি শুনেছি মাত্র। শুনে কত পুরানো কথাই মনে

হয়েছিল! ১৯০৫-৬ সালে আমার ঠানার বাঙলাতে, কি বোম্বাইয়ে জিনার বাসাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বসে দেশ-উদ্ধারের জল্পনা-কল্পনা— ১৯১৬-১৭ সালে হোম রুল সঙ্ঘের কাজ নিয়ে আলোচনা ও জিনার জলন্ত উৎসাহ— তার পর ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসের আগে তাঁর গর্ব, "আমি আমার সঙ্ঘের লোকজন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, চিত্তও কলকাতা থেকে তার ছেলেদিকে নিয়ে আসছে। এবার দেখবে, মহাত্মা ও মৌলানার দলকে পিষে মারব।" পিষে মারবার ব্যবস্থাটা যে গুলিয়ে গেল তা সবাই জানেন। জিনা কিছুদিন মান করে একান্তে বসে থেকে শেষ মোসলেম লীগ-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু যাই করে থাকুন, আমার এই বন্ধুটি যে দেশকে যথার্থ ভালোবাসেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আসল কথা, জিনা দারুণ অভিমানী। আত্মসম্মানে এতটুকু ঘা বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁর মতো পুরানো কংগ্রেস-কর্মীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে মহাত্মাজী যে মহম্মদ আলিকে আপন করে নিলেন, এটা তিনি সইতে পারলেন না।

আমার ঠানা প্রবাসের সময় মহম্মদ আলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। সে সময়ে তিনি ঘোর Pan-Islamic-ভাবাপন্ন ছিলেন। ক্রমশ সেই ভাবের সঙ্গে ধীরে ধীরে কি করে এসে মিশল দেশপ্রেম, সেটা বর্ণনা করার তো এ স্থান নয়। তবে ১৯০৬ সালের একদিনের কথা মনে পড়ে। আমি বোম্বাইয়ে তাজমহল হোটেলে রয়েছি। বিকেল বেলা মহম্মদ ঝড়ের মতো এসে উপস্থিত হলেন। ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "দেখ হে, আমি ভেবে দেখলাম ভারতবর্ষে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা আমরা মুসলমানেরাই একা করতে পারি। কিন্তু তোমাদের সাহায্য না পেলে রাজ্য রাখতে পারব না। আমাদের মধ্যে একটা বোঝা-পড়া সত্যিই দরকার।" কাফেরের সঙ্গে বোঝা-পড়া দরকার, এটা এর আগে তাঁর মুখে কখনো শুনি নেই।

উত্তর কোকনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে নানা অবান্তর কথা এসে পড়ল। মোট কথা, এই বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে আমার আর বিশেষ কোনো সম্বন্ধ রইল না, কেননা এখানে এসে আমার মফস্বলে সফর বন্ধ হয়ে গেল। আমার একঘেয়ে দিনগুলি কাটত সদরে, সারা দুপুর সাক্ষীর জবানবন্দী লিখে।

ঠানা নগরটিকে একেবারে শ্রীহীন বললেও অন্যায় হয় না। খাড়ি ও

জলার মাঝে এক ঘিঞ্জি ছোট্টো শহর। ব্যাবসা-বাণিজ্য বা দোকানপাট বিশেষ কিছু নেই, রাস্তাঘাট কদর্য, আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর। শহরের অধিকাংশ লোক, ভদ্র বা ইতর, প্রতিদিন রোজগার ধান্দার জন্য বোম্বাই যান। দুপুর বেলা শহর একেবারে নিঝুম। তবে, আমাদের আমলামণ্ডলী এখানে সংখ্যায় নিতান্ত অল্প ছিল না। তাই একটি ক্লাব আমাদের ছিল। কিন্তু বিচিত্র রকমের ক্লাব। আদালতের হাতার মধ্যে মুনসেফ কাছারির লাগা এক প্রকাণ্ড উঁচু চালা ছিল। দিনের বেলায় আদালতের সাক্ষীরা সেইখানে বিশ্রাম করত। সন্ধ্যার পর মেজেতে নারকেল ছোবড়ার দড়ি বিছিয়ে, মাথার উপর দুই কীটসন বাতি জ্বেলে, সেই চালাটাকে আমাদের ব্যাডমিণ্টন কোর্ট করে নেওয়া হত। সমুখে ছিল খানিকটা কাঁকরপেটা খোলা জমি। সেইখানে টেনিসের মৌসুমে আমরা টেনিস খেলতাম। নিকটস্থ ডাকবাঙলার খানসামা এসে পানীয় সরবরাহ করত। কাছারির একখানা লম্বা সরু টেবিল বের করে তার উপর রঙ-বেরঙের বোতল সাজিয়ে Bar তৈরি করে বসত। ক্লাবে তাস-পাশা বড়ো একটা খেলা হত না। কদাচ কখন জনা চারেক উৎসাহী লোক চালার মধ্যে এক কোণে ছোটো তেপাই লাগিয়ে ব্রিজ খেলতে বসতেন। কিন্তু এই-সব ভাঙা-চেঁড়া সাজ-সরঞ্জাম সত্ত্বেও সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দেই কেটে যেত। মাঝে মাঝে ওই চালার মধ্যেই চা-পার্টি, নাচ-গান, বড়ো বড়ো ডিনার বা সাপারের পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হত। এইরকম কোনো একটা বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত হলে প্রত্যেকেই আমরা নিজের নিজের বাড়ি থেকে বাসন-কোসন, আসবাব-পত্র পাঠিয়ে দিতাম। কিছুরই অভাব ঘটত না। বোম্বাই মহানগরী কাছে। কাজেই বড়ো রকমের একটা জলসা হলে শহুরে লোকেরও অল্প-বিস্তর জমায়েৎ হত। তাদের কাছে আপন ক্লাবের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্য সবাই আমরা প্রাণপণে খাটতাম। ক্রিকেটের মৌসুমে ক্রিকেটও খুব চলত। মাসে অন্তত একটা করে বড়ো ম্যাচ খেলা হত। তবে আমাদের ক্লাবে আর কজনই বা লোক, তাই শহরের খেলোয়াড় সব ডেকেডুকে এগারো জন খাড়া করা যেত। অপর পক্ষে বোম্বাই থেকে বড়ো বড়ো প্রেসিডেন্সি খেলোয়াড়ও আসতেন। তবে, সব সময় যে আমরাই খেলায় হারতাম, তাও নয়। আমি ঠানায় যাবার কিছুদিন পরেই

আমরা কয়েকজনে মিলে ক্রীড়াভুবন নামে এক বড়ো দেশি ক্লাব খাড়া করলাম। সেটা জেলা ক্লাবের চেয়ে অনেক বড়ো। এই ক্লাব সম্বন্ধে পরে আরো অনেক কথা বলব। আমার ইংরেজ বন্ধুরা ক্লাবটির নাম দিয়েছিলেন Dutt's Club। তবে তাঁদের এই নূতন ক্লাব সম্বন্ধে কোনো গাত্রদাহ ছিল না। বরং অনেকেই সেখানে শনি রবিবারে খেলতে যেতেন।

আমার বড়ো সাহেবের নাম তো আগেই করেছি। তিনি বয়সে প্রবীণ ছিলেন। ধরন-ধারণ ছিল কতকটা সেকেলে, কিন্তু ক্লাবের বা সামাজিক কাজ-কর্মে তাঁর উৎসাহের এতটুকু অভাব ছিল না। আমার নিজের সঙ্গে তো তাঁর সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অন্য রকমের হয়ে গেছল। অর্ধেক দিন জজ-গৃহিণীর কাছে রান্নাঘরে পিঁড়িতে বসে ভাত খেতাম। খাবার সময় পাটের কাপড় পরে আদুড় গায়ে জজসাহেবকে দেখাত যেন বুড়ো ঠাকুরদাদাটি। খেতে খেতে উচ্চৈঃস্বরে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতেন ও মরাঠিতে ছড়া কাটতেন। কিন্তু এই টিপনীস সাহেবই যখন আবার কলার টাই এঁটে সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে যেতেন তখন ছেলে-ছোকরা ইংরেজ কেউ ঝট করে তাঁর কাছে ঘেঁষত না। আদালতেও তাই। তাঁর গুরুগম্ভীর চেহারা দেখে কেউ এতটুকু বেয়াদবি করতে সাহস পেত না। সকলে তাঁকে ভালোবাসত বটে, তবে ভয়ও করত যথেষ্ট। কিন্তু বাড়িতে সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেখানে এমন অম্লান বদনে ছোটো বড়ো আত্মীয়-স্বজনের উপদ্রব অনাচার সহ্য করে যেতেন যে পারিবারিক শৃঙ্খলা বলে একটা পদার্থের চিহ্নমাত্র দেখা যেত না। আমি তো অল্পদিনেই এক রকম টিপনীস-পরিবারের সামিল হয়ে গেছলাম। আর, সেই সূত্রে কর্তার কাছে যা খুশি আবদার করতাম আর তিনিও সব আবদার সয়ে যেতেন। ফলে আমার জজিয়তি কাজ শেখাটা খুব মন্থর গতিতেই চলছিল। কর্তার নাম ছিল রঘুনাথ রাও। কখনো কালেভদ্রে তিনি বকলে ধমকালে আমি তাঁকে ঠাট্টা করে বলতাম, "মশাই, এ তো আপনার রামরাজ্য, এখানে আবার কড়া-কড়ি কিসের!" তিনি হেসে চুপ করে যেতেন।

আমাদের ডাক্তার-সাহেব ছিলেন আর একজন প্রবীণ লোক, কর্নেল M., জাতে পারসী। ভদ্রলোক বড়ো চমৎকার মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর অতি-বড়ো শত্রুও তাঁকে নিরীহ বা অমায়িক বলতে পারত না। কর্নেল সাহেবের সাজগোজ, ধরন-ধারণ ছিল একেবারে বুড়ো জঙ্গী অফিসারের মতো। তাঁর

সঙ্গে কথা কইতে কইতে বেশিক্ষণ কারো মনে থাকত না যে তিনি নেটিব সাহেব। কর্নেলের একটা পুরানো গল্প বলার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারছি না। গল্পটা তাঁর নিজের কাছেই শুনেছিলাম, তাঁর ভাষাতেই বলি।

কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন ফৌজে ডাক্তার ছিলাম, পদগৌরবে মেজার! একটা ছোটোখাটো লড়াইয়ের পরে আমরা মধ্যভারতে মহু কাণ্টনমেণ্টে বিশ্রাম করছিলাম। আমাদের কারো ঘরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। সবাই একসঙ্গে দুবেলা পলটনের Mess-এ খেতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলায় খানার টেবিলে এক বিশ্রী ব্যাপার ঘটল। দোষ আমারই। কর্নেল সেদিন উপস্থিত ছিলেন না। ইন্দোরে নিমন্ত্রণ রাখতে গেছলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমি ছিলাম বরিষ্ঠ অফিসার। আমাদের এক তরুণ সেনানী, Lt. X. ডিনার শেষ হওয়ার আগেই কেমন বেসামাল হয়ে উঠল। Mess-এ কদাচ কখনো একটু-আধটু বেসামাল হওয়াটা কিছু এমন অসাধারণ ব্যাপার নয়। তবু আমি "Order, Order" বলে চেঁচিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করলাম। খাওয়া শেষ হলে যখন সবাই চুরুট সিগারেট ধরাচ্ছি, X. টলতে টলতে একেবারে আমার সম্মুখে এসে চীংকার করতে লাগল, "হ্যালো! পেস্তনজী, জমশেদজী, মানেকজী, নওরোজী, তুমি আজ Mess-এর অধ্যক্ষ হয়েছ না কি?" আমি খুব ধীরে ধীরে বললাম, "X! নিজের কেদারাতে বোসো গিয়ে।" সে আরো উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "Mess-এর তুমি কি জান, পেস্তনজী, নওরোজী, মানেকজী! বাজারে Stores-এর দোকান দেখ গিয়ে।" আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "মিস্টার X. যাও, তোমার কামরাতে চলে যাও। কাল কর্নেল ফিরে আসা পর্যন্ত সেইখানে আটক থাক।" আর একজন সেনানীকে হুকুম দিলাম, "কাপ্তান Y., আপনি মিস্টার X.এর সঙ্গে যান। ওঁকে নজর-বন্দি করে রাখবেন।" সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু হুকুম যখন বেরিয়ে গেছে, না মেনে উপায় কি! X. ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করে চলে গেল, সঙ্গে কাপ্তান Y.। একটু পরে আমরাও আপন আপন আবাসে চলে গেলাম। আমার মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেছল। রেজিমেণ্টে আমিই ছিলাম একমাত্র ভারতীয় অফিসার। কিন্তু এর আগে কোনোদিন কারো সঙ্গে এতটুকু মনান্তর বা কথা কাটাকাটি হয় নেই। আজ কেন আমি মেজাজ ঠিক রাখতে

পারলাম না! রাত প্রায় একটার সময় কার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, আমাদের কর্নেল সাহেব। আমাকে দেখেই বললেন, "এইমাত্র ইন্দোর হতে এলাম। আবার এখনই ফিরে যাব। Adjutant-এর মুখে আজকের ব্যাপার শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।" আমি উত্তর দিলাম, "আমারই দোষ, কর্নেল। আমি বয়স্থ অফিসার, আমার সামলে যাওয়া উচিত ছিল।" কর্নেল আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে বললেন, "সে কথা তো ঠিক নয়, ডাক্তার! দোষ ঐ বাঁদর ছেলেটার। কিন্তু কাল সকালবেলা কাওয়াজের পর ব্যাপারটা সিপাহীদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে। তারা কি বলবে?" আমি একটুও ইতস্তত না করে উত্তর দিলাম, "তুমি ওকে এক্ষণই ছেড়ে দিয়ে যাও, কর্নেল। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।" কর্নেল ঘাড় নাড়লেন, "তা হয় না, ডাক্তার। তোমার হুকুমের উপর কি আমি কথা কইতে পারি! তুমি যা ভালো বোঝ, কোরো। আমি আবার ইন্দোর ফিরে চললাম।" ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। আমি X.এর বাঙলাতে গেলাম। দেখি, সে ও কাপ্তান নীরবে বসে রয়েছে। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে সেলাম দিলে। আমি X.এর কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললাম, "X., আমি বয়োবৃদ্ধ। আমারই মাথা ঠাণ্ডা রাখা উচিত ছিল। সেটা পারি নেই বলে অত্যন্ত লজ্জিত। তুমি কিছু মনে কোরো না। কাপ্তান Y., তুমি এখন নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। এখানে থাকার আর কোনো দরকার নেই।" X. মিনিটখানেক দুহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর ভারী গলায় বললে, "স্যার, আমার অপরাধ অমার্জনীয়—" আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। "Well, good-bye, my boy! কাল প্যারেডে দেখা হবে" বলে পলায়ন দিলাম।

গল্পটি ভারি সুন্দর। মনে হয় যেন রচা কথা। কিন্তু বন্ধুবর M. তো কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না! Discipline কি চৎকার জিনিস! আর কি চমৎকার লোক ছিলেন আমাদের ডাক্তার M. সাহেব!

জেলার কলেকটার ছিলেন Orr নামক একজন প্রবীণ সিবিলিয়ান। তিনি রীতিমত বড়ো সাহেব ছিলেন। আমাদের ঠানা ক্লাবের ক্ষুদ্র সামাজিক জীবনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী বেশির ভাগ সময় কাটাতেন বোম্বাইয়ে। যে কদিন বা আমাদের মাঝে

কাটাতেন, তাও এমন বিকট চাল দিতেন যে আমরা ছেলে-ছোকরার দল দূরে দূরেই থাকতাম।

তবে যেখানে বুনো ওল থাকে, সেখানে বাঘা তেঁতুলও পাওয়া যায়। ঠানাতে আমাদের Orr দম্পতির বাঘা তেঁতুল ছিলেন পুলিসের Cox সাহেব ও তাঁর লেডী। এই Cox জাতে বিলেতি ব্যারোনেট ছিলেন। অন্তত তখন পর্যন্ত তাঁর baronetcy-র দাবি রাজদরবারে অগ্রাহ্য হয় নেই। সাহেবের চালচলন Sir পদবির উপযোগী ছিল বটে, তবে লেডী সাহেবা একটু অন্য রকমের ছিলেন। কথাবার্তা খুব ঝাঁঝালো ছিল। আমার মনে পড়ছে, একদিন খানার পর আমাদের বৈঠকখানা ঘরে বসেই আমার স্ত্রীকে জনান্তিকে বলছিলেন, "ওরা কে, জান তো? মাদ্রাজে Orr কোম্পানি বলে এক জহুরীর দোকান আছে, তাদেরই কে হয়। দোকানদার, অথচ কিরকম চাল দেয়, দেখ না!" জনান্তিকে হলেও আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছিলাম। Cox গম্ভীর গলায় বললেন, "ও-সব কথা শুনবেন না, Mrs. D.। আজ-কালকার দিনে বংশ-গৌরবের কদর আর কে করে!" Cox লোকটি ছিলেন সাহিত্যিক। একবার এই বাতিকের জন্য একটু বিপাকে পড়েছিলেন। সেকালে East and West বলে এক পত্রিকা বেরোত বোম্বাই হতে। মাসিক কি ত্রৈমাসিক তা এখন ভুলে গেছি। পত্রিকাখানাকে লোকে একটু উচ্চশ্রেণীর বলেই মনে করত। সাহিত্যিক-খ্যাতি লাভ করার উচ্চাশা যাঁদের ছিল, তাঁরা এতে প্রবন্ধাদি লিখতেন। একবার আমাদের Cox সাহেব 'ব্রাহ্মনাবাদের ধ্বংসাবশেষ' বলে একটা লেখা প্রকাশ করেছিলেন এই পত্রিকায়। লেখাটার মধ্যে এই ভাবের কথা ছিল যে লেখক স্বয়ং সিন্ধু প্রদেশে 'ব্রাহ্মণাবাদের ধ্বংসাবেশষ' খুঁড়ে অমুক অমুক জিনিস পেয়েছিলেন। বোম্বাই সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক, এন্থোভেন সাহেব, এই প্রবন্ধ পড়ে কৈফিয়ৎ তলব করে পাঠালেন, 'কার হুকুমে আপনি ব্রাহ্মণাবাদে খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলেন?' Cox নিতান্ত বিনীতভাবে জানালেন যে তিনি কোথাও কোনোদিন একটা শাবলের কোপ পর্যন্ত মারেন নেই, লেখাটা গল্প মাত্র, সত্য ঘটনা নয়। সরকারের রোষ হতে সে-যাত্রা সাহেব রক্ষা পেয়ে গেলেন। কিন্তু দুটোর ভেতর খুব বেশি তফাৎ আছে কি? অনেক ইতিহাসই তো কাহিনী!

১৭

পূর্বে আমাদের আমলা সমাজের মহারথীদের কথা একটু আধটু বলেছি। এঁরাই ছিলেন এই সমাজের মান-ইজ্জতের মহাজন। বাকি আমরা যে খুদে সাহেবের দলটি ছিলাম, আমাদের ইজ্জৎ-জ্ঞান বা ভব্যতার বালাই বড়ো একটা ছিল না। তবে আমাদিকে নইলেও তো চলত না! কর্তারা পয়সা-কড়ি জোগাতেন বটে, কিন্তু আমোদ-প্রমোদের, খেলাধুলোর, নিত্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করতাম আমরা। কখনো বা সন্ধ্যাবেলায় ব্যাডমিন্টনের চালাতে গ্রামোফোনের তালে নাচ, কখনো বা টেনিসের মাঠে বিরাট supper ভোজ, কখনো বা রঙ-বেরঙের সাজ করে (fancy dress) ডিনার ভোজন, কখনো বা বনে-বাদাড়ে রকমারি চড়াইভাতি— এসব কল্পনা আমাদের উর্বর মাথাতেই গজাত। কদাচ কখনো এইসব উদ্ভট ব্যাপারের অনুষ্ঠানে এক-আধটু বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। সেজন্য কর্তাদের চোখ-রাঙানিও খেতে হত।

একটা মজার গল্প বলি। শহর থেকে তিন মাইল দূরে পারসিক বলে এক উঁচু পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ের গোড়ায় সমুদ্রের খাড়ি। একদিন প্রস্তাব করা গেল যে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই সেই খাড়িতে নৌকা বিহার করা যাবে। প্রচুর জলযোগেরও ব্যবস্থা সঙ্গে থাকবে। সকলেই, বিশেষত মহিলারা, সাগ্রহে রাজী হলেন। যথাসময় দুই বড়ো নৌকাতে লোকলস্কর, রসদের ঝাঁকা, গ্রামোফোন ইত্যাদি নিয়ে ভেসে পড়া গেল। সুন্দর চাঁদনী রাত। মৃদু মন্দ বাতাস। চারি দিক নিঝুম। মনের আনন্দে ঘণ্টা দুই খুব ঘুরে ঘুরে বেড়ানো গেল। হঠাৎ দূরে নজর পড়ল, জলের উপর ভাসছে এক ঝাঁক পাখি। একটু কুয়াশার মতন ছিল, পাখিগুলো খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের নৌকাখানা ধীরে ধীরে দাঁড় ঠেলে একটু কাছিয়ে গেল। হাঁসই বটে, কোনো সন্দেহ নেই! যখন অন্তর প্রায় তিরিশ কদম তখন আমাদের ছোকরার দলের দুই বীর বন্দুক তুলে দড়াম দড়াম করে গোটা চারেক টোটা ওড়ালেন। কতকগুলো হাঁস পালাল, গোটা দশেক মরে জলে পড়ে রইল। আমরা খুব জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। কিন্তু দুর্দৈব, কাছে গিয়ে দেখা গেল, একটাও বুনো হাঁস নয়, সব আশপাশের গ্রামের লোকের মোটা মোটা পোষা হাঁস! কলেকটার সাহেব অন্য নৌকাখানায় ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে ভয়ানক বকাবকি করতে

লাগলেন, "খুব sportsmen, শিকারী, তোমরা! অনর্থক কতকগুলো পোষা হাঁস গুলি করলে। ওগুলোকে ধরে ছুরি দিয়ে জবাই করলেই পারতে! রাত্রে নৌকাতে পিকনিক করতে এসেছ, বন্দুক কি জন্য এনেছিলে" ইত্যাদি। উপসংহার পরের দিন বড়ো সাহেব শিকারীদ্বয়ের ঘাড় ধরে কুড়িটি টাকা খেসারত দেওয়ালেন। এইরকম চুক ও এইরকম তার সাজা মাঝে মাঝে ঘটত বইকি!

তবে সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে আমরা যথাসম্ভব পদমর্যাদা বজায় রেখে চলতাম। আমাদের হৈ হৈ ধর্মাবলম্বী তরুণ দলের খাস বৈঠক বসত রাত্রে, কারো না কারো বাড়িতে। এটা মাসের মধ্যে বার দুয়ের বেশি ঘটে উঠত না। তবে সময়টা কাটত বড়ো আনন্দে। শাসন বাঁধন, ভয় ডর, কিছু ছিল না, কেউ কাজ কর্মের কথা নিয়ে জাবর কাটত না, কেউ বিদ্যা জাহির করবার চেষ্টাও করত না। নিছক হাল্লা। প্রধানত তাস খেলাই চলত, তবে হালকা রকমের গান বাজনাও হত মাঝে মাঝে। ভোর বেলায় দ্বিতীয় supper-এর পরে মজলিস ভাঙত। কিন্তু এক-আধ দিন এমনও ঘটত যে ভোরের আলোতে খানিকক্ষণ clay pigeon-এর উপর বন্দুক ছোঁড়াছুঁড়ি করে বাড়ি ফিরতাম। আমাদের এই বৈঠকের সবাই ছিলেন সাহেব, আমিই একমাত্র ভারতীয়। তখনকার দিনে আমি ইংরেজি কাপড়-চোপড় পরতাম না। নৈশ-বৈঠকে অনেক সময়ে ধুতি পরেই যেতাম। সেজন্য কিন্তু কখনো কোনো অসুবিধা আমাকে ভোগ করতে হয় নেই। বরং আমি না গেলে ওদের আসর জমত না, জোর জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে যেত। এর আগে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে তরুণ ইংরেজমণ্ডলীর সঙ্গে মিশি নেই। আর, আজ এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি যে এই ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করতে গিয়ে আমাকে কখনো এতটুকু খাটো হতে হয় নেই। আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্য কখনো বীরদর্পে আস্ফালনও করতে হয় নেই। এই ঠানাতেই শেষাশেষি আমলা মহলের সঙ্গে আমার সামাজিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সেই বিচ্ছেদ কিছুকাল অবধি রয়েও গেছল। কিন্তু তার কারণ ব্যক্তিগত নয়, আর সেজন্য আমি কোনো ইংরেজ-বন্ধুকে দোষী করতে পারি না। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত ছিল সংকট সময়। তখন আমি ছাড়া আরো অনেকেরই বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। এসব অপ্রিয় কথা, এর আলোচনাও আমার পক্ষে অশোভন। তবে এখানে শুধু এইটুকু বলব যে আমার ভুলের জন্য আর যেই দায়ী হোক, আমার ঠানার তরুণ সহকর্মীরা নয়।

আমাদের দলের অধিনায়ক ছিল পুলিসের ছোটো কর্তা P.। এই P.র মতো মুক্তহস্ত, উদার ও সরল মানুষ আমি আমলা মহলে খুব কম দেখেছি। তার দোষের মধ্যে এই ছিল যে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কখনো কাজ করত না, কথার ওজনও রাখতে পারত না। তাই চাকরিতে শেষ পর্যন্ত তেমন উন্নতি করতে পারে নেই। তার অতিবড়ো শত্রুও বলতে পারত না যে সে মফস্বলে সফরে গিয়ে কোনো দিন দাম না দিয়ে এক মুঠো ঘোড়ার দানা কারো নিয়েছে। বরং তার বকশিশ দেওয়ার ঘটা সর্বজনবিদিত ছিল। এখনো মনে পড়ে P.র পালোয়ানের মতন বিশাল দেহ, আর মুখে ছোটো ছেলের মতন সরল মিষ্টি হাসি। বৈঠকখানার আড়ষ্ট আবহাওয়াতে লোকটিকে মোটে মানাত না। এক ধারে কেমন চুপ করে বসে থাকত। কিন্তু বনজঙ্গলে, খেলার মাঠে, বা আমাদের নৈশ-বৈঠকে তার মুখ খুলে যেত, মনে হত যেন অন্য মানুষ। ঠানা জেলাতে সে সময়ে ক্রমাগত চুরি ডাকাতি হত। ডাকাতের দল পেড়ে ফেলবার কাজে P. সিদ্ধহস্ত ছিল। ডাকাতির খবর পেলে আর রক্ষা নেই। একেবারে ডালকুত্তার (Blood hound) মতন তেড়ে দৌড় দিত দস্যুদলের পেছনে। দিনরাত না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, ডাকাতগুলোকে খেদিয়ে খেদিয়ে শেষ যে কটাকে পেত ধরে এনে সদরে হাজির করত। ধরে তো আনত, কিন্তু নিজের কাজ কি করে উপরওয়ালাদের নজরে আনতে হয় তার কিছুই বুঝত না। সাজিয়ে রিপোর্ট লেখা তার মোটে আসত না। ফলে, অনেক সময় P.র কাজের জন্য শাবাশী পেত অন্য লোক। ওর সে দিকে খেয়ালও ছিল না! আমরা কিছু বললে জবাব দিত, "আমি ব্যারনেটও নই, ইস্কুল মাস্টারও নই, গল্প প্রবন্ধ রচনা করতে কখনো শিখি নেই।" ব্যারনেট সাহেব "Adventures of John Carruthers, Policeman" বলে এক বই লিখে বেশ দু পয়সা রোজগার করেছিলেন, কিন্তু নিজে পারতপক্ষে কখনো সরেজমিন তদন্ত করতে বেরোতেন না। তাই P. তাঁকে দু চক্ষে দেখতে পারত না। তবে সে ভাবটা, বোধ হয়, উভয়তঃ ছিল। একবার ডাকাত ধরার উৎসাহের জন্য বন্ধু P.কে কিরকম বিপদে পড়তে হয়েছিল, শুনুন।

সদরে রিপোর্ট এল যে এক দূর পাড়াগাঁয়ে খুব জবর রকমের লুটতরাজ হয়ে গেছে, ডাকাতের দল অনেক টাকার মাল নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। খবর পেয়েই ব্যারনেট নিত্য প্রথামত P.কে হুকুম করলেন, "এখনই নিজে বেরিয়ে যাও, P.! দেরি কোরো না, অন্যের উপর বরাত দিয়ো না। এ ডাকাতির কিনারা

করাই চাই। আমি জরুরি কাজে ব্যস্ত, নইলে আমিই যেতাম।" Cox কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন তা আমরা জানতাম না, তবে P. পরের দিন একটা বড়ো রকমের শিকার picnic-এর ব্যবস্থা করেছিল বটে! যাক্, হুকুম পেয়ে বেচারা তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় বেড়িয়ে গেল। সঙ্গে মাত্র দুজন সওয়ার, চাকর-বাকর আসবাব-পত্র কিছুই নিলে না। চার দিনের দিন ফিরে এল। থলঘাটের উপর কয়েকজন ডাকাতকে পাকড়াও করেছে, কিন্তু দলপতি দুজন পালিয়েছে। কয়েক দিন পরে শোনা গেল সেই ফেরারী আসামী দুটি শহরে উকিল দেশপাণ্ডে রাও সাহেবের বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে। P. তৎক্ষণাৎ সেপাই সান্ত্রী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। দেশপাণ্ডে বাড়ি ছিলেন না। খানাতল্লাশি শুরু হয়ে গেল। শেষ, উপর তলার এক কুঠরিতে ফেরারী ডাকাত দুজন ধরা পড়ল। P. তাদিকে গেরেপ্তার করতে না করতে দেশপাণ্ডে বাড়ি ফিরে এলেন। তিনি সোজা সাহেবের সুমুখে গিয়ে বললেন, "এরা আমার মক্কেল। সলা-পরামর্শের জন্য বাড়িতে রেখেছি। আমিই যথাসময় এদিকে হাজির করব। এখন ছেড়ে দিন অনুগ্রহ করে।" উকিলের এই ধৃষ্টতাতে P. রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন, "আপনি আমাকে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে লেকচার দিচ্ছেন না কি! আমি আপনাকেও গেরেপ্তার করতে পারি ফেরারী আসামীকে লুকিয়ে রাখার অপরাধে, তা জানেন!" দেশপাণ্ডে হেসে বললেন, "বেশ তো! গেরেপ্তার করুন না আমাকে! আদালতে পরে বোঝাপড়া হবে।" P. এক মুহূর্তও ইতস্ততঃ না করে উকিলবাবুকেও পাকড়াও করলে, আর হাত পা বেঁধে তাঁকে ও ডাকাত দুজনকে সদর রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে গেল। ব্যাপারটা বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়াল! কেননা, দেশপাণ্ডে সেই দিন সকালবেলাই সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এতেলা দিয়ে এসেছিলেন যে ডাকাতি অপরাধে অভিযুক্ত তাঁর দুজন মক্কেলকে তিনি বেলা তিনটার সময় হুজুরের এজলাসে হাজির করবেন। Cox সাহেব সব কথা শুনে তৎক্ষণাৎ দেশপাণ্ডেকে ছেড়ে দিলেন ও P. কে ডেকে খুব কড়কে দিলেন। ডাকাত দুজনকে পুলিস আদালতে হাজির করলে। যথাকালে দায়রা মোকদ্দমা হয়ে তারা দলের লোকের সঙ্গে জেলখানায় প্রবেশ করলে। কিন্তু P. বেচারার ভোগ এইখানেই শেষ হল না। দেশপাণ্ডে উকিল তার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা খেসারৎ দাবি করে জেলা কোর্টে মোকদ্দমা রুজু করলেন। আমার জজসাহেব ছিলেন বাদীর মাতুল, তাই তিনি মোকদ্দমা নিজে না নিয়ে

আমার হাতে তুলে দিলেন। P. আমাকে ঠাট্টাছলে শাসাতে আরম্ভ করলে, "দেখ না, অ্যাডভোকেট-জেনেরালকে নিয়ে আসছি, তোমাকে জব্দ করছি!" আমি কিন্তু জানতাম অ্যাডভোকেট-জেনেরাল আসছেন না। Cox-এর কাছেই শুনেছিলাম যে বোম্বাই সরকার P.র উপর ভয়ানক বিরক্ত হয়েছেন, তাঁরা এ মোকদ্দমায় প্রতিবাদীকে কোনোরকম সাহায্য করবেন না। আমি মনে মনে স্থির করলাম, P.কে যেমন করে হোক বাঁচাব। কি করা যায়? দেশপাণ্ডেকে জোর করে কিছু বলতে পারি না, সে আমার রাও সাহেবের ভাগনে। আবার P.র মেজাজ পাঁচ রকমে এমনই খারাপ হয়েছে যে তারও কোনো সদুপদেশ শোনার সম্ভাবনা খুব কম। একদিন দেশপাণ্ডেকে ধীরে সুস্থে বললাম, "দেখুন, P. বেচারা গরিব, ও দশ হাজার টাকা দেবে কোথা থেকে!" এতে হিতে বিপরীত হল। পরদিন কোর্টে বাদীর তরফে এক দরখাস্ত দাখিল হল, "আমরা শুনিয়াছি যে প্রতিবাদী নিঃস্ব, ঋণগ্রস্ত, দশ হাজার টাকা দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। অতএব এ ক্ষেত্রে বাদী নামমাত্র যৎকিঞ্চিৎ খেসারৎ পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে।" P. তো চটেই আগুন হল! ক্লাবে আমার কাছে চীৎকার করতে লাগল, "হতভাগা উকিল আমাকে দেউলে বলেছে, অপমান করেছে, এইবার ওকে জব্দ করছি!" আরো কিছুদিন কেটে গেল। প্রতিবাদীর statement-ও দাখিল হল না। তার তরফে কেউ উকিলও উপস্থিত হলেন না। আবার দেশপাণ্ডেকে পাকড়াও করলাম, "দেখুন, এতদিন হয়ে গেল, আর এ পুরানো কথা নিয়ে গোলমাল করা কেন! আপনি তো বলেই দিয়েছেন যে সত্যি কিছু খেসারৎ চান না।" দেখলাম, ও ভদ্রলোকেরও রাগ পড়ে গেছে। ধীরে ধীরে জবাব দিলেন, "আমি এখনই মোকদ্দমা তুলে নিতে রাজী আছি যদি সাহেব আমার কাছে মাপ চান।" সন্ধ্যাবেলা P.কে অনেক বোঝালাম, কিন্তু সে ত্রুটিস্বীকার করতে কিছুতেই রাজী হল না। তিন দিন বাদে তারিখ ফেললাম প্রতিবাদীর statement-এর জন্য। যথাসময় উভয় পক্ষ হাজির হলেন কোর্টে। P. দাঁড়িয়ে বললে, "আমি লেখা statement আনি নেই। আমার যা বক্তব্য মুখে বলতে প্রস্তুত আছি, হুজুর যদি লিখে নেন।" আমি দুজনকেই খাস কামরায় ডেকে নিয়ে গেলাম। সেখানে বসে P.কে বললাম, "Mr. P.! সেদিন আপনি যখন বাদীকে গেরেপ্তার করেন, তখন আপনি সব কথা জানতেন না। আপনার জানা ছিল না যে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি

নিয়ে তাঁর মক্কেলদিকে বাড়িতে রেখেছিলেন!" P. জবাব দিলেন "অবশ্য জানতাম না। জানলে ধরব কেন!" "আচ্ছা, তা হলে না জেনে ওঁকে যে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিয়েছেন, সেজন্য আপনি, একজন বিশিষ্ট gentleman, নিশ্চয় দুঃখিত বোধ করছেন।" "হ্যাঁ, তা দুঃখিত হয়েছি বই-কি! কিন্তু উনিও এই মোকদ্দমা করে আমাকে—" আমি থামিয়ে দিয়ে একটা কাগজে লিখলাম, "যখন আমি মিস্টার দেশপাণ্ডেকে গেরেপ্তার করি, তখন আমি জানতাম না যে উনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অনুমতি নিয়ে ডাকাত দুজনকে নিজের ঘরে রেখেছিলেন। না জেনে ওঁকে আমি যে কষ্ট দিয়েছি সেজন্য আমি দুঃখিত।" লিখে P.কে বললাম, "সই করবেন?" সে ধীরে ধীরে সই করলে। আমি দেশপাণ্ডেকে বললাম, "প্রতিবাদীর এই statement-এর নকল আপনি নিতে পারেন। আর মোকদ্দমা চালাবার কোনো প্রয়োজন আছে কি?" দেশপাণ্ডে উত্তর দিলেন, "আমি আজই মোকদ্দমা তুলে নেওয়ার জন্য দরখাস্ত দিচ্ছি, হুজুর। Mr. P.! আমি মুনসেফী চাকরির প্রার্থী। সরকার থেকে আমার উপর হুকুম হয়েছিল যে আমি সেই গেরেপ্তারের ব্যাপারে নির্দোষ এটা প্রমাণ করতে না পারলে আমার নাম উমেদারের তালিকা হতে কেটে দেওয়া হবে। আমার মোকদ্দমা না করে উপায় ছিল না, ক্ষমা করবেন।" বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। P.ও হাত ধরে খুব নাড়া দিয়ে বললে, "Thanks ever so much, Mr. Deshpande— অশেষ ধন্যবাদ, দেশপাণ্ডে সাহেব।" উকিল বেরিয়ে যাবার পর আমাকে হেসে বললে, "আচ্ছা বাঙালী-বুদ্ধি বাবা! ফাঁকি দিয়ে আমাকে মাপ চাইয়ে ছাড়লে!"

কিছুদিন পরে এই উপলক্ষে P.র বাড়িতে আমাদের ছোকরা-দলের এক বিরাট খানা হল। খানার নাম আমরা দিয়েছিলাম— Illegal gratification dinner!

১৮

ঠানার নবীন প্রবীণ আমলা বন্ধু প্রায় সকলের কথাই বলেছি। একজনের নাম এখনো করা হয় নেই। অথচ তাঁর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা আমাদের সব চেয়ে বেশি হয়েছিল। তবে মানুষটি ছিলেন খামখেয়ালী। ছিলেন কেন, আজও বুড়ো বয়সে প্রায় সেইরকমই আছেন। তাই তাঁর সঙ্গে মৈত্রীর মাত্রা চিরদিন

এক সমান রাখা শক্ত ছিল। অল্প কথায়, সামান্য বিষয় নিয়ে, মৈত্রীতে অনেকবার ভাঁটা পড়েছে। বন্ধু বয়সে ছিলেন তরুণ, কিন্তু চাল-চলন ধরন-ধারণ সবই ছিল অতি প্রবীণের মতো। তাস পাশা খেলতেন না, এমন নয়। তবে তাঁর সঙ্গে ব্রীজ খেলা ছিল প্রায় সাংখ্য-বেদান্ত-চর্চার মতো। এতটুকু হাসি-ঠাট্টা হালকাপনা চলত না। ভদ্রলোক অসাধারণ বিদ্যানুরাগী ছিলেন, অথৈ বিদ্যার্জনও করেছিলেন, কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি প্রবল ছিল না। নিজের জীবনে অনেকবার অনেক রকমে ঘোটমণ্ডল পাকিয়েছেন। তবু সময় সময় যখন গম্ভীর চালে মাথা নেড়ে আমার বুড়ো পলিতকেশ রাও সাহেবকে উপদেশাদি দিতেন তখন তাঁকেই বয়োবৃদ্ধ দেখাত। আমাদের তো কথাই নেই! আলাপ-পরিচয় হওয়া মাত্র ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে থাকতে। বেশ কিছুদিন তাঁর কাছেই আটক রইলাম। নিজেদের ঘরকন্না শুরু করার নাম করলেই ধমকে উঠতেন, "আমি তোমাদের বড়ো, দাদার মতন, আমার কথার উপর কথা কইয়ো না।"

বন্ধুবর তখনকার দিনে উৎকট সাহেব ছিলেন। দেশি চাল-চলন, দেশি সাজসজ্জা, এমন-কি দেশি ভাষাও খুব অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন। অন্ততঃ বাইরে সেইরকম জাহির করতেন। ইংরেজি বলতেনও অতি সুন্দর। পাশের ঘর থেকে শুনলে বোঝা যেত না যে নেটিবে কথা কইছে। কিন্তু মুশকিল ছিল এই যে মাতৃভাষা মরাঠীও বলতেন ভীষণ সাহেবী ধরনে। ফলে দেশের লোকের কাছে তাঁর নিন্দার অন্ত ছিল না। তারা তো তাঁর অন্তরটা দেখতে পেত না! রাও সাহেব ও আমি অনেক চেষ্টা করেও বন্ধুর সঙ্গে নেটিব সমাজের একটা বোঝাপড়া করে দিতে পারি নেই। বন্ধু ধরাই দিতেন না।

ইংরেজ আমলা-সমাজের সঙ্গেও তাঁর বড়ো একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সাহেব দেখলেই ভদ্রলোক কেমন যেন আরো কাঠখোট্টা মূর্তি ধরতেন, বড়ো অস্বাভাবিক দেখাত। কথাবার্তা খুব কমই কইতেন। ওরা মনে করত, লোকটার কি দেমাক!

একদিন ক্লাবে এক ইংরেজের সঙ্গে তাঁর খুব তর্ক লেগে গেল ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি নিয়ে। তর্কে ইংরেজটি প্রায় হেরে যাচ্ছিল। এমন সময় সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ভারতবর্ষের লোক সবাই যদি তোমার মতো ইউরোপীয়ান হয়ে যেত, তা হলে আমরা রাজ্য কারবার তাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তা তো আর নয়, তারা নেটিব, তোমার চোখেও নেটিব, আমার চোখেও

নেটিব!" এই টিপ্পনী শুনে বন্ধুবর রেগে লাল হয়ে উত্তর দিলেন, "আমি ইউরোপীয়ান নই, আমিও নেটিব।" সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন, "You don't look it, you know friend M.! সেটা বলে না দিলে তো আর বোঝা যায় না!" বন্ধু কোনো উত্তর না দিয়ে রাগে গরগর করতে করতে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলায় M.এর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেখি তিনি গম্ভীর হয়ে বসে একখানা ভারতের ইতিহাস পড়ছেন। আমি একটু উপহাসের ছলে বললাম, "কি হে! নেটিব হওয়ার চেষ্টা করছ না কি!" M. খুব মুরুব্বিয়ানা চালে উত্তর দিলেন, "বন্ধুবর দত্ত সাহেব, আপনি বলতে পারেন যে আপনার এই দেশের লোক কখনো কোনোদিন একটা বড়ো কাজ, কাজের মতন কাজ, করতে পেরেছে কি?" আমার চট করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। উত্তর দিলাম, "কোনো বিদেশী এই প্রশ্ন করলে তার নাকের উপর একটি ঘুষো বসিয়ে দিতাম। কিন্তু তুমি এই দেশে জন্মেছ, তোমাকে শুধু এইটুকু বলব যে তুমি দূর হও, যত শীঘ্র পার বিলেতে গিয়ে বাস কর।" M. আমার দিকে তাকালেন, হঠাৎ তাঁর চোখ জলে ভরে এল, ভারী গলায় বললেন, "কাল ক্লাবে ইংরেজটা বললে যে আমি ভারতীয় নই, ইউরোপীয়ান। আজ তুমিও সেই কথা বলছ। আচ্ছা, ভাই, আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও, যাতে আমি যথার্থ ভারতীয় হতে পারি।" লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল, বন্ধুর হাত ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। কিন্তু যেটা সত্যি কথা সেটা বলতে পারলাম না— ত্রিশঙ্কুর অবস্থা যে বড়ো শোচনীয়!

বন্ধুবর খুব উৎসাহী প্রার্থনা-সমাজী ছিলেন। হিন্দু সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ অদম্য ছিল। যখন তখন, যেখানে সেখানে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর ধর্ম ও রীতিনীতিকে গালাগালি করতেন। আমারও যে কুসংস্কারের প্রতি আস্থা ছিল, তা নয়। কিন্তু একজন লোক ক্রমাগত, "তোমরা হিন্দুরা এই কর, তোমরা হিন্দুরা ওই কর" বললে বরদাস্ত করা শক্ত। তাই মাঝে মাঝে খুব লেগে যেত দুজনের। আমি যা বলতাম ঠাট্টার ছলে, পরে সব ভুলে যেতাম। কিন্তু M. তর্কের পর কেমন মুষড়ে যেত। মানুষটা প্রতিবাদ সহ্য করতে পারত না মোটে। তখনকার দিনের প্রার্থনা-সমাজ বড়ো গোলমেলে ব্যাপার ছিল। অধিকাংশ সমাজের চাঁইদের বাড়িতে দেবঘর ছিল, নিয়মিত

মূর্তিপূজা হত। বন্ধু M.এর বোম্বাই-এর বাড়িতেও সেই ব্যবস্থা ছিল। এই সমাজের একজন নেতা কিছুদিন আগে পুণাতে পাদরি সাহেবদের বাড়ি চা খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ করেছিলেন। একদিন এইরকম সব ব্যাপার নিয়ে একটু ঠাট্টা তামাসা করাতে বন্ধুবর আমার উপর এমন চটে গেলেন যে মাস দুই আমার সঙ্গে কথাই কন নেই। তিনি রেগে শুধু এই কথা বলতেন, "তুমি তো সত্যি হিন্দু নও, হিন্দু সমাজের তরফদারী তুমি কেন করবে? তোমার কোনো অধিকার নেই প্রার্থনা-সমাজের নিন্দা করার।"

পাঠক হয়তো মনে করছেন, আমার বন্ধু সত্যি একজন সেকেলে গোঁড়া ব্রাহ্ম গোছের মানুষ ছিলেন। মোটেই না! তিনি ঠানা ছাড়বার বছর খানেক পরে তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হল, তখন দেখি তিনি স্নান করে ফোঁটা কাটছেন, পট্টবস্ত্র পরে ভাত খেতে বসছেন। আমি পায়জামা পরে ভাত খেলাম বলে আমাকে খুব বকুনি দিলেন। এ ভাবও যে বেশি দিন রইল, তা নয়। শেষ পর্যন্ত সমাজ-সংস্কারের ঝোঁকও গেল, পট্টবস্ত্রও উবে গেল, যা রইল তা মামুলি সিবিলিয়ানী চাল-চলন।

M.এর সম্বন্ধে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। ধর্ম বিষয়ে এমন উদার মতামত সত্ত্বেও তাঁর মনোবৃত্তি কতকটা আধুনিক হিন্দুসভার অনুরূপ ছিল, অর্থাৎ পারসী, খৃস্টান, মুসলমানদের বিষয়ে যথেষ্ট সংকীর্ণ ছিল। এটা আজকাল আমরা খুব দেখি, কিন্তু তখনকার দিনে অভাবনীয় ছিল। আমি গরিবগুরবো মুসলমান ছাত্র প্রভৃতিকে একটু আধটু সাহায্য করতাম। এই নিয়ে বন্ধু যখন-তখন আমার সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক জুড়ে দিতেন। দেশকে তিনি যথেষ্ট ভালোবাসতেন তবে সেটা কতকটা কেতাবী রকমে। সত্যি তাঁর কাছে দেশ মানে ছিল হিন্দুসমাজ। দেশনেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন রানাডে ও গোখলেকে; তৈয়বজী, দাদাভাই বা ফিরোজ-শাহের নাম বড়ো একটা মুখে আনতেন না। লোকমান্য টিলকের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রায় সরকারী মতামতেরই অনুগামী ছিল। এ-সব সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব বরাবর অক্ষুণ্ন ছিল।

M.এর মারফতেই আমার বোম্বাই হিন্দুসমাজের অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। সেজন্য আমি চিরদিনই তাঁর কাছে ঋণী। তবে শুধু তাই নয়, ঠানাতে ছেলেবেলায় তাঁর কাছ হতে অনেক কিছু শিখেছিলাম। বন্ধুবর পরের জীবনে যে চাকরির উন্নত-শিখরে উঠেছিলেন, সরকারী খেতাবে বিভূষিত

হয়েছিলেন, সে সবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে সময়ে আমি বহুদূরে ছিলাম। তবে আশ্চর্য হয়েছিলাম বই-কি! কারোয়াহি নইলে তো জগতে উন্নতি হয় না। বন্ধুবর M.এর ভাবপ্রবণ চরিত্রের সঙ্গে কারোয়াহি কি করে খাপ খেয়েছিল, তা আজও বুঝি না।

গেল বারে আমার পুলিসের বন্ধু P.র কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে ঐ সময়ে ঠানা জেলাতে অনেক ডাকাতি হচ্ছিল। এই ডাকাতিগুলোর একটু বিশেষত্ব ছিল। দুই একটা গল্প বললে পাঠকের ভালো লাগতেও পারে। আমি যেটুকু জানি তা অবশ্য আমার এজলাসের মোকদ্দমার নথিপত্র থেকে। আমাদের জেলার লাগা জওহর রাজ্যে এক ডাকাতের দল গড়ে উঠেছিল। তাদের প্রধান আড্ডা যে ঠিক কোথায় ছিল তা কেউ জানত না। কিন্তু তাদের কার্যক্রম বড়ো বিচিত্র ছিল। গভীর রাত্রে ডাকাতরা গ্রামের মাহার (বাগদী) পাড়ায় উপস্থিত হয়ে হাঁক মারলে, 'কে আছ, বেরিয়ে এসো।' মাহার চৌকিদার সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলে যে অন্ধকারে জনা কুড়িক লোক বন্দুক হাতে দাঁড়িযে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললে, "চৌকিদার, যা, পাটিলকে ডেকে নিয়ে আয় জলদি। তুই যতক্ষণ না ফিরে আসিস আমরা তোদের পাড়া ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে আছি। মনে থাকে যেন, কিছু দাগাবাজি করিস্ তো ছেলেপিলে সব কুচো কুচো করে কুটে ফেলব, ঘরদোর সব জ্বালিয়ে দেব।" চৌকিদার কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে পাটিলকে এনে হাজির করলে। দলপতি তখন গম্ভীর স্বরে হুকুম করলেন, "আমরা অমুক সরদারের সিপাহী। সরদারের প্রাপ্য চৌথাই আদায় করতে এসেছি। তোমার গ্রামের দেয় স্থির হয়েছে— ময়দা এত, ঘি এত, ছটা মুরগি, দশ টাকা নগদ। চৌকিদারকে পাঠিয়ে দাও নিয়ে আসুক আধ ঘণ্টার মধ্যে। তুমি জামিন রইলে।" পাটিলের ঘাড়ে কটা মাথা, যে সে হুকুম অমান্য করবে! সে জানে যে হুকুম না মানার ফল কি! কত পাটিলকে এরা মেরে আধমরা করে দিয়ে গেছে, কত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। যথাসময় চৌথাই এসে পৌছল। ডাকাতরা সব তুলে নিয়ে সরে পড়ল। সময় সময় এরা আবার সরদারের তরফ থেকে রসিদ লিখে দিয়ে যেত, এ বছরের খাজনা পেলাম। যে দলের বিচার আমি করেছিলাম তারা বেশ বছর দুই এইরকম কাণ্ড করার পর ধরা পড়েছিল, তাও শুধু গৃহবিবাদ হয়েছিল বলে। এরা যে সবাই সত্যিকার বন্দুক ঘাড়ে করে আসত, তা নয়।

এই দলে দুটো একটা গাদা বন্দুক থাকত, বাকি সব কাঠের নকল বন্দুক, আলকাতরার রঙ করা।

আর এক দল ডাকাতের কথা মনে পড়ছে। তাদের দলপতির নাম ছিল আউ। আউয়ের নামে সারা তল্লাট কাঁপত। কত লুটতরাজই যে এই দল করেছিল, তার গুণতি নেই! অনেক সময়ে নালিশই হত না। আউয়ের দল বড়ো একটা মারধর করত না। করতে হতও না, কারণ গৃহস্থ যখন শুনত যে কার দলের শুভাগমন হয়েছে তখন আপন হতে সর্বস্ব ধরে দিত। এইরকম প্রবল প্রতাপে আউ সারা উত্তর কোকনে নিজের আধিপত্য প্রায় তিন বছর অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। কিন্তু চিরদিন কারো সমান যায় না। আস্তে আস্তে দলে ভাঙন ধরল। এক একজন করে ডাকাত ধরা পড়তে লাগল। কিন্তু চোরাই মালেরও পাত্তা লাগে না, দলপতিরও সন্ধান মেলে না। এই ভাবে কিছুদিন কাটল। পুলিসের বড়ো বদনাম হল। শেষ, একদিন ঘাট প্রদেশের এক পাটিল থানায় এসে এত্তেলা দিয়ে গেল যে প্রতিদিন ভোর বেলা ও সন্ধ্যার পর একজন কোলী তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে এক চাঙারি খাবার নিয়ে বনের দিকে চলে যায়। খবর শুনে দারোগা সেই গ্রামে গিয়ে চুপি চুপি চারি দিক ঘুরে ফিরে দেখে এলেন। গ্রামটি পাহাড়ের গায়ে। অদূরে অন্ধকার গভীর বন। সেই বন নেমে গেছে একেবারে নীচে পর্যন্ত, যেখানে এক সংকীর্ণ দরীর মধ্য দিয়ে বহে যাচ্ছে এক ছোট্ট পাহাড়ি নদী। দারোগা সন্দেহ করলেন যে ঐ দরী ও বনের মাঝে কোনো ডাকাত বা ফেরারী আসামী লুকিয়ে রয়েছে, হয়তো বা স্বয়ং আউ সেখানে আছে। কিন্তু সঙ্গে বেশি লোকজন ছিল না বলে তখনই জঙ্গলে ঢুকতে সাহস পেলেন না। পরদিন সকালবেলা বন্দুকধারী পুলিস ও বহু গ্রামের চৌকিদার জমা করে— সব সুদ্ধ দেড়শো দুশো লোক হবে— চারি দিক থেকে সেই দরীতে নামতে শুরু করলেন। যখন অর্ধপথ নেমেছেন একটা বন্দুকের আওয়াজ হল, সঙ্গে সঙ্গে একজন চৌকিদার শুয়ে পড়ল। নীচে থেকে হাঁক এল, "তফাৎ দারোগাসাহেব! পালাও! নইলে আউয়ের হাতে আজ তোমার রক্ষা নেই।" তার পর খানিকক্ষণ দুই দিক হতেই দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ হতে লাগল। পুলিসের দল এগিয়ে চলল। আস্তে আস্তে নীচের আওয়াজ থেমে এল। দারোগা যখন নদীর ধারে গিয়ে পৌছলেন, দেখলেন যে তিনজন লোক মরে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সনাক্ত করার লোক ছিল। তিনজনের

একজন যে আউ তা নির্বিবাদে প্রমাণ হতে দেরি হল না। কিন্তু লাশ তুলতে গিয়ে দেখা গেল যে দুর্দান্ত ডাকাতের সরদার আউ একজন আধবয়সী স্ত্রীলোক! যেখানে মৃত ডাকাত তিনজন পড়েছিল তার কাছেই পাহাড়ের গুহা-কন্দরে দুই-তিন জায়গায় প্রায় কুড়িটা ডাকাতির মুদ্দেমাল পাওয়া গেল।

১৯

ক্রমাগত কাজি-কোটালের গল্প শুনে পাঠকমণ্ডলী নিশ্চয় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। হয়তো বা ভাবছেন, এ লোকটা কি হাকিম বড়ো সাহেব ছাড়া আর কোনো মানুষ কখনো চোখে দেখে নেই। এরকম বদনাম মিছি মিছি ঘাড় পেতে নেব কেন! তাই পাঠককে এবার সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ার মধ্যে নিয়ে যাব, ও একেবারে নূতন রকমের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। নূতন বলছি বটে, কিন্তু সত্যি পুরাতন, অতি পুরাতন। ইংরেজি ১৮৬১ সাল। বছর কয়েক আগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আমার পিতাঠাকুর নূতন বি.এ. ও বি.এল. পরীক্ষা পাস করেছেন। বড়ো সাধ উকিল হবেন। কিন্তু সেজন্য বেশ কিঞ্চিৎ টাকার প্রয়োজন, কেননা পাঁচশো টাকা জমা না দিতে পারলে হাইকোর্টে নাম লেখানো যায় না। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাবাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি টাকাটা কর্জ দিতে চাইলেন। কিন্তু বাবা পরের টাকাতে উকিল হতে একেবারে নারাজ। বাড়ির থেকে টাকাটা পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই তা বাবা জানতেন। অতএব কিছুদিনের জন্য একটা চাকরি নিয়ে দরকারী টাকা জমানো ছাড়া উপায় ছিল না। বাবার এক মুরুব্বী ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত ই. বি. কাউএল সাহেব। তিনি বাবাকে সংস্কৃত কলেজে অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করে নিলেন। ব্যাপারটা হল একেবারে কারসাজি, যাকে ইংরেজিতে বলে Jobbery। কেননা নবীন অধ্যাপক এক অক্ষরও সংস্কৃত জানতেন না। তা এরকম ব্যাপার তো আগে ঢের হত। আজকালই হয় না।

চাকরি পেয়ে বাবা দেশে গেলেন, পিতামহ মহাশয়কে প্রণাম করতে। গ্রামের লোক তাঁকে খুব আদর যত্নপূর্বক অভ্যর্থনা করলে। সহজ কথা কি, বি.এ., বি.এল. পাস! তখনকার দিনে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যাতে জন দশেকের বেশি ছিল না। পরদিন সকাল বেলায় ঠাকুরদা মশায় ছেলেকে নিয়ে

বৈঠকখানাতে আসর জমকে বসলেন। চারি দিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্রমণ্ডলী সমাসীন। চাষাভুষো, চৌকিদার পাইকেরাও এসেছে। আপন আপন পদমর্যাদা অনুসারে কেউ দাওয়াতে, কেউ উঠানে বসেছে। সবাইকার মুখে হাসি। সবাইকার বুক ফুলে দশহাত হয়েছে। ইংরেজিতে চার-চারটে পাস করে ছেলে ঘরে এসেছে। আশপাশের গাঁয়ের লোক হিংসাতে ফেটে মরবে। আর মেড়ালকে কেউ গণ্ডগ্রাম বলতে সাহস পাবে না।

পিতামহের সামনে একটা সুতো বাঁধা বড়ো গোছের কাগজের মোড়ক পড়ে রয়েছে। তিনি হেসে বললেন, "ভট্টাচার্য মশায়, ছেলে আমার জন্য কি এক জোড়া বিলেতি জুতো এনেছে। বেটা বাপকে বুড়ো বয়সে সাহেব সাজাতে চায় আর কি!" সকলে "কই দেখি দেখি" করে উঠলেন। কাছে গ্রামের সরকারদের বাড়ির এক ছোকরা বসেছিল, কর্তা তাকে হুকুম দিলেন, "খোল্ তো বেহারী, দেখি, কি জুতো?" মোড়ক খোলা হল। ভিতর থেকে বেরোল এক জোড়া কালো হুড বার্নিশের ইংরেজি শু জুতো, দিব্যি ছুঁচোল মুখ, দুপাশে রবারের ইস্প্রিং। সে রকম ব্যাপার, পরা দূরে থাক, গাঁয়ের কেউ কখনো চোখে দেখে নেই। কর্তা এক পাটি জুতো হাতে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, দেখতে ভারি সুন্দর তো হে! কিন্তু ওর ভেতর পা ঢুকবে কেমন করে? আচ্ছা, ধর তো বেহারী।" তার পর খানিকক্ষণ খুব ধস্তাধস্তি চলল, কিন্তু পিতামহের অনভ্যস্ত পা কিছুতেই ঢুকল না সেই সংকীর্ণ সাহেবি জুতোর মধ্যে। একজন বয়স্ক ঠাট্টা করে বললেন, "কর্তামশাই, পা দুটো বাটালি দিয়ে একটু চেঁচে ছুলে না নিলে ওতে ঢুকবে না।" কর্তা নাছোড়বান্দা। হেসে জবাব দিলেন, "ছেলে অত সাধ করে জুতো এনেছে, ও আমাকে পরতেই হবে। রোসো, একটা ফিকির ঠাউরেছি। বেহারী, গোটাদুই পেরেক আর একটা হাতুড়ি নিয়ে আয় তো! দেখিয়ে দিচ্ছি কি করতে হবে।" পেরেক হাতুড়ি এলে পর, গোড়ালির দিকটা হাতুড়ি পিটে পেরেক ঠুকে, শু জোড়াকে রীতিমত চটি বানিয়ে ফেলা হল, তখন কর্তা দাঁড়িয়ে উঠে সেই রূপান্তরিত বিনামা পরে উঠানে গটগট মসমস করে খানিকটা খুব পায়চারি করলেন। সবাই সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখতে লাগল।

এ পর্যন্ত তো হল comedy, এর পরে যা ঘটল সেটাকে tragedy-ও বলা যেতে পারে। নূতন জুতো পরার সাধ মিটলে কর্তা ক্রমে আবার

আসরে বসলেন। এ কথা সে কথার পর ভট্টাচার্য মহাশয় বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার পর বাবাজী এখন কি করবে, কিছু মতলব ঠাউরেছ?" বাবা বললেন, "আজ্ঞে সদর আদালতে ওকালতি করব ঠিক করেছি। আপাতত মাস কয়েকের জন্য একটা চাকরি নিয়েছি।" কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "চাকরি নিয়েছিস্! কই, আমাকে কিছু লিখিস্ নেই তো! কি চাকরি?" বাবা একটু আমতা-আমতা করে উত্তর দিলেন, "প্রফেসর হয়েছি।" কর্তা বললেন, "পেফেসর! সে আবার কি? বাঙলায় বুঝিয়ে বল।" "আজ্ঞে, কলেজে ছেলেদিকে পড়াতে হয়।" পিতামহের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, "ছেলে পড়াতে হয়, গুরুমশায়গিরি! ভদ্রবংশের ছেলে হয়ে গুরুমশায়গিরি নিতে লজ্জা হল না! হতভাগা, এর নাম ইংরেজি শিখেছিস্, চারটে পাস করেছিস্। যা, এখনই কলকাতায় ফিরে গিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আয়। নইলে আর আমাকে মুখ দেখাস্ নে।" বাবা মাথা হেঁট করে বসেছিলেন, ধীরে ধীরে বললেন, "সে কি করে হবে, বাবা! উকিল হতে হলে আমাকে পাঁচশো টাকা জমা—" কর্তা লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বললেন, "তবে রে, আমার মুখের উপর কথা কইতে আসিস দু পাতা ইংরেজি পড়েছিস বলে। এখনই—" বলে নূতন জুতো একপাটি তুলে বাবার দিকে সজোরে ছুঁড়লেন। একটু পরে দেখা গেল, গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে বাবা ছুটে পালাচ্ছেন, আর বৃদ্ধ ঠাকুরদা মশায় হাতে দ্বিতীয় পাটি জুতো নিয়ে তাঁকে খেদিয়ে চলেছেন। যাক্, শেষ পর্যন্ত ভট্টাচার্য মহাশয় ও অন্য কর্তারা ঠাকুরদাকে ধরে বাড়ি ফিরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু বাবাকে ফেরানো গেল না। তিনি এক ছুটে তাঁর মামার বাড়ি বল্লা গিয়ে উঠলেন। এক বেহারী সরকার শুধু তাঁর সঙ্গ ছাড়ল না।

এই Serio-Comic ঘটনার ফলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবাকে প্রফেসরি ছেড়ে দিতে হল। ওকালতি করার সাধ মিটল না। কাউএল সাহেবই চেষ্টাচরিত্র করে বাবাকে একটা হাকিমিগিরি জুটিয়ে দিলেন। কর্তার আর তখন ছেলের উপর রাগ অভিমানের কোনো কারণ রইল না। কিছুদিন বাদে যখন ছেলে সপরিবারে পূর্ববঙ্গে হাকিমি করতে বেরোলেন, তখন কর্তা আদর করে তাঁদের সঙ্গে পাঠালেন সরকারদের বাড়ির বেহারী বলে সেই চালাক-চতুর ছেলেটিকে।

আজ এই বেহারী সরকার মশাইয়ের দুচারটে গল্প বলব বলে এতো বড়ো

ভূমিকার পত্তন করলাম। আমাদের কাছে ইনি চিরদিন সরকার-দাদা নামে পরিচিত ছিলেন। শুধু যে নামেই দাদা ছিলেন, তা নয়। ছেলেবেলায় মানুষ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে যে-সব জিনিস পায়, যা কিছু শেখে, আমরা তা এঁরই কাছ থেকে পেয়েছিলাম। এঁর স্নেহের ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারি নেই, পারব না। উপরে যে গল্পটা করলাম তার চৌদ্দ পনের বছর পরে আমার সঙ্গে মর্ত্যলোকের পরিচয় আরম্ভ হল। সরকার দাদা তখন কুচবেহারে আপন আসনে পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত। শুধু যে দেওয়ানখানাতে সর্বেসর্বা, তা নয়। তাঁর পরামর্শ, তাঁর সহায়তা নইলে সে কালে কারো বাড়িতে কোনো ক্রিয়া-কর্ম পাল-পার্বন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হত না। আর তিনিও নীরবে অকাতরে সকলের কাজ করে বেড়াতেন। তাই বলে মানুষটি মোটেই নীরব ছিলেন না। বরং সেকেলে মানুষ, হাঁক ডাক যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কখনো নিজের ঢাক পিটতেন না। মুনিব সুখ্যাতি করলে ছোটো ছেলের মতন লজ্জায় মাথা হেঁট করতেন। শুধু প্রভুভক্ত বা নিমকহালাল বললে সরকারদার বর্ণনা করা হয় না। কম বেশি ষাট বছর আমাদের বাড়িতে ছিলেন বটে, কিন্তু মনিব পরিবারের মন জোগাবার জন্য মিষ্টি কথা বলার অভ্যাস কখনো করেন নেই। বাবার সমুখে পর্যন্ত তাঁকে অপ্রিয় সত্য কথা খুব সোজাভাবে বলতে শুনেছি। আর এক মস্ত গুণ তাঁর ছিল, যেটা সাধারণত ওরকম লোকের দেখা যায় না। অন্য চাকর বাকরদের উপর কখনো জুলুম করতেন না, তাদের সুখ দুঃখ সর্বদা দেখতেন। সুবিধা পেলেই তাদের হয়ে দুটো ভাল কথা কর্তার কাছে বলতেন। তারা দোষ করলে নিজেই তার প্রতিবিধান করতেন, পারতপক্ষে কর্তাকে কিছু জানাতেন না। শুধু চাকরদের কথা কি বলছি, আমাদেরও অভাব অভিযোগ, ন্যায় অন্যায় আবদার সরকারদাকেই প্রথমে জানাতাম। তিনিই মা বাবাকে বলতেন। অবশ্য এ সব কথা যে বলছি, এ সরকারদার জীবন-মধ্যাহ্নের কথা। শেষ কয়েক বছর অন্ধ ভগ্নশরীর হয়ে যখন আমার ভাইয়ের কাছে পড়ে থাকতেন, তখন তো তিনি অর্ধেক মানুষ। তবু তখনো এতটুকু মিথ্যাচারের ধার ধারতেন না, মিথ্যা কথা একটা বলতেন না।

কুচবেহারে থাকতে চিরদিন আমাদিকে এটা ওটা সুন্দর কিন্তু অদরকারি জিনিস বাজার থেকে কিনে দিতেন। পূজার সময় জন্মতিথিতে শান্তিপুরে কি ঢাকাই কাপড় দিতেন। বাবা একবার এজন্য তাঁকে বকেছিলেন, কিন্তু তিনি

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি আর টাকা পয়সা কোথায় পাব! আপনার বাজার খরচ থেকে যা চুরি করি, তাই থেকে এনে দিই বই তো নয়।" এর উপর কি আর কোনো কথা চলে। আমি বিলেত যাবার সময় যে সব বিদায়ী উপহার পেয়েছিলাম, তার মধ্যে সরকারদার জিনিসই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়েছিল। নিজে ঘুরে ঘুরে পছন্দ করে সাহেব বাড়ি হতে পনের টাকা দিয়ে এক মরক্কো চামড়ার পকেট বই এনে দিয়েছিলেন। যখন ফিরে এসে সেই পকেট বই তাঁকে দেখালাম তখন বৃদ্ধের কি আনন্দ! কিন্তু সরকারদার উপহার জীবদ্দশাতেই শেষ হয় নেই। মৃত্যুকালেও আমার বড়ো ভাইপোকে স্নেহ উপহার স্বরূপ একহাজার টাকা দিয়ে গেলেন।

সরকারদা বাড়ির steward হিসাবে অসাধারণ কাজের লোক ছিলেন, এ বলাই বাহুল্য। নইলে আমাদের কুচবেহারের ঘরকন্না এতো কাল চালাতেই পারতেন না। কিন্তু তিনি তো শুধু হুকুম চালিয়েই তুষ্ট থাকতেন না। সব কাজই নিজে করতে পারতেন, ও করতেন। chef বা শৌখিন পাচকের কাজ তাঁর সমকক্ষ আমি কমই দেখেছি। বাঙলা, ইংরেজি, মোগলাই, সকল রকম রান্নাতেই তিনি সমান ওস্তাদ ছিলেন। কুচবেহারে বসে আমাদিকে ভীম নাগের সন্দেশ, বর্ধমানের মিহিদানা ও বাগবাজারের রসগোল্লা খাওয়াতেন। সেকালে বৎসরে একবার মহারাজ আমাদের বাড়িতে ঘটা করে খেতে আসতেন। সে ভোজের আয়োজন বিশাল রকমের হত। আহার্য দ্রব্যের রকমারি অন্যূন তিন শো থাকত। তার মধ্যে বাছা বাছা শৌখিন পদার্থ অনেকগুলোর ভার নিতেন সরকারদা নিজে। মহারাজ সমজদার খাইয়ে লোক ছিলেন, তিনশো রকমের জিনিস সবই একটু একটু চাখতেন। একবার হল কি, খেতে খেতে মহারাজ হঠাৎ বলে উঠলেন, "দেওয়ানজী, আমি তো জানতাম না আপনার কাশ্মিরী-পাচক আছে।" বাবা উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে না, আমার তো কাশ্মিরী বামুন নেই।" নৃপবর বললেন, "সে কি কথা মহাশয়! এই দেখুন এই রেকাবিতে যা দেওয়া হয়েছে, সব উৎকৃষ্ট কাশ্মিরী খাদ্য।" সরকার মহাশয়ের ডাক পড়ল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন "বেহারী, এগুলো কে রেঁধেছে হে?" বেহারী জোড় হাত করে উত্তর দিলেন, "হুজুর ধর্মাবতার! এই গোলামেরই রান্না।" "তুমি এসব রান্না কোথায় শিখলে?" "ধর্মাবতার! গেল বছর কলকাতার এক বাবু এসেছিলেন কাশ্মিরী-বামুন সঙ্গে নিয়ে। কদিন পাক ঘরে বসে বসে

তার রান্না দেখে নিয়েছিলাম।" সে বছর সরকারদা মহারাজের কাছে পাঁচ খান মোহর বকশিশ পেলেন।

এতো গেল রান্না-বাড়ার ব্যাপার! চাষ-বাস, গোরুর সেবা, মাছ ধরা, এ সবেও ভদ্রলোকের রোজ কম সময় কাটিত না! তার উপর খুচরো কাজ কত রকমের ছিল। বাবার জন্য হুঁকোর তামাক সরকারদা নিজে হাতে তৈরি করতেন। এতো সুন্দর হতো সে তামাক, যে বাবা বাহিরে গেলে সেই তামাকই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মাছ ধরাটা ছিল সরকারদার একটা মস্ত ব্যসন। বড়ো জাল, খেপনী জাল, ছিপ এমন কি হাত-সুতোর সাহায্যে লুকিয়ে সরকারী পুকুরের মাছ মারা তাঁর নিত্য কর্ম ছিল। কখনো কালেভদ্রে একখানা ছিপের পাস নিতেন বটে, নইলে সবটাই চলত বিনা পাসে। এই নিয়ে পুলিসের সঙ্গে খিটির মিটির লেগেই ছিল। তবে তারা মহাপরাক্রান্ত সরকার মশায়কে এঁটে উঠতে পারতো না। পুলিস সাহেবের কাছে নালিশ পৌছলে তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। একবার কিন্তু পুলিস খুব সুযোগ পেয়েছিল ওঁকে জব্দ করার। আমাদের একটা বেশ বড়ো সব্জী-বাগান ছিল। সেটা সম্পূর্ণ সরকারদার তাঁবে থাকত। তিনি সেখানে নানা-রকমেব ভালো ভালো বীজ আনিয়ে তরি-তরকারির চাষ করাতেন। একবার কি সখ হল, আফিমের চাষ করলেন। আমাদিকে বললেন, এইবার বাবুকে বাগানের তাজা পোস্তদানা খাওয়াব। ক্ষেতে যেই সুন্দর লাল লাল ফুল ফুটে উঠল, পুলিসের লোক একেবারে এসে বাবার কাছে এতেলা দিলে, হুজুরের বাগানে সরকার মশায় আফিমের আবাদ করেছেন। বাবা চটে অস্থির হয়ে বললেন, "ধরে নিয়ে যাও ওকে। আর পারি না, কোনো আইন মানবে না! জ্বালাতন করলে!" সরকারদাকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস সাহেবের সামনে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বেহারীবাবু, তুমি এ রকম কাজ কেন করলে? এতে দেওয়ানজীর ইজ্জতের হানি হয় জান না?" সরকারদা ন্যাকা সেজে উত্তর দিলেন, "সাহেব, ওতে কোনো কসুর হয়, আমি তা জানতাম না। হুজুরের নিজের ফুল বাগানেও তো ঐ গাছ কত লাগান হয়েছে। আমি গরীব বলে…।" তারপর সাহেবকে নিয়ে গিয়ে বাবার নিজের সখের ফুল বাগানের poppy ফুলের গাছ সব দেখিয়ে দিলেন। বাবাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ও পুলিস সাহেব, দুজনেই হেসে উঠলেন। বাবা বললেন, "সরকার ও তো বিলেতী ফুলের গাছ। ওতে আফিম হয় না।" সরকারদা

অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, "আমি তো ফুলের শোভার জন্ম গাছ লাগিয়েছি, হুজুর। আফিম আমি কেন করব বলুন! আমার কিসের অভাব।" পুলিস সাহেব সরকারদাকে ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পেয়ে ভদ্রলোক থানায় গিয়ে দারোগাকে জানিয়ে এলেন, "পারলেন কিছু করতে আমার? ফের গোলযোগ করেন তো খোদ মহারাজকে বলে দেব। বুঝলেন?"

আমাদের ছোটোবেলার লেখাপড়াও চলত সরকারদার তত্ত্বাবধানে। খাগের কলম ও ঝিয়ানী কালি দিয়ে বাঙলা মক্স করতে হত ইংরেজি ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পরেও। যখন ইস্কুলে ইংরেজিতে G. C. M. কষছি তখনো তাঁর কাছে শনি রবিবারে শুভঙ্করী চর্চা নিয়মিত চলছে। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার চেয়েও অনেক বড়ো জিনিস সরকারদার কাছে শিখেছিলাম। দুটি উপদেশ তিনি সদা সর্বদা দিতেন। একটা এই যে, কখনো ভুলবে না কোন্ ঘরে তোমাদের জন্ম, মনটা সর্বদা বড়ো রাখবে। আর দ্বিতীয় এই যে, দেওয়ানের ছেলে বলে গাড়ি ছাড়া নড়তে পারবে না, এ যেন কখনো না হয়।

সরকারদার ভাই বোন কেউ ছিল না। আমার মা জোর করে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন, বৌকে গ্রামে নূতন বাড়ি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে বৌয়ের সঙ্গে ঘর করাতে কেউ কখনো পারলে না। কেবল বলতেন, ও সব আমাকে তাড়াবার ফন্দী, কিন্তু আমি গেলে তো! বাবা একবার জোর করে বললেন, "সরকার তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ, তোমাকে দিয়ে আর কাজ চলছে না। তুমি গ্রামে গিয়ে বাস কর।" সরকারদা মুখের উপর জবাব দিলেন, "বেশ আপনার দরকার না থাকে আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু গাঁয়ে কক্ষনো যাব না। হোসেঙ্গাবাদে গয়াতে দিদিরা আছে, বোম্বাইয়ে বড়বাবু আছে, আমার যেখানে খুশি থাকতে পারি। নাই বা আপনি রাখলেন।" বৃদ্ধ পরদিন মান করে চলে গেলেন গয়াতে আমার দিদির কাছে, সেইখানেই রইলেন। এক বৎসর পরে আমি যখন ছুটিতে কুচবেহারে গেলাম, তখন অনেক সাধ্য সাধনা করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। আর কেউ কখনো তাঁকে বৌয়ের ঘর করতে পাঠাতে চেষ্টা করেন নেই। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু আশা করি আমার এই দরিদ্র বন্ধুর গল্প পাঠকের মন্দ লাগল না।

—